মলয় রায়চৌধুরী

সমগন্ধ

০১-০৫

০১.

লোহার ভারি কালো চপারটা রোগা লোকটার ঘাড়ের ওপর পেছন থেকে সজোরে পড়তেই, চার ইঞ্চির আঘাতের রেখা-বরাবর, ময়লা চামড়ার তলা থেকে উথলে ওঠে সাদা গোলাপি নরম মাংস, টুটসি সমর সেনার হাসির ঠোঁতের মতন দুফাঁক কাটা জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে গলগলে গরম তাজা রক্তের নিটোল ছররা। বাতাসের ছোঁয়ায় গলে গড়িয়ে পড়ে ছররাগুলো।আক্রান্ত রোগা প্রৌঢ়ের শ্বাসনালিকায় প্রশ্বাস মোচড় দিয়ে ওঠে, বাঁদিকে হেলে পড়ে মাথা, আর দুলদুলে ঘাড় নিয়ে জীবনের শেষ দ্রুততম দৌড়ের নিশিডাক ওকে পেয়ে বসে।

শ্বাস-ফুরন্ত লোকটা দৌড়োয়, সামান্য ঝুঁকে ভীত রাজহাঁসের মতন পা ফেলে পা ফেলে, সাদা টেরিকটের শার্ট জবজবে লাল, দৌড়োয়, দৌড়োতে থাকে, ছোটে, ছুটতে থাকে, পালাতে থাকে।পারে না আর।মৃগি রুগির মতন পড়ে যায় ভোটবাগানে জয়বিবি রোডের ধুলোর ওপর, চিৎ, হাত-পা ছড়িয়ে, সশব্দে, মাঝপথের প্রাচীন ধুলো উড়িয়ে। মুখে ছিট-কাপড়ের রুমালবাঁধা আরও দুজন আক্রমণকারী, অপেক্ষা করছিল, বাজারের নাইলন-থলে থেকে বের করে আরও ভারি, কালো, ছাগল-ভেড়া-গোরুর হাড়কাটার চপার। লোকটার ধূসর ট্রাউজার-পরা ঠ্যাং-ছেতরানো দেহে খিঁচুনি উঠে স্থির হয়ে যেতে, রক্ত-চিটচিটে চপার থলের মধ্যে পুরে, তিন দিকে পালাল স্বাস্থ্যবান যুবক খুনিরা।

কয়েক মুহূর্তের দর্শক, শ্লথ পথচারীরা, প্রথমটায় থ, বিমূঢ়, তারপর ঘটনাস্থল থেকে পালাতে শুরু করে আতঙ্কে।সবাই মুক্ত হতে চাইছিল ঘটনা থেকে।ঘটনা থেকে বিচ্যুত হবার আরামপ্রদ স্মৃতিতে ফিরে যাবে গলির নাগরিক।এই খুনের চেয়েও তারা ভীত হত্যা-পরবর্তী রাষ্ট্রযন্ত্রের আস্ফালন-নকশায়। ঠেকগুলোর ঝাঁপ বন্ধ করার উদ্বিগ্ন তাড়াহুড়ো, দোকানগুলোর শাটার নাবাবার ঘড়ঘড়, পথের কিনারা থেকে ভিকিরিদের পয়সা তুলে দৌড়ুবার সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলায় ফাঁকা হয়ে যায় জয়বিবি রোড।

শুনশান লাশ, একা, চিৎ, পড়ে আছে।হাওয়ায় ফুরফুর করছিল ওর কোঁকড়া কাঁচাপাকা চুল।

অপঘাতে মরার সময়টাতে মানুষের একা অসহায় দেহ কেমন ন্যালবেলে, হেলে সাপের মতন হয়ে যায়, নিজের চোখে তা দেখল অরিন্দম, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, দেখল হত্যা, আততায়ী, আক্রান্তকে, চাক্ষুষ, আর গা গুলিয়ে তলপেট থেকে শ্বাসহীনতার ঘূর্ণিবাতাস পেঁচিয়ে উঠে এল কণ্ঠনালি ওব্দি, কিন্তু বমি হল না।হাতের চেটোয়, কপালে, ঘাম। অথচ ওই লোকগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর, অরিন্দমের।ঘটনাটার এ এক জবরদস্তি।

বছর পঁয়তাল্লিশের সদ্যখুন দড়ি-পাকানো লোকটা, ওইখানে, জয়বিবি রোডে, রক্তেভেজা, ধুলোর ওপরে যে এখন হাত-পা ছড়িয়ে স্থির পড়ে আছে, হাঁ-মুখ আর দুচোখ খোলা, অরিন্দমের সামনে দিয়েই একটু আগে টেলিফোন বুথটায় ঢুকতে যাচ্ছিল, দেয়ালে সাইকেল দাঁড় করিয়ে, ঠিক তখনই, ওফ, লোকটার গলা আর ঘাড়ের মাঝে পেছন দিক থেকে সজোরে কোপ মেরেছিল সবুজ টিশার্ট পরা ষণ্ডা ছেলেটা। চপারের ওপরে ওঠা, বাতাস ভেদ করে নামা, গদ আওয়াজ, নরম তাঁমাটে চামড়া কেটে মাংসে ঢুকে যাওয়া আর উথলে বেরিয়ে আসা রক্তের ভলক, থমথমে দৃশ্যের ভয়াবহতা, ঘিরে ধরে ওকে।অননুভেদ্য জোঁকেরা ছড়িয়ে পড়ে মর্মস্নায়ুর রক্তজালিকায়।

সবুজ টিশার্টের বুকে সাদা হরফে লেখা স্লোগানটাও, আততায়ী যখন চপার হাতে এদিকে ফিরেছিল, দেখে ফেলেছিল অরিন্দম : ‘ভ্রুপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে’।

ওর কবজিতে টান পড়তে, চমকে উঠল অরিন্দম। হুঁশ ফিরে এলো যখন আদিত্য বারিক ওর হাতে টান মেরে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে দাঁতে দাঁত যত আস্তে সম্ভব চেঁচিয়ে জানায়, এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয় অরিন্দমদা, চলুন চলুন, ওই ভদ্দরলোক বালি পুরসভার কমিশনার শামিম মহম্মদ খান।তখনই আদিত্যের নির্দেশের গুরুত্ব টের পায় অরিন্দম। পর পর চারটে বোমা ফাটার শব্দ হল আর পেছন ফিরে দেখতে পেল অরিন্দম, গন্ধকের নীলাভ-ধূসর ধোঁয়ায় জয়বিবি রোড ধোঁয়াক্কার, আকাশ থেকে বারুদের গন্ধ মেখে নেমে এসেছে ভীতির মশারি।

পাঁচ মিনিট আগের গ্যাঞ্জাম রাস্তাটা, অকালপ্রয়াত নদীর মতন উষর। বালি থানার অধীন দুপুরের রোদ্দুর ততক্ষুনে, ওইটুকু সময়ের মধ্যে, সরে গেছে উত্তরপাড়া থানার এলাকায়।

ভোটবাগানের ভুলভুলাইয়ায়, গলির তলপেটের ঘিঞ্জি গলির ছমছমে অজানায় হনহনিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, বড়ো রাস্তায় পৌঁছোবার পথ খুঁজে পায় না ওরা, আদিত্য আর অরিন্দম, খুঁজে পায় না শহরের নির্লিপ্ত নাগরিকতায় মিশে যাবার দরোজাটাকে।

টাকরা শুকিয়ে গেছে অনভ্যস্ত অরিন্দমের। পা চালানোর ফাঁকে ডান দিকে, এস কে চ্যাটার্জি লেন লেখা রাস্তাটায়, দেখতে পেল গোটা তিরিশেক লোকের মাথা-গিজগিজে ভিড়, চলেছে ঝাড়পিটের তুমুল।ভিড় চিরে বছর আঠারোর রক্তাক্ত সুঠাম তরুণ ছিটকে বেরোয়, ওদের দুজনের পাশ কাটিয়ে কয়েক-পা এগোয় গণপ্রহারে থ্যাঁতলানো দেহ বজায় রেখে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

থ্যাঁতলানো তরুণকে অনুসরণকারী নাগরিকরা, তরোয়াল, ভোজালি, লাঠি, রড, শেকল, বর্শা হাতে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে, ওরা দুজনে শাটার-বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে উঠে পড়ে। সশস্ত্র নাগরিকরা ওদের সামনে দিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় মাটিতে কাতরাতে থাকা ছোকরার কাছে।ঝুঁকে দাঁড়ানো মানুষের কালো-কালো মাথার ওদিকে, লাঠি আর তরোয়াল উঠছে-নামছে দেখতে পায় অরিন্দম। হিন্দি গালাগাল, যেন গালাগাল ফুরিয়ে যাচ্ছে ওদের মগজে।

অরিন্দমের হাতের তালু ঠাণ্ডা আর কপালে বিনবিনিয়ে ঘান ফিরে আসছে।অজ্ঞান হয়ে পড়ার মতন অনুভূতি হয়, কিন্তু গা গুলিয়ে ঢলে পড়া থেকে ওকে সামলায় আদিত্য। ছেলেটা মরে গেছে নিশ্চই।তবু ওকে পিটিয়ে যাচ্ছে।মৃতদেহকে পিটিয়ে তার জীবন্ত অতীতের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা খুঁজছে লোকগুলো।অরিন্দম পড়ে গেছে সেই ভাষার সন্ত্রাসের খপ্পরে।

তরুণের ন্যালবেলে দেহটা ধরে টানতে-টানতে ওদের সামনে দিয়ে নিয়ে যায় লোকগুলো। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি ঝুলে বেরিয়ে আছে। এখনও বোধয় প্রাণ আছে খিঁচোতে থাকা নাড়িভুঁড়িতে।

আদিত্য যখন বলল, এর নাম শেখ হিরা, শামিম খানের বিরোধী দলটার গুণ্ডা, তখনও অরিন্দম শরীরের অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠেনি।ঠোঁটের ওপর থেকে নিজের ম্লান হাসিটুকু জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে জানায়, ইউটোপিয়ার স্বপ্ন বিক্কিরির জন্যে দুর্বৃত্তের দরকার হয়।

বড়ো রাস্তার বাসস্টপে পৌঁছে, বাসে চেপে, বসার জায়গা মিনিট পনেরো পরে পেয়ে, বি-বা-দী বাগে নামার পরও, অরিন্দমের গলায় শ্লেষ্মার দুঃস্বপ্ন আটকে ছিল।অফিস পাড়ার রাষ্ট্রীয় অভয়দানকারী বহুতলগুলোর ছায়ানম্র চত্বরে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুক্ষুণ দাঁড়িয়ে, স্বাভাবিকতার আভাস অনুভূত হলে, আদিত্যকে বলল অরিন্দম, তুমি পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার হয়ে পালালে? তোমার কাজ তো আইন বজায় রাখা, প্রতিরোধ করা, নাগরিকদের আগলানো।ছ্যাঃ, অন্তত কাছাকাছি থানাটাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল।

অরিন্দমদা আপনি তো পুলিশে চাকরি করেন না, তাই উপদেশ ঝাড়াটা সোজা।বিজ্ঞের ধাতস্থ মন্তব্য আদিত্যর।

চাকরির এই ক'বছরেই সরকারি অভিজ্ঞতা ওকে মনুষ্যজনোচিত যুক্তিবাদীতে পালটে ফেলেছে। এরকম হলেই বোধহয় একজন লোক মানুষ থেকে মানব হয়ে যায়। মানবসন্তান।কলকাতা শহরটা স্বাধীনতার পর মানব উৎপাদনের কারখানা হয়ে গেছে।

অভিজ্ঞতা এক ভয়ঙ্কর চিজ, গলার স্বর বদল করে বলল আদিত্য, যত নষ্টের গোড়া।

ছ-ফিট, দোহারা ময়লা, থ্যাবড়া, আদিত্য বারিকের সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় পাটনা থেকে কলকাতায় অরিন্দমের বদলি হয়ে আসার পর। সাম্প্রতিক জলবসন্তে ওর, আদিত্যর, চেহারা এখুনও খানাখন্দময়।মাদার ডেয়ারির দুধের সরের মতন একপোঁচ হাসি লেগে থাকে পুরুষ্টু ঠোঁটে।গুঁড়ো দুধের জলগোলা হাসি, কথা বলার সময়।ময়লা হলেও জানে আদিত্য, ওর দিদি আর ছোটোবোন ওর গায়ের রঙকে ঈর্ষা করে।

অরিন্দমের অফিসে আগে কাজ করত আদিত্য, ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে, আরও শ'চারেক কর্মীর মতন কয়েন নোট এগজামিনার।শুনতেই যা রমরমে।আসলে মজুর আর কেরানি মেশানো দোআঁশলা চাকরি।কলারের বাঁদিকটা নীল, ডান দিকটা সাদা।সে চাকরিতে বেশি মাইনে কম কাজ সত্ত্বেও, আত্মসন্মানবোধের পরিসর, ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ, আর জীবনকে উদ্দেশ্যহীন করা কাঁচা টাকার তাড়ার গাঁট উপরি হিসাবে পাবার সুযোগ-সুলুক না থাকায়, সুযোগ পেতেই আদিত্য পালিয়েছে মনের মতন চাকরির

আশ্রয়ে, পুলিশে।ওর আদর্শ রুণু গুহনিয়োগী নামে এক প্রাক্তন অফিসার, যদিও তাঁর সঙ্গে আদিত্যর পরিচয় নেই, কিংবদন্তি শুনেছে, কাগজে পড়েছে, আদালতে গিয়ে দেখেছে সহকর্মীদের সঙ্গে, জয়ধ্বনি করেছে, যখন অযথা বিচার চলছিল নায়কোচিত লোকটার।

কর্মজীবি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ওব্দি রুণু স্যারের কদর করে পদোন্নতির ধাপ একের পর এক এগিয়ে দিয়েছিলেন ওনার সক্ষম পায়ের দিকে।আদিত্যের মগজে নিজের সঙ্গে নিজের ষড়যন্ত্র চলে সবসময়, কেমন করে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশান বিভাগে যাবে।

কয়েন-নোট এগজামিনারের চাকরিতে আদিত্যর কাজ ছিল খুচরো ওজন করানো, চটের নানান মাপের বস্তার প্যাকেট তৈরি, থলের মুখ বেঁধে গরম গালার সিলমোহর। মজুররা বেলচা দিয়ে কয়েনগুলোকে তুলে ওজনপাল্লায় রাখতো। চটের রোঁয়া অস্বাস্থ্যকর, নোংরা আর দাম বেশি বলে মোটা পলিথিন চাদরের স্বচ্ছ থলে পরে-পরে চটের জায়গা নিয়েছিল।চটকলগুলোর কফিনে আরেক পেরেক।

কেউ যদি পাঁচ-দশ হাজার টাকার এক টাকা বা দুটাকা বা পাঁচ টাকা চায়, দিন কাবার হয়ে যাবে গুনে দিতে-দিতে। তাই ওজন করে আগে থাকতে গাঁটরি বেঁধে রাখার ব্যবস্থা।দু-পয়সা পাঁচ-পয়সা পঁচিশ-পয়সা উঠে গিয়ে নিশ্চিন্দি।হালকা পয়সাগুলোর জন্যে বড়ো-বড়ো থলেতে একশো টাকা করে খুচরো ভরে রাখতে হতো।অনেক খদ্দের বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটা-একটা করে গুনে ফিরে এসে চেঁচাত, চারটে কম, সাতটা কম, তিনটে কম, আর তাই নিয়ে ফয়সালাহীন নিত্যিদিনের খিস্তি খেউড়।যে রেটে টাকার দাম পড়ছে, এক দুই পাঁচ টাকার কয়েন তুলে দিতে হবে বছরকতক পর, কুড়ি আর পঞ্চাশ টাকার কয়েন ছাড়তে হবে।

অ্যালুমিনিয়ামের দশ পয়সা আর হলদে কুড়ি পয়সা তো পাবলিক গলিয়ে অন্য কাজে লাগিয়ে ফেললে।কুড়ি পয়সার কয়েনটাই এক টাকায় বিকোতো।সময় ব্যাপারটা যথেষ্ট হিসেবি, কুড়ি পয়সার গর্ভে লুকিয়ে এক টাকা।

কাগজ আর ছাপার খরচ বেড়ে যাওয়ায়, এক দুই পাঁচ টাকার নোট বন্ধ করে ছাড়া হয়েছে কয়েন।কয়েন নেবার পাবলিকের ভিড় তাই এদান্তি বেড়ে গেছে কাউন্টারে। পাবলিকের চাকর হওয়া আর সরকারের চাকর হওয়া যে দুটো এক্কেবারে আলাদা ব্যাপার, তা জেনেছিল আগের খুচরো-গোনার চাকরিতে।তার ওপর প্রথম দিকে চটের রোঁয়ায় কফের, আর পরে পলিথিনের জন্যে চামড়ায়, রোগের অ্যালার্জি হয়ে গিয়েছিল দোহারা আদিত্যর।

দিনের পর দিন পাঁচমিশালি-অ্যালুমিনিয়াম মুদ্রার পর্ণমোচী জঙ্গলে ধাতব গন্ধের মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছিল ওই চাকরিতে।মাখা ভাতে ওব্দি দোআঁশ ধাতুর অম্লকষায় স্বাদ চারিয়ে যেত হাতের তালু থেকে। যখন ওই চাকরিতে ঢুকেছিল, তখন সত্যিসত্যি বিশাল ওজনপাল্লায় কিলো-দশকিলোর বাটখারা চাপিয়ে মাপা হতো কয়েনের থলে। পরে এসেছিল ওজনের ইলেকট্রনিক মেশিন।আদিত্যর মনে হতো, অর্থনীতিতে স্নাতক হবার এই-ই পরিণাম।অমন বিতিকিচ্ছিরি কায়িক শ্রম করাবার জন্যে ওই অফিসটা চেয়েছিল

অর্থনীতি গণিত কমার্সে ভালো নম্বর-পাওয়া স্নাতক। অসাধারণ স্থাপত্যের বহুতলগুলোয়, সারা দেশজুড়ে, স্নাতকরা এমনতর মাশুল গুনে যাচ্ছে পড়াশুনোয় ভালো বা অন্ত্যজ হবার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে।ইশকুল-কলেজের জ্ঞান বোধহয় কারোরই বিশেষ কাজে লাগে না।পৃথিবী গোল আর সূর্যের চারিধারে ঘোরে জেনে কী লবডঙ্কা হয়েছে!

কয়েন বিভাগে কাজ করার আগে নোট বিভাগেও কিছুকাল ছিল আদিত্য।সে আরও ভয়ঙ্কর।মাথা-খারাপ হবার যোগাড়।কাজ ছিল টাটকা নোট আর পচা নোট আলাদা করার, একশোটা ভালো আর একশোটা পচা নোটের প্যাকেট তৈরি, দশ প্যাকেটের বাণ্ডিল, ভালোর আলাদা পচার আলাদা, পচা নোটে গোল-গোল চাকতির মতন মেশিনে ফেলে কয়েকটা ছ্যাঁদা করানো, ভালো নোটগুলোকে জনগণের ব্যবহারের জন্যে আবার পাঠানো, আর ছ্যাঁদা করা নোট চটের বস্তায় সিলবন্দি করে চুল্লিতে পোড়াবার জন্যে তুলে রাখা।পরে অবশ্য নোট কুচোবার আর তা থেকে মণ্ড বানাবার যন্ত্র এসেছিল বিদেশ থেকে।এক-দুই-পাঁচ টাকার নোট উঠে গিয়ে রেহাই হয়েছে।ওফ, ওই ছোটো নোংরা হিলহিলে স্যাঁতসেতে ছাতাপড়া নোট গোনা, শেষই হতে চাইত না। মানবজীবনের যতো পচন প্রতিটি নোটের ইতিহাসে লুকোনো থাকে।

একটা পচা নোট কাছে থাকলে সেটা থেকে লোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি পেতে চায়।যাহোক-তাহোক খরচ করে ফেলতে চায়।দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নষ্ট করে।দেশের যে অঞ্চল যত গরিব, সে অঞ্চলে চলে তত পচা নোট, নানা কায়দায় জোড়া নোট। কেমন নোট চলছে দেখে একটা অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা টের পাওয়া যায়।অর্থনীতির সিলেবাসে পড়ানো হয়নি এসব।অভিজ্ঞতার লাথি খেয়ে শিখেছে।

সেরকম অজস্র নোটের মাঝে বসে যৌবন খরচের চাকরি। আকাশে তখন হয়তো বসন্তঋতুর স্নেহভাজন বকদম্পতিরা বেরিয়ে পড়েছে বাৎসরিক আমোদের জোড়ে-জোড়ে ; লালদিঘিতে পরকীয়া জলে ভাসছে বংশ-গৌরবহীন মাছ-যুবক, বা মহাকরণের চূড়োয় রাগতস্বরে আরম্ভ হয়ে গেছে বৃষ্টি, ছাড়া পেয়েছে ক্রিকেটশেষ ইডেনের সবজান্তা গড্ডলিকা, কিংবা গাড়ি পার্ক করার এলাকায় চলছে ঝড়ে গাছেদের হাওয়ার সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি, কিংবা কাঠকয়লার আঁচের পাশে মাঝে-মাঝে টুসকি বাজিয়ে খদ্দেরকে ইশারা করছে তাম্রশ্মশ্রু ভুট্টা।প্রকৃতি সুযোগ পেলেই শহরকে গ্রামে পালটে ফেলতে চায়।চারশো যুবক-যুবতীর দেখা হয় না কিছুই।

ওই বিভাগে বয়স্ক কাউকে দেখেনিকো আদিত্য।সবাই তরতাজা যুবক-যুবতী।পচা, হিলহিলে, স্যাঁতসেতে, ছাতাপড়া, তেলচিটে, নোংরা নোট গুনে চলেছে আনকোরা ধোপদোরস্ত যুবক-যুবতী, সুদর্শন ও সুশ্রী যুবক-যুবতী, মাথা নিচু করে, প্রায় চুপচাপ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দুপুরের পর দুপুর।আর কোনো কাজ নেই তাদের। ঘাড় গুঁজে নোটের দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাওয়া, ধান রোয়ার মতন।একটা বিরাট অট্টালিকার মধ্যে তারা হাসি মুখে টিফিনের ডিবে হাতে প্রায় নাচতে-নাচতে ঢুকছে, নোট গুনছে বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল, বেরিয়ে আসছে গোমড়া কীটদষ্ট চেহারায়, বাড়ি যাচ্ছে কালকে আবার একই ঘানিতে পাক খাবে বলে।বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো-ভালো সব স্নাতক।ইশকুলে অনেকে প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছিল রাত জেগে, বাড়ি থেকে জ্যোতি

ছড়িয়ে হয়তো আহ্লাদিত করেছিল সারাটা পাড়া। পুরস্কার নিয়ে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ঝলকিয়ে ছিল।

এখন তারা কেবল গণছোঁয়ায় বিরক্ত নোট মুখ বুজে মাথা নামিয়ে গুনে যায়।মাঝে-সাঝে নিশি পাওয়া অবস্থায় তারা বেরিয়ে পড়ে দলবেঁধে পথসভা গেটসভা ঘেরাও ধর্না হরতাল ধিরেচলো বয়কট কর্মবিরতি অবস্থান অবরোধের ডাকে। প্রশ্ন তোলার জাগরুকতা আর নেই। পরের দিন থেকে ফিরে গেছে তারা স্বয়ংক্রিয় কাজে। পুরো ব্যাপারটা আদিত্যর মনে হয়েছিল ভুতুড়ে।ভালো মাইনে দিয়ে ভুত বানাবার কারখানা।

পচা ছ্যাতলা-পড়া নোটের বদগন্ধের কী রমরমা। যত কম টাকার নোট, তত তার বদগন্ধ। পৃথিবীতে এরকম বদগন্ধ যে জন্মাতে পারে, মানুষের হাতে-হাতে ঘুরে-ঘুরে যোগাড়-করা দুর্গন্ধ, অমন চাকরি না করলে অজানা থেকে যেত। একটা পচা নোট আলাদা করে শুঁকলে ওই গন্ধটা পাওয়া যায় না। অথচ কয়েক হাজার পচা নোট একজোট হলেই প্রকাশিত হয়, দেশটার পীড়ার অভিব্যক্তি, হেমন্তের শুকনো পাতার সঙ্গে মেশানো গুয়ের গন্ধ।দেশটার সংস্কৃতি কতটা পচেছে তা বোধহয় ওই গন্ধ থেকে টের পাওয়া যায়। মুমূর্ষ গন্ধটা থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে আদিত্য তখন বুশশার্টের বগলে বিদেশি পারফিউম লাগাত।

আড়াই লক্ষ স্নাতকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আদিত্যকে নিয়ে আরও উনিশজন ওই চাকরিটার পরীক্ষায় সফল হয়েছিল।অথচ সেই চাকরিতে তিতিবিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেছে ও।শালা বেনের আড়তে চাল ডাল গম আটা ওজন করার মতন ভারি-ভারি বাটখারা চাপিয়ে চকচকে মুদ্রা ওজন করানোর চাকরি। প্রতিদিন প্রতিদিন প্রতিদিন প্রতিদিন প্রতিদিন রোজরোজ রোজরোজ রোজরোজ, ছ্যাঃ। এখন না হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ওজন হয়। কিন্তু তখন তো ঝুল-চাকরিতে জান একেবারে শ্মশানকয়লা হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টারের চাকরি পেয়ে নিজেকে সুগন্ধিত করে তোলার অভ্যাসে কিছুটা রদবদল করেছে ও, আদিত্য। এখন ও জনসনের বেবি পাউডার, বাচ্চাদের সাবান-শ্যাম্পু, শিশুদের ক্রিম আর অলিভ অয়েল ব্যবহার করে।আগেকার এক আই জি, এখন অবসরপ্রাপ্ত, দুটো কারখানার মালিক, শিখিয়েছিলেন জীবনদর্শনটা।নিষ্পাপ থাকার নিজস্ব গন্ধ আছে, বুঝলে হে, পুলিশ অফিসারের উচিত সেই গন্ধটাকে সবচেয়ে আগে দখল করা। ফি-বছর পুজোয় অধস্তন অফিসারদের জন্যে শিশুদের ব্যবহার্য সাবান পাউডার ক্রিম শ্যাম্পুর সারা বছরের কোটা উপহার পাবার ব্যবস্থা করে দিতেন উনি।ওঁর বাবা তো এসেছিলেন খুলনা থেকে, কিন্তু কত উন্নতি করেছেন।রিজেন্ট পার্কে জবরদখল-করা জমিতে প্রোমোটারকে দিয়ে কী পেল্লাই এক-একখানা ফ্ল্যাট পেয়েছেন ওনারা তিন ভাই।উঁচু জাতের প্রায় সব উদ্বাস্তু নেতারাই আজ কোটিপতি।উদ্বাস্তু হওয়া ভালো, গরিব হওয়া ভালো, সর্বহারা হওয়া ভালো, এই এলেম বেচেই লালে লাল হয়ে গেল কত লোক। তারা কেবল টাটকা করকরে নোট গুনছে। নমঃশুদ্র উদ্বাস্তুগুলো ফুটপাতে হকারি করছে আজও।

আদিত্যর এখনকার উপরি-দামি চাকরিটা মাঙনায় হয়নি।দেড় লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছিল। বাড়ি বয়ে একজন প্যাংলা ডাকমাস্টার জানিয়ে গিসলো কার সঙ্গে কখন

কোথায় দেখা করলে চাকরিটা হবে। ডাকমাস্টারহীন বাঙালিসমাজ ভাবা যায় না। এরা থানার জন্যে টাকা তোলার অঞ্চলভিত্তিক ঠিকেদারি নেয়। পুলিশে ঢোকার আগে জানতই না আদিত্য যে তথ্য আর সংস্কৃতির এরা বাঙালি জীবনের চাবিকাঠি।

সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের রাত্তির বারোটার পর থেকে খর্চাখরচ না করলে, এমনকী ক্ষমতাধারী স্বজনজ্ঞাতি থাকলেও, সরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন, কেবল মুশকিলই নয়, নামুমকিন।তারপর ফি-বছর বেড়েছে খর্চাখরচের হার।

আদিত্য তো জন্মেছে তার পঁচিশ বছর পর, রজতজয়ন্তীর রাত্তিরে, বর্ধমান জেলার মামার বাড়িতে। কর্মসংস্থান কেন্দ্র থেকে নাম সুপারিশ করাতে লেগেছিল হাজার পাঁচেক, পার্টির তদবির সত্ত্বেও, নইলে বেশি লাগত আরও। ডেসপ্যাচের কেরানিকে কিছু না দিলে চিঠি ছাড়ে না, কিংবা পাঠিয়ে দেয় ভুল ঠিকানায়। কর্মসংস্থান কেন্দ্রের চিঠি দেখে পোস্ট অফিসে দেরি করে সরটিং করবে। আদিত্য প্রতিটি ধাপকে মসৃণ রেখেছিল, করকরে তাজা নতুন নোট দিয়ে, যার আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রাপকের মুখ। অপার বৈভব গড়ে তুলতে চায় ও, আদিত্য। নইলে ওর মতনই, ওর ছেলেপুলে নাতিদের, বনেদি ঘরের ছেলে বলে স্বীকৃতি দেবে না কেউ।

আদিত্যর ঠাকুদ্দার জন্ম উনিশশো পাঁচ সালের ষোলুই অক্টোবর। সেদিন কিছু একটা হয়েছিল বলে পরিবারের স্মৃতিতে ঢুকে আছে তারিখটা। সবরমতী আশ্রমের দরোজা-জানলা বানাবার জন্যে ঠাকুদ্দা গিসলো নিজের বাবার সঙ্গে। অনেক যত্নে বানিয়েছিল দরোজাগুলো। গান্ধি মহারাজ নিজে বলে দিয়েছিলেন যে দরোজাগুলো এমন হবে যে কেউ খুললেই ক্যাঁচোওওওর আওয়াজ হবে, যাতে কেউ ঢুকলেই টের পাওয়া যায়। গল্পটা আদিত্যদের পারিবারিক সম্পত্তি। গান্ধি ইয়েরভাদা জেলে গেলে, নিজের গ্রাম ধর্মশিবপুরে ফিরে এসেছিল ঠাকুদ্দা।উনিশশো উনত্রিশের জানুয়ারিতে বাবার জন্ম।

আওয়াজঅলা দরোজা বানাবার দরুন বাবু জগজীবন রাম ঠাকুদ্দার জন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিল, এরকমটাই লেখা ছিল প্রমাণপত্রে।আদিত্যরা তো ছুতোর, তত নিচু জাত তো আর নয়, তাই জগজীবন রামের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হয়েছিল। আজকাল অমন প্রণামে কোনও কাজ হয়না।প্রণামী চায় সবাই, আদিত্যও চায়।

লেখাপড়া শেখেনি ঠাকুদ্দা। কংরেস সভাপতি ভূপেন বোস পাঠিয়েছিলেন সবরমতীতে ছুতোরের কাজে। ঠাকুদ্দা কিন্তু দূরদর্শী ছিল বলতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর মাসোহারার টাকায় নিজের আর একমাত্র নাতি আদিত্যর নামে যৌথ রেকারিং ডিপোজিট খুলেছিল। পুলিশে চাকরির শুভ কাজে লেগে গেল চক্রবৃদ্ধি। নয়তো অত থোক টাকা একলপ্তে কয়েক বিঘে জমি বেচলেও উঠত না।

গান্ধি মহারাজের সঙ্গের লোকজনদের পায়ের কাছাকাছি থেকে, ঠাকুদ্দা বোধয় টের পেয়ে গিসলো অনেক আগেই, যে দেশটা ভাগ হবে, আর তার দরুন বাঙালিরা এক ধাঁচের লোভী বামপন্থী হবে। তাই জন্যেই হয়তো বাবাকে ইনডিয়ান প্রলেটারিয়ান রিভলিউশানারি পার্টির বিজয় মোদকের বাড়িতে ফাইফরমাস খাটার কাজে লাগিয়েছিল দশ বছর বয়সে। অত বড়ো-বড়ো মানুষের চোপরদিনের গুজগুজ-ফিসফিসের

কাছাকাছি থাকার চাপে আদিত্যদের পরিবারটা ভদ্দরলোক হতে পেরেছে আর ছুতোর-শ্রমিক বদনামটা ঘুচেছে।

নোট গোনা আর কয়েন ওজন করার চাকরিতে, মনে হত আদিত্যর, রোজ কিছু-কিছু সরিয়ে গড়ে ফেলা যাক ধনী হবার তহবিল।কিন্তু ধরা পড়ার কেলেঙ্কারির গ্রাম্য ভয়ে, আর যারা অমন কাজ করে ধরা পড়েছে তাদের হেনস্থা দেখে, বাতিল করেছে সে ভাবনা। তাছাড়া তাতে লেগে যেত অনেককাল। রোজ দুটো-চারটে একশো-পাঁচশো টাকার নোট সরালেও বহু বছর লেগে যেত বৈভবশালী হতে।শুধু টাকা হলেই তো হয় না, সেটাকে খাটিয়ে-খাটিয়ে ফাঁপাতে হয়। এ এস আই এর চাকরিটা ধর্মঠাকুরের পাঠানো। টাকাও আপনা থেকে আসতে শুরু করেছে তাঁর কৃপায়। ধর্মরাজের কৃপায় একদিন-না একদিন রুণু গুহনিয়োগীর মতন প্রভাব-প্রতিপত্তি লোকবল ঐশ্বর্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর গণমাধ্যমের আদরযত্ন পাবে। বাসের সিটে বসেহাতজোড় করে আদিত্য।কপালে ঠেকায়।

সত্যি, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ছাড়া আর গতি নেই, যেভাবে চালাচ্ছিল গাড়িটা, বলতে-বলতে বাস থেকে নামলেন ফর্সা মোটা গলদঘর্ম গৃহবধু কেরানি। সওদাগরি অফিসে এত বেলায় হাজিরে দিলে চাকরি চলে যাবে।নির্ঘাৎ কোনও জনসেবা বিভাগের।

.

০২.

বি-বাদী বাগে বাস থেকে নেমে একটু এগোতে, এক হাড়-ডিগডিগে শতচ্ছিন্ন্ ভিকিরে বউ, কাঁখে পেটফোলা রুগ্ন শিশু, বোধহয় ব্রিগেডের কোনো গ্রাম-ফোসলানো সমাবেশে এসে থেকে গেছে কলকাতায়, ওদের দিকে অনুকম্পা চাইবার হাত বাড়াতে, আদিত্য পাঁচশো টাকার একটা নতুন সবুজ নোট বুক পকেট থেকে বের করে ভিকিরি যুবতীর হাতের ওপর রাখলে, বউটি বলে ওঠে, পাকস্থলী থেকে নিজের দরদ টেনে বের করে আনা কণ্ঠস্বরে, লটারির টিকিট লিয়ে কী করব বাবু? কিছু পয়সা দাওনা ক্যানে, মেয়্যাটা মুড়ি খায়।আদিত্য বউটির হাত থেকে নোটটা তুলে নিয়ে ফুলপ্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো খুচরো ভিকিরিটিকে দিলে, যুবতীর হনু-ঠেলা মুখমণ্ডল কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হল।

আদিত্যর অট্টহাস্য আর অরিন্দমকে শুনিয়ে স্বগতোক্তি, ওফ, এই নিয়ে বোধয় একশোবার হল।

অরিন্দম স্তম্ভিত, হতবাক, থ।

কী, খুব হাসি হচ্ছে দেখছি। ধর্ষণ-টরশন আজকাল কোটা অনুযায়ী ভালোই চলছে তাহলে!অফিসপাড়ার ভিড়ে, পরিচিত কণ্ঠস্বরের মন্তব্যে, দুজনে একসঙ্গে সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, যিশু বিশ্বাস, শেষ যৌবনে খুদে চোখে মিটিমিটি, ফর্সা গোলগাল, চুল অত্যন্ত পরিপাটি, ভ্যান হিউসেন, অ্যালান সলি, লুই ফিলিপে, বেনেটন, অ্যাভাই, রেভলন, রে ব্যান জগতের অধিবাসী।খ্রিস্টান, কিন্তু টের পেতে দেয় না।ব্রাহ্মরা যেমন হিন্দুর ভিড়ে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে আজকাল, যিশুও তাই।মিশুকে।ব্রাহ্মরা নিজেরা

একসঙ্গে জুটলে হিন্দুদের নিয়ে এখনও রেনেসঁসি হাসাহাসি করে। যিশুর অমন জমায়েত নেই। পুলিশে চাকরি করে বলে আদিত্যকে ঠেস দিয়ে বলেছিল কথাগুলো। অরিন্দমের অফিসে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্প বিশেষজ্ঞ ছিল। এখন পার্কস্ট্রিটে নিজের ফ্ল্যাটে কনফারেনসিং যন্ত্র বসিয়ে আন্তর্জাতিক কনসালটেনসি খুলেছে।

আহমেদাবাদের এম বি এ। বিদেশে যায় প্রায়ই। অকৃতদার বলতে যে নৈর্ব্যক্তিক স্ফূর্তি আর আত্মমগ্ন অস্থিরতা। পাতলা ল্যাপটপ কমপিউটার আঁটে এমন ব্রিফকেস।

বড্ডো খোঁচা দেন যিশুদা। আদিত্যর তরফদারি করে অরিন্দম।

আর আপনার আলুর দোষ তো বিখ্যাত। যিশুর মন্তব্যের প্রতিদানে আদিত্য।

যিশু বিশ্বাস অনভিপ্রেত যৌন টিটকিরিতে অভ্যস্ত। হাসল কাঁধ নাচিয়ে। বললে, ঠিক ধরেছিস। মেদনিপুর বাঁকড়ো বর্ধমান গিসলুম হিমঘরের স্টাডি করতে। এখন বারাসাত থেকে ফিরছি। আলু সম্পর্কে আমার সত্যিই দুর্বলতা আছে। মাছ মাংস ডিমের চেয়ে আমার আলু খেতে ভাল্লাগে। কলেজে পড়তুম যখন, প্রফুল্ল সেন আলুর বদলে কাঁচকলা খেতে বলেছিল। তোরা তো সেসব জানিস না, লিকুইড ছিলিস। পয়লা জুলাই বিধান রায় ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়িয়ে বিদেশে হাওয়া হয়ে গিসলো, আর প্রথম ট্র্যামটায় ভবেশকাকা আগুন ধরিয়ে দিলে।

ভবেশকাকা? এই কাকার কথা বলেননি তো আগে? সমস্বর প্রশ্ন। আমরা তো জানতুম আপনি ঝাড়া-হাতপা।

হ্যাঁ, ভাবতে পারিস? স্বাধীনতার পর কলকাতার ট্র্যামের প্রথম মুখাগ্নি। আমরা তখন নাকতলার কাছে থাকতুম। অ্যাতো গরিব রিফিউজিতে ভরে গিসলো ওদিকটা তখন যে কলকাতার লোকে ভয়ে ও-মুখো হতো না। বাবাও বিরক্তি আর ভয়ে বেচেবুচে এদিকে চলে এল। পুরোনো বাড়ির পাড়ায় ইউনাইটেড রিহ্যাবিলিটেশান কাউনসিলের আগুন-খেকো নেতা ছিল ভবেশ মণ্ডল, ইয়া মাসকুলার বডি। পাকানো পেশি বলে একটা কথা আছে না? ঠিক তাই। বাড়িতে না বলে কত্তো মিটিঙ-মিছিলে গেছি ওনার সঙ্গে। কিন্তু বুঝলি, ভবেশকাও একদিন ছোটো বোনকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। হাপিস, নিপাত্তা।

যিশু থামে। চুপচাপ। বাকিটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে দুজনে। এবার হুগলি জেলায় গিয়ে খুঁজে পেলুম ওদের, আশ্চর্য, তিরিশ বছর পর। কথাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে ম্লান উদাসীনতা ছেয়ে যায় যিশুর ফর্সা মুখমণ্ডলে।

গল্পের আশানুরূপ সমাপ্তি না পেয়ে আশাপুরণের অন্য এক গল্পের দিকে যিশুকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আদিত্য। বলে, রাইটার্স থেকে কেটলিসুদ্দু একজন কালো সুন্দরী চা-উলিকে নাকি ফুসলিয়ে নিয়ে গিসলেন? তাও কিশোরী!

তাতে কী? আরে! মেয়েমানুষ মানেই ওসব নাকি? সস-শালাহ! তোকে ওই ট্র্যাফিক সার্জেন্টটা বলেছে, না? নির্মল বেরা না কি যেন নাম? গাণ্ডু কোথাকার। আচ্ছা চলি।

হত্যা আর মৃত্যু থেকে যৌনতার এলাকায় খেলাচ্ছলে পৌঁছে উপশম হল অরিন্দমের। থেকে-থেকে হত্যার দু-দুটো দৃশ্য পুনরাভিনীত হচ্ছিল ওর মগজের প্রসেনিয়ামে। যা

ভালো, তার চেয়ে যা খারাপ, তা বেশি করে মনে পড়ে।আধুনিকতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে সংস্কৃতিবান বানিয়ে ফেলার পর তাকে নির্মমতার ওপারে অন্য কোনও মমতাহীনতায় পৌঁছে দিয়েছে।স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে যে আদিত্যও পৌঁছে গেছে সে জায়গায়।কত সহজে খুনের আতঙ্ক থেকে নিজেকে যৌনতার আমোদে নিয়ে এলো।

পাটনা থেকে কলকাতায় এসে নিজের গাড়ি নিয়ে সরকারি ঝুটঝামেলায় পড়ার পর আদিত্যর সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয়। রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল এক ব্যাটা নিরক্ষর।যারা কলকাতার আদিনিবাসী নয় তারা এই শহরের ওপর তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে নানা ক্যারদানি অবলম্বন করে।বারদুয়েক হর্ন দেবার পর লোকটা সরে যাবে, ভেবেছিল অরিন্দম।সরেনি।ধাক্কাও লাগেনি লোকটার।রাস্তায় পড়ে দুমড়ে-কুঁকড়ে আহত হবার অতিঅভিনয় করতে লাগল, হাতে খবরের কাগজ ধরা। নিখুঁত।আদিত্য পরে খোঁজ নিয়ে জানিয়েছিল যে লোকটা কোনো এক গ্রুপ থিয়েটারে কিশোর মালোর চরিত্রে অভিনয় করে, চাকরি নেই, দুই মেয়ে এক ছেলে আছে। আজকাল অমন পথনাটিকায় যাহোক রোজগারপাতি করে সংসার চালায়।

লোকটা পথনাটিকা আরম্ভ করতেই গোটা আষ্টেক ষণ্ডা পৌঁছে গেল ওর সাহায্যের জন্যে। বাঙুর হাসপাতালে তো মেঝেতে শোবার ওব্দি জায়গা জোটে না রুগিদের ; দুর্ঘটনায় মাথা ফাটলে ব্রেন স্ক্যানিঙের তারিখ পাওয়া যায় সাত মাস পর।ও ব্যাটাকে অরিন্দমের গাড়িতে তুলে ষণ্ডাগুলো নিয়ে যেতেই বেড পেয়ে গেল।সঙ্গের স্যাঙাতদের কি খাতির। তারপর ওদের সঙ্গে থানায় যেতে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নিলে ওসি। থানাতেও কি খাতির ওদের। পরের দিন থানার সামনে ফুটপাত ঘেঁষে নানা গাড়ির কঙ্কালের মাঝে রাখা গাড়িটা পরখ করতে গিয়ে দেখে ওয়াইপার, ব্যাটারি, এসি উধাও ; চারটে চাকাই পালটে টাকপড়া পুরোনো টায়ার লাগানো।আচমকা, ছাঁৎ করে, রক্তের চলকানির মাঝে মনে হয়েছিল অরিন্দমের, ওর পূর্বপুরুষদের এই পশ্চিমবঙ্গটা আর ওর নয়, মারোয়াড়ি আর তাদের ছিবড়েকরা স্যাঙাতদের কবজায় চলে গেছে।

অফিসে শলা-পরামর্শ-উপায় খুঁজতে গিয়ে, লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব ইন্সপেক্টর আদিত্য বারিকের হদিস পেয়ে, গাড়িটা ওই অবস্থায় ছাড়িয়ে এনেছিল রেকার দিয়ে টো করে।আর কদিন থাকলে মেশিনটাও পালটে যেত।কিশোর মালোর চরিত্রাভিনেতাকে আর থানায় খর্চাখরচ দিতে হয়েছিল মোটারকম।

আদিত্য বলেছিল, এসব মেনে নিতে, সব্বাই মানে, মেনে নিলে অসুবিধে হবে না। মেনে নিয়েছে অরিন্দম।মেনে নিয়েছে জনসেবার নতুন সংজ্ঞা।বহুকাল পাটনা শহরে থাকার ফলে অন্যায়, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার, সন্ত্রাস, জোচ্চুরি মেনে নেওয়াটা রপ্ত করে ফেলেছে ও।কিন্তু পাটনায় সবই ছিল রাখঢাকহীন, খোলাখুলি।কলকাতায় সরকারি দফতরগুলোয় সবাই সততার মুখোশ পরে থাকে।মুখোশটার নাম হয়েছে সংস্কৃতি, বঙ্গসংস্কৃতি।

আজকে আদিত্যকে নিয়ে ভোটবাগান গিসলো পাটনা থেকে ওর সঙ্গে আসা রসিক পাসওয়ান নামে পাটনা অফিসের এক চাপরাশির খোঁজে। গাড়িটা পাটনায় অসীম

পোদ্দারের বাবার কাছ থেকে কিনেছিল অরিন্দম। চালিয়ে কলকাতায় এনেছিল ওরা দুজনে, ও আর রসিক পাসওয়ান। অরিন্দম এক রাত্তির কোন্নগরে বাপ-পিতেমোর ভিটেতে থেকে গিসলো, আর রসিক চলে গেসলো হাওড়ায় ওর গ্রামতুতো জ্ঞাতির আস্তানায়। সে আজ দেড় বছরের বেশি হল। অরিন্দম তো এরই মধ্যে এক বছরের জন্যে ম্যানিলায় ট্রেনিঙে গিয়ে ফিরে এসেছে।অফিস পাঠিয়েছিল।

এতদিন হয়ে গেল অথচ ফিরে গিয়ে পাটনা অফিসে যোগ দেয়নি রসিকটা। আশ্চর্য। কদিন আগে পাটনা থেকে মোতিলাল কুশবাহা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে, ভোটবাগান অঞ্চলে রসিকের খোঁজ করার জন্যে। হাতের লেখা দেখে মনে হয়েছিল অতনু চক্রবর্তীর। সম্বোধন করেছে কমরেড। কেউ কমরেড বলে ডাকলে যে মনে-মনে এরকম অস্বস্তি হতে পারে, আগে ঠাহর করার সুযোগ হয়নি অরিন্দমের।

সেই অতনু, যে মাওবাদি কমিউনিস্ট সেন্টার নাকি এম এল লিবারেশানের নেতা, আত্মগোপনের সমাজে থাকে এখন। এককালে পাটনা অফিসে কয়েন-নোট এগজামিনার ছিল মুখচোরা অতনু। গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে নিয়ে গিসলো রসিক, হাজারিবাগের জঙ্গলে, নিখোরাকি খেতমজুরদের ছেলেমেয়েদের গণবিবাহে। মাও-এর লেখা রেডবুক থেকে পড়ে-পড়ে সে-কথাগুলোকেই মন্তর হিসেবে আওড়ে বিয়ে দিচ্ছিল। বিয়ের পরই ভিড়ের সুযোগে অন্ধকার জঙ্গলে অতনু উধাও। কথা হয়নি। এড়িয়ে গিয়েছিল অরিন্দমকে।বিহারি হতদরিদ্র অন্ত্যজদের বাঙালি ব্রাহ্মণ নেতার সঙ্গে মেলাতে বিভ্রান্ত বোধ করেছিল অরিন্দম। এতোই যদি ভয়, তাহলে বিপ্লবটা কেন, কাদের জন্য, ভেবেছিল অরিন্দম।

ভোটবাগান অঞ্চলটা সুবিধের নয় শুনে আদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে গিসলো অরিন্দম।ওখানে এশিয়ার সবচে বড়ো লোহার ছাঁটের স্ক্র্যাপইয়ার্ড।সারসার খুপরি ঘর।অনুজ্বল শ্যামবর্ণ নর-মরদদের পাঁচমিশালি অবাঙালিদের ভিড়। হলদে কমজোর টুনি। জেনারেটারের চাপাকান্না। অশীতিপর পাঁক। মাইকচোঙে পাঁচ-প্রহর লটারি। লোহার কালচে ছাঁট আর ভাঙা-ত্যাবড়ানো লোহার মরচে-পড়া ঠেক।এলাকাটা জুড়ে তেলকালির নড়বড়ে চোগা পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কারখানার সারিসারি ঢাঁচা। পুরো জায়গাটা মনে হয় নারী-বিবর্জিত। ছাঁট আর লোহাটুকরোর সাম্রাজ্যের দখল নিতে শেষ হয় না গান্ধী, গোলওয়লকর, মার্কসের কুলাঙ্গারদের কাজিয়া। ডোম বাগদি দুলে বর্ণাশ্রমের মনুবাদী জেল ভেঙে স্বাধীন হবার পর, আধুনিকতার উন্নতি-তত্ত্বের সাহায্যে বর্ণাশ্রম গড়ে ফেলেছে গামা রসগুল্লা মুন্না কওসর সীতারাম ড্যানি শেখ হিরার প্রজন্ম।ভেবে, রোঁয়ায় আতঙ্ক খেলে যায় অরিন্দমের। এ-ই তাহলে বঙ্গসংস্কৃতি। হা-হা, এরা কি কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছে!

হাওড়া জেলার ভোটবাগানে যেমন লোহার ছাঁটের বাবরি, তেমনি নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে কাঁসা-পেতলের ভাংরি। সুইস ডেভেলাপমেন্ট কোঅপারেশানের আর্থিক সাহায্যে কাঁসা-পেতল কারিগরদের স্টেনলেস স্টিলের শ্বদাঁত থেকে বাঁচানো যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখতে অরিন্দমকে পাঠিয়েছিল অফিস। যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা আজকাল স্টেনলেস স্টিলে খায়। যাদের অঢেল পয়সা তারা খায় লা-ওপালা কাঁচে। গরিবরা এনামেল ছেড়ে ধরেছে অ্যালুমিনিয়াম। রুজি-রোজগার বন্ধ হবার পর

কাঁসারিরা ভিটে ছেড়ে চলে গেছে, কাঁখে কোলে বাচ্চা-বোঁচকাসুদ্দু, কৃষ্ণনগর শান্তিপুর নকাশিপাড়া কালনা মেমারি পাণ্ডুয়া চুঁচড়ো। রাস্তার পাশে খুপরি-দোকানে, কোণে-কোণে দড়িবাঁধা প্লাসটিক চাদরের তলায় হাড়গিলে হাঁটুমুড়ে বসে থাকে তারা, উশকো-খুসকো উদাসীন ঘোলাটে চোখে, স্টোভ কুকার গ্যাসের উনুন সারাবার খদ্দেরের জন্যে। তার ওপর ফুটপাতে বসলেই পুলিশের ডাকবাবু আর পার্টির হাঁকবাবুকে ফি-হপ্তায় কিছু তো অন্তত দিতেই হবে।

মাটিয়ারি গ্রামের সুভাষ খামরুই অরিন্দমকে শুনিয়েছিল সেনকিট হ্যাজাকের গল্প। ব্রিটিশ আমলে কালীগঞ্জ থানার মাটিয়ারির হ্যাজাক কব্জা করে ফেলেছিল কলকাতা ঢাকা কটক লখনো চাটগাঁ।বরযাত্রীরা ফিরতে পারত না সেনকিট হ্যাজাকের জ্যোৎস্না ছাড়া। বিজলিবাতি এসে খেয়ে ফেলল হ্যাজাকসুদ্দু কাঁসারিদের। মোরাদাবাদের কাঁসারিরা বাজার বুঝে মাল পালটে ফেলেছে। সেখানে তো কাঁসারি বাড়ির ছেলে ইন্দিরা গান্ধীর সুন্দরী নাতনিকে বিয়ে করেছে। এখানে দ্যাখেন খামরুইরা বাপ-পিতেমোর কাজ নুকোতে কোর্টে হলফনামা দিয়ে পদবি পালটে ফেলছে।

মাটিয়ারি ধর্মদা মুড়াগাছা সাধনপাড়ার কারিগরদের আর বিদেশি ডলার যুগিয়েও বাঁচানো যাবে না।কাঁচামাল নেই, কাজের সময়ে বিজলি নেই, জেনারেটারের খরচ, রোলিং শিট মেশিনের এস এস আই রেজিস্টারি বন্ধ।ভাংরি দেখলেই উপরির খোঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ বিয়েসেফ শুল্কবাবুরা। থানার ডাকমাস্টারের টোকেনে কারখানাগুলান লাটে। তার ওপর বিক্কিরির টেসকো। কেঁদে ফেলেছিল নরহরি বর্মন, ছাপ্পান্ন বছরের দশাসই। কান্না শোনার, চোখের জল মুছে দেবার, লোক নেই। কাঁসা ভাঙলেই, বললে নরহরি কাঁসারি, নুকোনো কান্না বেরোয় গো।

পাটনা অফিসের সেই সুন্দরী দেখতে মানসী বর্মন, ফোলা-ফোলা আঙুলে টরটরিয়ে নোট গুনত ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে, হঠাৎ চলে গিয়েছিল চাকরি ছেড়ে, অরিন্দমের কলকাতা বদলি হবার ঠিক আগে।ও কি কাঁসারি ছিল? ওর তো প্লেস অব ডোমিসাইল নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে। অমন নয়নাভিরাম আঙুল। মনে হত যেন জ্বরের রুগির কপালে রাখা ছাড়া আর কোনও কাজের জন্যে নয় হাত দুটো। নোট গুনে-গুনে কী ক্ষমাহীন অপচয়।

কী অরিন্দমদা, আপনিও কি কেটলিউলির চিন্তায় মশগুল?

আদিত্যর কথা শুনে, অরিন্দম নিজেকে বলতে শুনল, পাটনা থেকে এক মুহূর্তে কলকাতায় পৌঁছে, হ্যাঁ, চেনো? পরিচয় করিয়ে দাও না।

আরে কী বলছেন কি আবোল-তাবোল। পুলিশের চাকরি করি। যিশুদার না হয় লোকলজ্জা নেই।পুলিশের চাকরিতে লোকলজ্জা ব্যাপারটা অফিশিয়াল।ও আমার দ্বারা হবে না।যিশুদাকেই বলবেন।ভোটবাগানে ফের কবে যেতে চান একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন।

আর যাব না, বলল অরিন্দম।ভোটবাগানের হত্যার মাঝে দাঁড়িয়ে তখনই মগজে তৈরি হয়ে গিয়েছিল উত্তরটা। তারপর আদিত্যর প্রত্যাখ্যানের জবাবে বলল, পুলিশ তো

পশ্চিমবঙ্গে সত্যের মালিক।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

.

০৩.

মোকররি আর চাকরান মিলিয়ে বাহান্ন বিঘে জমি আর একলাখ কুইন্টাল ক্ষমতাসম্পন্ন মোমতাজ হিমঘরের অংশীদার, পঁয়ষট্টি বছরের গেরুয়া-পোশাক, বাঁ হাতের সরু-সরু তামাটে আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে-থাকা সাদা ধবধবে দাড়ি, কালো-ফ্রেম গ্রাম্য বাইফোকাল, বাবরিচুল ভবেশ মণ্ডলকে হুগলি জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে দেখে যতটা স্তম্ভিত হয়েছিল, তার চেয়েও অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় নির্বাক আনন্দে ছারখার হয়েছিল যিশু, ভবেশকার বোন খুশিদিকে দেখে।খুশিরানি মণ্ডল।

কাঁসার বগি থালায়, কম্বলের আসনে খেতে বসে, প্রথম গ্রাস মুখে তুলে, তিতকুটে লাগায়, যিশু বলে ফেলেছিল, এ বড্ডো তেতো নিম-বেগুন, আপনাদের দেশে নিমপাতা একটু বেশি তেতো বউঠান।সরাসরি যিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে খুশিদি বলে উঠেছিল, নিমপাতা নয়, একে বলে বামমি শাগ, খেলে মাথা খোলে।আমি কি তোর বউঠান?

তিরিশ বছর পর শোনা পরিচিত কণ্ঠস্বরে যিশু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। ওর সামনে, হাতে হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে, ন্যাতানো আনারদানা জামদানিতে খুশিদি, ভবেশকার সৎ বোন। বিস্ময়ের নিষিদ্ধ স্বগতোক্তিতে বলে ফেলেছিল, আরে খুশি, খুশিদি, আর স্বাভাবিকভাবেই তাকিয়েছিল গম্ভীর ভবেশকার দিকে। মুখাবয়বে দ্রুত বদল ঘটতে দেখল চাষি মেয়ে আর গ্রামীণ ক্ষমতাকেন্দ্রের মালিক দাদার। ভবেশকার চাউনিতে বিদ্যুৎগতি তিরস্কার। বোধহয় ওঁর ছোটো বোনকে চিনতে না পারায়। আজকাল গ্রামগুলোয় সত্যের স্বামীত্ব ভবেশকাদের হাতে।

এই বয়েসেও খুশিদিকে দেখতে কত ভালো।অচেনা শব্দ খুশিদির কণ্ঠে, না-বলা কথা গিলে ফেলার আওয়াজ, অনেকটা হেঁচকির মতন।কণ্ঠ বেয়ে কান্নার ঘূর্ণি চলে এসেছে চোখের ডাগরে, মুখ না তুলেই টের পায় যিশু।

সূর্যনগরে আমি একটা অশথগাছ পুতেছিলুম।সেই গাছটা আচে? প্রসঙ্গ খোঁজে খুশিদি। তুই কেমন আচিস রে যিশকা?

হ্যাঁ, সেটা তো এখন গাছতলা নামে বিখ্যাত।অনেক বাস ছাড়ে গাছতলা থেকে।তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না।গাছটা বিরাট হয়ে গেছে।উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছে। আদিগঙ্গার ওপারেও গিজগিজ করছে বাড়ি। তুমি কি ভাবছ এখনও ধানখেত আছে সেখানে? যিশু কাঁধ নাচিয়ে নিজের স্বাভাবিক হাসি উপভোগ করে।যিশু আবার তাকায় খুশিদির মুখের দিকে, আর আমূল আক্রান্ত হয় ভারাক্রান্ত স্মৃতিতে। অশথথ গাছটার গোড়ায় একটা ঠাকুর আছে কী যেন।

নমঃশুদ্রদের খুন ধর্ষণ বাড়িঘর জ্বালিয়ে যখন তাড়ানো হয়েছিল খুলনার মাইড়া গ্রাম থেকে, পঞ্চাশ সালে, যুবক ভবেশকা রাতারাতি পালিয়ে এসেছিল কচি ফুটফুটে সৎ বোনকে কোলে নিয়ে। ভবেশকার ঠাকুমা দাদু বাবা মা দাদা বউদি কেউ বাঁচেনি। ভবেশকার সৎ মা নিশ্চই ফর্সা আর সুন্দরী ছিল।অনেক জমিজমা ছিল ওদের, নয়তো অমন ভালো দেখতে দ্বিতীয় পক্ষের বউ কী করেই বা পেয়েছিল ভবেশকার বাবা। উদবাস্তু কলোনির চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যেও অনেকের ঈর্ষা উদ্রেক করত খুশিদির চাঞ্চল্য। ডান চোখে তিল।কাঁদলে থুতনিতে টোল পড়ত।নিটোল টোল।

তিরিশ বছর আগে আরামবাগি প্যাচে কংরেসি আলুর দাম হঠাৎ বাড়লে, খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলোয়, তুলকালাম করেছিল ভবেশকা। তাঁমাটে পেশিতে দোহারা, ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত, একদিনের খোঁচা-খোঁচা, নোংরা ধুতি-শার্ট, থমথমে চোখে-মুখে চেঁচাত, দেশভাগ আমরা চাইনি। হাতে পেলে জহোর্লাল জিনহাকে চিবিয়ে পোস্তবাটা করে।

আর আজ হিমঘরের অংশীদার ভবেশকা, সংরক্ষণের ক্ষমতার দ্বিগুণ আলু হিমঘরে ঢুকিয়ে দুলাখ কুইন্টাল আলু পচিয়ে, সেই একই হুগলি জেলার চাষিদের ভয়ংকর বিপদে ফেলেও নির্বিকার। আলু পচেছে আরও অনেক হিমঘরে। চাষির মুখের দিকে তাকালে সর্বস্বান্তের সংজ্ঞা টের পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে টোটো ঘুরে, ব্রিফকেসে ফ্লপি আর ল্যাপটপ, তিন রকমের হিমঘর দেখেছে যিশু : একলাখ কুইন্টালের বেশি, পঞ্চাশ হাজারের বেশি, পঞ্চাশ হাজারের কম।কৃষি বিপণনের বাবুদের তোয়াজে তেলিয়ে লাইসেন বের করতে হয়,হেঃ হেঃ, বলেছিল মোমতাজ হিমঘরের ক্যাশিয়ার শাসমল।তাও দাঁড়িয়ে যাবার পর তদারকিবাবু দেকে গেলে, মাত্তর দুবছের জন্যে, বোঝলেন, আবার দেবা-থোবার পালা, হেঃঁ হেঃঁ হেঃঁ।যে দেবে তাকে তো তুলতেও হবে, হেঃঁ হেঃঁ।

ষাট হাজার কুইন্টালের হিমঘরে পাঁচতলা চেম্বারটা একশোদশ ফিট লম্বা, একশো আট ফিট চওড়া, ছাপ্পান্ন ফিট উঁচু। প্রত্যেক তলায় বারোটা করে তাক। মদ্যিখান দিয়ে যাতায়াতের জন্যে আড়াই ফিটের গলি।চ্যাঁচারির চালি দিয়ে আলাদা ভাগ-ভাগ করা থাকে তাকগুলো, যাতে তালাবন্ধ হাওয়া মনের আনন্দে খেলতে পারে চেম্বারের মধ্যে। সবচেয়ে ওপরে ছয়টা কনডেসেট কয়েল।তার ওপর ঘোরে ছাদপাখা।দেয়ালে চল্লিশ মিলিমিটার আর ছাদে আশি মিলিমিটার থার্মোকোলের পলেস্তারা।

আরও, আরও টাকা করার পাঁয়তাড়ায় ভবেশকারা চলাফেরার আর হাওয়া খেলার জায়গাতেও ঠুসে দিয়েছিল বাড়তি বস্তা।তার ওপর বিজলির গোলমালে তাপের গুমোট বেড়ে গিসলো। শীতে জমে যাবার বদলে, অফিসযাত্রী প্রায়ভেট বাসের ভিড়েঠাশা প্যাসেঞ্জারদের মতন আলু ভেপসে গলদঘর্ম।

কার জন্যে টাকাকড়ি জমিজমা চাই ভবেশকার, নিজেকে নিজে নিঃশব্দে প্রশ্ন করে যিশু বিশ্বাস!

হিমঘরের আয়ু তো কুল্লে ষাট বছর।মেশিনঘরে থাকে সিনকো, কির্লোসকার, অশোক লেল্যাণ্ড, ক্রম্পটনের কমপ্রেশার, তেল-ইঞ্জিন, ইনডাকশান মোটর, ডিজেল জেনারেটার, অ্যামোনিয়া ট্যাঙ্ক, অয়েল সেপারেটার পাম্প, রেফ্রিজারেশান পাইপ। খড়গপুর আই-আই-টির মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার যিশুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে-দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল জাবেদালি ঘরামি।শিক্ষানবিশের মতো মাথা নেড়েছে যিশু, ও, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই বুঝি, কেন, ঠিক, বুঝেছি।

বৌজলেন বিশ্বেস মোসাই, ছাব্বিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হপ্তা রেকে দেয়া যায় আলু, পঁয়ত্রিশ থেকে আটতিরিশ ডিগ্রি ফারেনহাইটে, বললে ম্যানেজার, নাক সামান্য ফুলিয়ে। দাম বাড়লে অসময়ে বিক্কিরির ঘামের দাম পায় চাষি।

কিন্তু পচ ধরে তো জলের দরে বিকোচ্ছে?

আসছে বছর দ্যাখবেন।আলুখোরদের বাঁশ দেবে চাষিরা।

খাতাপত্তরে ফি-বছর লোকসান দেখান কেন? মাল তো লোডিং হয় অনেক বেশি? আপনার নাম তো কৃপাসিন্ধু, না?

ও আপনেরা কলকেতার লোক, বুজবেন না।গ্রামে তো আর খবরের কাগজের রাজনীতি হয় না।

চাষবাসের ব্যাপার, সত্যিই, এভাবে জানা ছিল না যিশুর।কারখানার রাজনীতি, স্কুলের রাজনীতি, অফিসের রাজনীতি, চাষের রাজনীতি, সবই আলাদা।

আলুর চাষ শুরু হয়েছিল নভেম্বরে, শুরু হয়েছে রাজনীতির হালখাতা।এক হেক্টরে দুশো থেকে আড়াইশো কুইন্টাল ফলন হয় আলুর।প্রথম ফসল জানুয়ারিতে।বাজারের জন্যে। নতুন ধবধবে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ আলু, দামটা ভালো পাওয়া যায়, ফড়ে মেড়ো কাঁচা-বাজারের দালাল ওপরপড়া পার্টিদার সত্ত্বেও।

আজ্ঞে মুসুলমান রাজার আমলে যেমন ছিল তালুকদার দফাদার পত্তনিদার তশিলদার মজুমদার হাওলাদার, এই আমলের কালে স্যার হয়েচে পার্টিদার, আজগালগার জমিদার। বলেছিল পুড়শুড়ার নিতাই মাইতি, ডাকবাংলোর কেয়ারটেকারের বড়ো ছেলে। যিশু কোনো চাকরি করে না, বুদ্ধি বিক্রি করে, শুনে ঠাহর করতে পারেনি চাকুরিপ্রার্থী ছোকরা।

হিমঘরে রাখার আলু ওঠে ফেবরারির শেষাশেষি, বলেছিল জাঙ্গিপাড়ার নারায়ণ পোড়েল, ওখানকার হিমঘরের সুপারভাইজার, টাকমাথা, থলথলে, ময়লা। চাষিরা গোরুর গাড়ি আর মিনিট্রাকে চটের বস্তা ভরে আনে।হুগলি বর্ধমানে ষাট কেজিতে এক বস্তা।মেদিনীপুরে পঞ্চাশ কেজি।বস্তাকে বাংলায় বলে প্যাকেট।একখপ গোরুর গাড়ি মানে পাঁচ থেকে দশ কুইন্টাল, বলদ অনুযায়ী। আজ্ঞে বাঙালি বলদেরা তো আর হরিয়ানার থারাপারকার বলদের মতন তাগড়া নয়। মিনিট্রাকে পঁচিশ থেকে চল্লিশ কুইন্টাল।তায় আবার ফি-বছর ডিজেলের দাম ডবল-ডবল বাড়ছে।হিমঘরে লোডিঙের সময় দেড়শো আর আনলোডিঙের সময় আশিটা কেঁদো মজুর আসে মুর্শিদাবাদ থেকে, সারা পশ্চিমবঙ্গের হিমঘরে।নারায়ণ পোড়েল সিগারেটের টুসকি ঝাড়ে।মজুরগুলোকে

আনে ওদের সরদার।বহরমপুরের কাসিমুদ্দি কাঠামি।সে দুদিকেরই ভাগা আর কমিশন খায়।

আপনি তো হিমঘরে কাজ করে টেম্পো কিনে ফেলেছেন পোড়েলবাবু, মাইনেপত্তর ভালোই পান বলুন।ধনেখালি হরিপাল লাইনে চলে টেম্পোটা।

না-না, কে বললে, এ আবার মাইনে নাকি।সরদারদের কাছ থেকে, মাটিঅলার কাছ থেকে, বাছনদারের কাছ থেকে, চাষির কাছ থেকে, টাকা খাই।বস্তা পিছু ঘুষ নিই, ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ এবিলিটি।আরে বিশ্বাসবাবু, এদিকের মাল ওদিকে না করলে কেউই সুস্থ জীবন কাটাতে পারে না।টাকা ছাড়া শান্তি কই।আমার ওসব ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই।যিশুকে হতচকিত করেছিল নারায়ণ পোড়েল।

সত্যবাদীরা আজও আছে পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গসমাজে।

ঠিকাছে, তারপর বলুন।ল্যাপটপে টাইপ করতে থাকে যিশু, শুনে-শুনে।পেছন থেকে গ্রামীণ খোকাখুকুরা দেখতে থাকে পদিপিসির মার্কিন বাকসো।

যে আলু রাখছে তাকে হিমঘর একটা রসিদ দ্যায়।তাতে তার নাম, সাকিন, আলুর হাল, ওজন, ভাড়া, বিমাখরচ দর্জ।এই রসিদটা বিক্কিরি করা যায়।কিনে কবজা নেয়া যায় আলুর।শ্যালদা বাজারের কাঁচা ফড়ে, বড়োবাজারের মেড়ো, হিমঘরের মালিক, পঞ্চায়েতের পাঁচুরা সময়মতন রসিদে কোপ মারে।সে এক জবর লড়াই।পার্টিবাবুরাও মারচে আজগাল।

হ্যাঁ, বলে যান, বলে যান।

প্যাকেটগুলো ঠিক জায়গায় রাখা, নম্বর লেখানো, মেলানো, এসব আমিই তদারকি করি।পনেরো দিন থেকে মাস খানেক লেগে যায় লোডিঙে।লোডিঙের দুদিন আগে থেকে মেশিন চলে।চেম্বারের তাপ দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনতে হয়।লোডিঙ যেমন-যেমন এগোয়, ভেতরের তাপ বেড়ে সাত ডিগ্রিতে ঠেকে।আলুর বুকের গরুমটা বুঝুন থালে।চা খাবেন নাকি?

না-না, আগে শেষ করুন।

হ্যাঁ, কী বলছিলুম যেন? ও, হ্যাঁ।তাপ বেড়ে গেলে তাকে নামিয়ে আনতে হবে আবার দেড় ডিগ্রিতে, একটু-একটু করে, টানা একমাস।যদ্দিন আলু থাগবে, বজায় রাখতে হবে দেড় ডিগ্রি।আর্দ্রতা রাখতে হবে পঁচাত্তর শতাংশ।দুঘন্টা অন্তর কমপ্রেশার পাম্প, জেনারেটার চেম্বারের তাপ, বাইরের তাপ চেক করেন অপারেটারবাবু, সুকান্ত যুগি।ওই যিনি তখন মুটিয়াদের কাছ থেকে তামাকপাতা নিচ্ছিল, মোটামতন, জাতে তাঁতি, সিপিয়েম, এখন তৃণমূল।আলুর দম খাবার সময়ে এই খাটনির হ্যাঙ্গাম কে-ই বা জানতে পারে।

বুঝেছি।তারপর?

মে মাস থেকে আলুর বস্তা বের করা শুরু হয়।চলে সেই আপনার নভেম্বর ওব্দি। শুকোবার ছাউনিতে এনে রাখা থাকে।বীজ আলুকে কিন্তু শুকুলে চলবে না।শুকিয়ে

ছোটো-বড়ো ছাঁটাই করে বাছনদাররা।আজগাল অবশ্যি সিঙুর থানার রতনপুরে বিরাট খোলাবাজারে কিংবা আপনার বদ্যিবাটি আর তারকেশ্বর রোডের আড়তে চাদ্দিক থেকে আনা মাল ফেলে বাছাই করাচ্ছে ব্যাপারি। সস্তা পড়ে। বাছনদারদের চাগরি নেই। বাছনদাররা তাই ইউনিয়ান করেচে।ঝাঁটের বাল তাতে আর কার কী! অমনেও মরবে এমনেও মরবে।

জানি।বদ্যিবাটি তারকেশ্বরে গিসলুম।তা ফড়েরা চাষিদের রসিদ কিনে রাখে বলে নম্বর মিলিয়ে ওরা মুটিয়া দিয়ে নিজেরাই মাল বের করায়।চাষিরা মাল ছাড়াতে এলে ওৎ পেতে থাকে ব্যাপারির লোক। হিমঘরে মাল রাখা বাবদ তিন থেকে পাঁচ শতাংশ শুকোবার জন্যে বাদ যায়। তা নিয়েও নিত্যিদিন কিচাইন।নভেম্বরের পরেও হিমঘরে মাল পড়ে থাগলে বাড়তি ভাড়া দিতে হবে।ডিসেম্বরে মেরামত, চালিবদল, ওভারহলিং, কনডেনসার পাইপ পোস্কারের কাজ।নতুন রঙের পোঁচ পড়ে।

কী, তুমি খাচ্ছ না? ভবেশকার কথায় নিঃশব্দ গলাখাঁকারি ছিল। চেতনার ঝটকায় জাঙ্গিপাড়া থেকে সোজা শেষপুকুরে পৌঁছে যায় যিশু।সারাতির শেষপুকুর গ্রামে।

হ্যাঁ, ন্যাকোরচোকর করচিস।বলল খুশিদি।

কী বলবে ভাবতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হল যিশুর।বলল, তোমরা না চাইলেও ঠিক খুঁজে বের করেছি তোমাদের।বের করতুমই একদিন।

ময়ূরভঞ্জের রানির কুঠির কাছে ছিল না তোদের বাড়ি।এখনও চোকে ভাসচে।মনে হচ্চে এই তো সেদিন।সবকিচু পালটে গেচে, না রে যিশকা?

রানির বাড়ি এখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আমাদের বাড়িটা একটা কারখানা কে বেচে দিয়ে আমরা তো বহুকাল পার্কস্ট্রিট চলে গেছি।

তা ভালো করেছ।পার্কস্ট্রিট তো দামি জায়গা, সোনার খনি।ভবেশকার বৈষয়িক মন্তব্য।

থালা থেকে মুখ না তুলে একের পর এক পদ গিলছিল যিশু। সারা বাড়ি চুপচাপ। ভবেশকার পুঁইডাঁটা চেবানো দাঁতহীন শব্দ।খেয়ে উঠে, কালো রঙের কাঠের চেয়ারের হাতলে তোয়ালে।যিশুর জন্যেই তোয়ালেটা বেরিয়ে এসেছে কাপড়ের গাদা থেকে।মুখ মুছতে গিয়ে আলতো ঘ্রাণ টানে যিশু। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত খুশিদির অমোঘ সুগন্ধ রয়েছে এতে, সংস্কৃতির কৃত্রিমতামুক্ত প্রকৃতির গন্ধ।

তুমি একটু শুয়ে জিরিয়ে নাও।আমি দেখিগে, জালি বণ্ডের খবর পেয়েচি।বলতে-বলতে বাড়ির বাইরে বেরোয় ভবেশকা, খালি পায়ে, গোড়ালি ওব্দি ঝুলে আছে টেরিকটের গেরুয়া আলখাল্লা।পঞ্চায়েতের মাদারির খেল খেলতে যাচ্ছে বোধহয়।

.

০৪.

কোনও ডুবন্ত জোতদারের থেকে কেনা, সাবেকি মেহগনি পালঙ্কে শুয়ে, কলকাতা থেকে তিরিশ বছর আগে ভবেশকা আর খুশিদির আচমকা হারিয়ে-যাওয়া আর আজকে

তেমনিই হঠাৎ খুঁজে পাওয়ায়, যিশুর ভাবনায় অনির্বাণ আহ্লাদ খেলছিল। ব্যাটমে তোলা নেটের মশারি। শিমুলের ধবধবে বালিশ। এমব্রয়ডারি নেই। ছোট্ট মোটা কোলবালিশ, পা রাখার জন্যে।বারান্দায় টালির চাল।শালি-শুনা জমি ইঁটভাটার জন্যে ব্যবহার বারণ বলে টালির খোলা তো উঠেই গেছে বলতে গেলে।দেয়ালে পুরোনো আমলের লম্বাটে আয়না।পেরেকে চাবির গোছা ঝোলানো।সঙ্গেকার তাকে কাঁকুই। দেয়ালে ঝাঁকড়া হাসছে সত্য সাঁইবাবা।

ভবেশকা বোধয় এ-ঘরেই শোয়।খুলনার বাড়িতে হুবহু এরকম ঘরই ছিল হয়তো। গ্রামের মানুষও আজকাল এভাবে থাকে না।শহর তার রঙিন উস্থিতি জানাবেই, শহুরে বিজ্ঞাপন ঘরের কোনে-কোনে আক্রমণ করতে পারে, ছাড়ান পাওয়া সহজ নয় ।শহর মানেই তো দাপটের কেন্দ্র।খুশিদির ঘরটা কেমন কে জানে।ঘর তো বেশ কয়েকখানা। দুজন মোটে লোক।

দেয়ালে-বসানো আলকাৎরা রঙের লোহার সিন্দুক, দিশি।কিছুক্ষূণ দ্বিধাগ্রস্ত থাকার পর আলতো পায়ে বিছানা থেকে নেমে, চাবির গোছাটা নিয়ে বারকয়েক কৌতুহলী চেষ্টা করতে খুলে যায় সিন্দুক।আলুর বণ্ডের বই, পাকিস্তানের পুরোনো একশো টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল, উনিশশো পঞ্চাশ সালের হলদে খড়খড়ে পাকিস্তান অবজার্ভার আর দৈনিক আজাদ, দুটো একই মাসের।একটা ছবিসুদ্দু বিঞ্জাপন লাল কালিতে ঘেরা। লাল শালুর পাক খুলে শতচ্ছিন্ন বইটা, গীতা নয়, লুপ্ত সোভিয়েত দেশে ছাপানো 'দাস ক্যাপিটাল', এত বছর পরও মোষের খুরের শিরীষ-আঠার ভকভকে স্তালিনি গন্ধ। সংগ্রাহকের জন্যে গর্বাচভের সৌজন্যে বইটার সোভিয়েত সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য। সিন্দুক বন্ধ করে পালঙ্কে ফেরে যিশু।

পাড়সুতোর নকশিকাঁথা চাপা দিয়ে, ভাতঘুমের অলস তন্দ্রায়, অতীতে ভাসছিল ও, যিশু।ষোলো বছর বয়সে কুড়ি বছরের খুশিদিকে ছোঁয়া, বাহু ধরা, চুলে নারকোল তেলের গন্ধ।স্মৃতির আলতো জলপোকা।

কোথাও দুপুর-কোকিলের চোরা-কুহু।পশ্চিমের জানলায় থোকা-থোকা ফিকে হলুদ নোড়ফল ঝোলানো গাছটার পেছনে মঞ্চস্থ হচ্ছিল সূর্যাস্তের দ্বিপ্রাহরিক মহড়া।

কাজের সময় কোকিল ডাকে, ভাল্লাগে না বাপু।কপালে খুশিদির স্পর্শ আর কণ্ঠস্বরে অস্বস্তিকর অস্থিরতা।যিশুর তন্দ্রায় ঝনৎকার ঘটে।যিশুর শিরা-উপশিরা, যা টানটান বাঁধা, ছিঁড়ে গেল, আর শ্বাসনালিকায় মোচড় দিয়ে ওঠে অদম্য বিষাদ।

তোমার বরের কী হল খুশিদি?

কেঁপে উঠেছে খুশিদির চোখের পাতা, মুখমণ্ডলে অবিশ্রান্ত ক্লান্তি, হৃৎপিণ্ডে অশ্রুপতনের টুপটাপ।

বিয়ে আর হল কই! চারটে মোটে শব্দ, অথচ, অথচ জ্যোৎস্নায় ডোবা ভুতুড়ে ঝিলের মতন নিস্পন্দ।বর্ধমান জেলার ছুতোর গাঁ'র সহদেব মণ্ডলের বড়ো ছেলে এখানের উপসাসথো কেন্দ্রে কাজ করতো, আমাকে দেখতে পেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল একাত্তর সালে।দশঘরার পোড়ামাটির পরি বলেছিল আমাকে দেখে।পালটি ঘর ছিল,

কাসসপ গোত্তর। খুন হয়ে গেল। ধড় পাওয়া গেসলো, মাথা পাওয়া যায়নি। সবাই বললে, নকশাল ছিল, তা-ই। দাদাও সে কথাই বলেছিল। দাদা কী করে জানবে বল? নকশাল তো ছিল ছোটো ভাইটা। নকশাল করলে বিয়ে করতে চাইবে কেন, বল? গোপের হাটের আড়তদার রামরতন মণ্ডলও বিয়ে করতে চেয়েছিল। পনেরো বছর আগের কতা। দোকানে আগুন লেগে জ্যান্ত পুড়ে মারা গেল সে। আমি খুব অপয়া। খুশিদির চোখের নাব্যতা হয়ে ওঠে অতল। তুই কেমন আচিস যিশকা। কতো বড়ো হয়ে গেচিস, লোক অ্যাগবারে।

দশঘরা অঞ্চলের টেরাকোটা, মাটির তলায় পুঁতে, তার ওপর মাস ছয়েক জলছড়া দিয়ে, কয়েকশো বছরের প্রাচীন আর দুর্মূল্য করে তোলার খবর জানে যিশু। দেখেছে। সন্তর্পণে ও বলল, অজানা ইনোসেন্ট নারীজীবনে প্রবেশ করে নিজেকে পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে, আমার সঙ্গে যাবে খুশিদি? আমার কাছে? পঞ্চাশ বছরের একজন বালিকাকে কাছে পাবার ক্ষমতাকে দুর্জয় করে তুলতে, উঠে বসেছিল যিশু। ওর কথার ঈষদুষ্ণ ভাপে, সালোকসংশ্লেষে অক্ষম স্বর্ণলতার মতন খুশিদি যখন যিশুর কাঁধে মাথা রেখে, হ্যাঁ জানায়, রেশমগুটির মধ্যে তুঁতপোকার মতন ভাবাবেগের আরাধ্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে ও, যিশু।

আমার শরীর কেমন-কেমন করচে। বুক ধড়ফড় করচে। কিছু আবার হবে না তো। বলেছিল সন্ত্রস্ত খুশিদি, আর যিশু উত্তর দিয়েছে, হোক, হওয়া দরকার, এরপর আর সময় নেই।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেচিস। ঠিক সময়ে পাকা ফসল তুলে না নিলে শুকনো সরষেও তো খেতে ঝরে যায়, বল? তোর কিচু হবে না তো? কাঁধ থেকে মাথা তুলে, চুলে নারকেল তেলের পরিচিত গন্ধ, যিশুর মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চেয়েছে খুশিদি, আর তারপর বলেছে, আমার কাচে তুষলাব্রতর সরষে আর মুলোফুল আচে। তোর বাকসোয় রেকে নিস।

তুমি ব্রত করো? কী-কী ব্রত করো? যিশু কাঁধ নাচিয়ে হেসেছিল, শব্দহীন, যাতে রাহু কেতু অশ্লেষা মঘা বসতে না পারে ওর গায়ে। ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফরিকার বহু নারীর হার্দ্র সঙ্গ কাটিয়েছে ও, যিশু। কিন্তু এই প্রথম একজনকে মনে হল আধুনিকতার স্পর্শদোষ থেকে মুক্ত ; সমূল নিসর্গপ্রকৃতির অন্তর্গত।

হাসচিস কি! ব্রতর অনেক গুণ। এই তো শাবনমাসে মনসার ব্রত করেছিলুম। পান্তাভাত আর সজনে শাগের পেসাদ খেতে হয় তখন। তারপর ভাদ্দরে চরাচরি ব্রত করি। চরাচরি পুজোয় সব রকুমের পিঠে ভাজা হয়। আশিন সংক্রান্তিতে পিঠে-পুলি খেয়ে খেতে নল দিতে হয়। ভাদ্দরে জল, আশিনে নল, ধান ফলে গলগল, শুনিসনি? পোস মাসে পোসতলা ব্রত করি। শাঁক বাজিয়ে চাল দুধ ফল ফুল গোড়ায় দিয়ে পাঁচ গাচা ধান তুলতে হয় পোসতলায়। যখন নতুন-নতুন এসছিলুম শেষপুকুরে, গাছতলায় বিলরান্না করতুম। আজগাল আর হয় না। বডডো ঝগড়াঝাঁটি হয় গাঁয়ে। ঘেঁটুব্রতর গান জানতুম আগে। সবায়ের বে-থা ছেলেপুলে হয়ে গেল। কথা বলার সময়ে খুশিদির হাত নাড়া দেখে মনে হচ্ছিল বাতাসের তোশক সেলাই করছে।

চাষবাস, গ্রামজীবন থেকে বঙ্গসংস্কৃতি এখন গিয়ে পৌঁছেচে কলকাতা শহরের শেকড়হীন নাচাকোদা, বাজনা-থিয়েটারে।পশ্চিমবাংলার ভূজমিন থেকে আর সংস্কৃতির সত্য অঙ্কুরিত হয় না। তা নকল কায়দায় পয়দা হয় অকাদেমি, অ্যাকাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম, সরকারি দপতর, পার্টি অফিসে। খুশিদিই হয়তো শেষ বাঙালিনি।

একবার ভবেশকার সঙ্গে মিছিলে হাঁটার সময়ে গলা ঢেলে গান গেয়েছিলুম তোমায় শুনিয়ে, মনে আছে?

মনে নেই আবার? বাঙালদের মিছিলে গিসলি বলে পিটুনি খেয়েছিলি।খুশিদির চোখের কোলের অনিশ্চয়তার কালি কিছুটা কমে। চোখের কোলের কালির জন্যেও নারীকে ভালো দেখায়, আশ্চর্য। নৈকট্যের ঝাপটায় গড়ে ওঠে অজ্ঞাতসার। যিশু দুহাতে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে শেষতম বাঙালিনিকে।

অ্যাই, কী হচ্ছে কী, পাগল নাকি, ভালোবাসা এমনি করেই জানাতে হয় বুঝি? ছাড়াবার চেষ্টা না করে, গলা নামিয়ে বলল খুশিদি। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যিশু গনগনে ঠোঁট বুলোয়, রুদ্ধশ্বাস, ত্রস্ত। সিনেমা দেখে, টিভি দেখে, উপন্যাস পড়ে, মানুষ-মানুষীর যৌনতার বোধ কলুষিত হয়ে গেছে, সর্বজনীন হয়ে গেছে। খুশিদির জৈব প্রতিদান, বোঝা যাচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত নয়।

থুতনির টোল কাঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে ওঠে খুশিদি ; বলল, আয়, ভেতরের ঘরে চল যিশকা।

যিশকা নামে ডাকার আর কেউ বেঁচে নেই। ডাক-নামের মৃত্যু মানুষের জীবনে জলবিভাজক।তার অস্তিত্বে যে যিশকা নামের কেউ একজন কখনও ছিল তা টের পেল যিশু, এতদিন পর।বহুকাল, বহুকাল, বহুকাল পর।

খুশিদির কোমরলগ্ন যিশু, খুশিদির ঘরে, সেগুনকাঠের নিচু খাটের ওপর, খুশিদিকে আবরণমুক্তির সময়ে, খুশিদি বলল, পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চলল, কেউ কখনও আদর করেনি আমায়, আদর করার মতন কিছু আচে কিনা তা-ও জানি না, কেউ ভালোবাসে না আমায়, কেএএএউ নয়।আমি খুবই অপয়া।

উদোম স্বাস্থ্যবতী চাষি-প্রৌঢ়ার প্রগাঢ় চাউনির দিকে তাকিয়ে, ফুঁ দেবার মতন আলতো কণ্ঠস্বরে যিশু বলেছে, ওসব বোলো না। জানি, পনেরই আগস্ট তোমার জন্মদিন করত ভবেশকা।তোমাদের কলোনিতে তা দেখে গালমন্দ করত অনেকে, আর ভবেশকা তাতে কান দিত না।এসো, আমি চোখ না বুজে তোমায় তিরিশ বছর পেরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শরীর জুড়ে ঠোঁট বোলায় যিশু আর প্রতিবার বলে তুমি অনন্যা, তুমি অনন্যা, তুমি অনন্যা, তুমি অনন্যা, তুমি অনন্যা।

যিশু অস্ফুট বলতে থাকে, তোমার মুখের ভেতর থেকে রক্তচন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে, তোমার ঠোঁটে মধুপর্কের স্বাদগন্ধ, আম্রপল্লবের গন্ধ তোমার চোখের পাতায়, কানের লতিতে রক্তপদ্মের পাপড়ি, তোমার চুলে দুর্বাঘাসের সুবাস, তোমার এই হাতে কাঁচা ধানের সুগন্ধ।বেলপাতার সবুজ গন্ধ তোমার পায়ে, তোমার বুক থেকে ডাবের জলের

গন্ধ পাচ্ছি। আআআআআআআঃ। কী মাখো তুমি? অ্যাঁ? কী মাখো? কী মাখো? কী মাখো? আলো? জল? বাতাস? সময়? কী মাখো?

চুপ করিসনি, তুই বলতে থাক রে, তুই বল। কিচ্ছু বুঝিনে তুই কী কইছিস, তবু তুই বল, বলতে থাক। আমি মুকখু। নাকতলায় তো তখনই ইশকুল হলো। লেকাপড়া শেখায়নিকো। মুকখু, জানি আমি মুকখু। ঠোঁট দিয়ে খুশিদির চোখের কোল থেকে, অশ্রু পুঁছেছে যিশু। খুশিদির নাভি ঘিরে জেগে ওঠে নরম পরাগ-রোঁয়ার অদৃশ্য উড়াল।

বাইরের আমবাগানে চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেছে বাতাস। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে রোদ্দুরের। চাপা উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে টুপ শব্দে মাটিতে পড়ল একাকী শিমুল। মাঝবয়েসি রোদের শেষ ফালিটুকু এসে পড়ে আছে বিছানার একপাশে। জানলার জংধরা শিকের বাইরে, নারকেল গাছের পাতায় বয়োবৃদ্ধ চিলকে ঘিরে গুটিকয় যুবা পাতিকাকের হাওয়া-সাঁতার হুড়দং। দক্ষিণের জানলায় পুরুষালী চেহারার ঝাঁকড়ামাথা খেজুরগাছ। তারপর থেকে, খুশিদির কাঁধের ওপর দিয়ে যতটা দেখা যায়, আলু খেতের সবুজ, খুপরি হাতে ময়লাটে রঙিন শাড়িতে আবছা কামিনেরা। ফড়িঙের ইচ্ছানুকূল স্পন্দন ছেয়ে ফেলছে চরাচর।

মুখচোরা স্পর্শের আতিশয্যে খুশিদি এখন প্রাণবন্ত পাথরে রূপান্তরিত, অন্তঃপুর নির্বাক, চোখের জলে গড়া মানবী। যিশু ওর দাঁত ঠোঁট মুখ দিয়ে খুশিদির চরণবন্দনা করে, জানুবন্দনা করে, স্তনবন্দনা করে, বাহুমূলবন্দনা করে, চোখবন্দনা করে।

খুশিদি ফিরে যেতে থাকে তিরিশ বছর অতীতে প্রতিবেশী তরুণের শ্রেণি-নিষিদ্ধ ধর্ম-নিষিদ্ধ সম্পর্কে, অপ্রত্যাবর্তনীয় সময়ে। অস্তিত্বের শীতাতপ আনাচকানাচ ভেসে যায় অবিরাম স্নিগ্ধতায়। জানা ছিল না এতকাল যে ওর নিজের শরীর এরকম, যাকে এখন দেহের আর মুখের ভাষায় যিশু করে তুলেছে পূজনীয়, অর্চনীয়, বন্দনীয়, আরাধনীয়, সাধনীয়, অহর্নীয়, উপাসনীয়, টের পায় যিশু। নিজের অর্চক, উপাসক, যাজক, জাপক, পূজক, সেবাইত, সাধক, আরাধককে সারা জীবনে প্রথমবার, পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম, সাহায্য করে খুশিদি নিজেকে অবাধ করে তুলতে।

আনন্দের অস্ফূট উঃ, খুশিদির চোখবোজা, যিশুকে দুহাতে জাপটে ধরে, ক্রমাগত বলে চলেছে, কেউ ভালোবাসে না আমায়, কেউ চায় না আমায়, আমি মুকখু, আমি অপয়া। অবারিত যিশু, গড়ে তোলে স্বপ্নের দ্রুতশ্বাস সম্পর্ক। তিরিশ বছর আগের না-মেটা আশ পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। সুখানুভূতির অঢেল বখরায় মরা গাঙ প্লাবিত হয়।

বাঁশের বেড়া খোলার ক্যাঁচোর শুনে উৎকর্ণ শঙ্কিত খুশিদি উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত, পাক খেয়ে আনারদানা জামদানি জড়ায়, চোখের জল মোছে, হাত-খোঁপা বাঁধে, আর চাপা গলায়, দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ, বাইরে যা, বাইরে যা, এখন তো দাদার আসার সময় হয়নি। ব্লাউজের হাতায় বাহু ঢোকায়। টেপা-বোতামের পট-পট উৎকণ্ঠ শব্দ।

ভীতির গভীরতায় অবাক যিশু বাইরে দাওয়ায় বেরিয়ে খুশিদি আর আগন্তুকের উদ্দেশে গলা চড়ায়, জাবেদালি এসেছে গো খুশিদি।

বিশ্বাসবাবুর জন্যে খাসি কাটালে ভবঠাকুর, তাই পাটিয়ে দিয়েচে, আর এই হরিপালের দই, জানায় জাবেদালি ঘরামি, হিমঘরে নজরদার, থলথলে কালচে চাহারা, গোঁফ নেই, দাড়ি আছে, কুচকুচে। হিমঘরের নাটবল্টু পেরেক আলপিন ওর মুখস্থ। অনেক বন্ড কিনেছে নিজের নামে, নাবালক ছেলের নামে।

পদবির বিশ্বাস শব্দটাকে কারা বিকৃত করবে তা মুখের দিকে তাকিয়ে টের পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে যিশু।

যিশকা এখেনে কদিন থেকে যাক না দাদা, কদ্দিন বাদে দেকা, ওর তো মা-বাপ কেউ নেই এসংসারে, আমরা ওকে পুষ্যি নিতে পারিনে? ভবেশকা ফিরলে অবাস্তব প্রস্তাব করেছিল খুশিদি।

কিইইইই যে আবোল-তাবোল বলিস ; বিলেত-ঘোরা লোক ও, আপিসের কাজে এয়েচে।তা থাকতে চায় থাকুক না কদিন, কিন্তু ব্যাবসা আর গাঁয়ের গপ্পো করিসনি ওর সঙ্গে।

রাত্তিরে, মাংস খাওয়ার সময়ে, এই অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে যিশুর, আবার মনে হল, অন্ত্যজ বাঙালি পরিবার মোগলাই রান্না রাঁধতে পারে না, অথচ সবর্ণদের তুলনায় নবাব-সুলতানদের কত কাছে ছিল।যে হিন্দুর বাড়িতে এককালে ছাগলের মাংস আর মুরগি নিষিদ্ধ ছিল, তারা কিন্তু আজকাল নানা মোগলাই পদ দিব্বি রাঁধতে পারে। অরিন্দমের ছোটো ভাইয়ের বউ কত ভালো মাংস-পরোটা খাইয়েছিল অরিন্দমের জন্মদিনে।অরিন্দমের ছোটো ভাইটা তো সব রকমের মাংসই খায়।

কে কোন তপশীলিকে সরকারি ব্রাহ্মণ বলেছিল বলে অরিন্দমের অফিসে ইউনিয়ান নেতাদের বিরুদ্ধে কত চেঁচামেচি করেছিল গৌরাঙ্গ নাগুরি, রমাপদ বাইন, জগৎ মান্না, সদানন্দ সাঁই, আর ঝাড়পিট ঘিরে নাট্যমোদীর কেরানিমঙ্গল।

চাকরি-বাকরির চেয়ে নিজের বুদ্ধি বিক্রির ব্যবসা বরং ভালো, এর রাজনীতিতে তেমন হ্যাঙ্গাম নেই।খুশিদির সেগুনকাঠের পেল্লাই খাটে, রং-ওঠা নীল নেটের মশারির মধ্যে শুয়ে ভাবছিল যিশু।

খুশিদির ঘরটা প্রায় ফাঁকা।একটা ড্রেসিং টেবিল অন্তত কিনে দিতে পারত ভবেশকা, একটা ট্রানজিস্টর বা টু ইন ওয়ান।নিদেনপক্ষে ছবি দেখার জন্যে সিনেমার ম্যাগাজিন। গ্রামপঞ্চায়েত এখানে কেবল টিভি নিষিদ্ধ করলেও, একটা টিভি তো রাখতে পারত সরকারি চ্যানেল দেখার জন্যে।খুশিদিকে ঠিক কোন শতকে আগলে রেখেছে ভবেশকা কে জানে।তালা-দেওয়া ঘরগুলোয় কী আছে জানতে অহেতুক আগ্রহ হয় ওর, যিশুর।

ভেতরবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে খাটে কটনের মশারি টাঙিয়ে খুশিদি বাতি নেভাবার পর, যিশু আলতো পায়ে ওর পাশে গিয়ে শুলে, কণ্ঠস্বর উদারায় তুলে খুশিদি বলল, সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়, কাল তো আবার আপিসের খাটনি আচে।আর গলা নাবিয়ে বলল, দুপুরে যা সব বলছিলি, সেগুলো আবার বল।পারবি? ওমা তোর বুকে তো চুল নেই রে।

যিশু প্রণয়ের প্রণয়ন করে।

তোমাকে অনেক বলার আছে খুশিদি ; একই কথা বারবার কেন বলব?

না, না, দুপুরেরটাই বল, তখন যেমন-যেমন করেছিলি। নিজের অস্তিত্বে উত্তেজনার ভণিতা চেয়েছে খুশিদি।

তোমাদের খুলনার ভাষা তোমরা দুজনেই ভুলে গেছ?

তিরিশ বছরের ওপর রইচি এই গাঁয়ে। এই গাঁয়েরই হয়ে গেচি। আমি তো ছোটো ছিলুম, কিছুই মনে নেই।দাদা গপ্পো করে কখনো-কখনো।

আমি তোমায় দেখে ভেবেছিলুম, বিধবা হয়ে ফিরে এসেছ।ভবেশকা যে কেন বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে রেখে দিয়েছে।অনেক ভালো পাত্র পেত তোমার জন্যে।নিজেও করেনি।

দাদার তো চোপরদিন হিমঘর আর পারটি আর চাষবাস আর সভা।তুই করিসনি কেন?

আমি? পড়াশোনো আর পড়াশোনো। তারপর রোজগার আর রোজগার। উন্নতি আর উন্নতি।ব্যাস, বিয়ের বাজার হাতছাড়া হয়ে গেল।আর তারপর বাবা-মা মারা গেল।

তুই তো বেমমো, না রে?

যিশুর বেশ ভাল্লাগে খুশিদির অকৃত্রিম মর্মসত্তা।বলল, না, আমরা খ্রিস্টান, ফ্রানসিসকান খ্রিস্টান। আমাদের জাতের বাঙালি খ্রিস্টান কলকাতায় আর নেই। কলকাতায় জেসুইট, কারমেলাইট, ডোমিনিকান, অগাস্টানিয়ান জাতের বাঙালি খ্রিস্টানও আর নেই।কলকাতা এখন নানা ধর্মের ট্যাঁসদের শহর, বুঝলে। হিন্দু ট্যাঁস, মুসলমান ট্যাঁস, খ্রিস্টান ট্যাঁস। কিন্তু ছোটোবেলায় কতদিন বড়োদিনের কেক খাইয়েছিলুম, ভুলে গেলে? অবশ্য তিরিশ বছর আগের মতন কেক আর হয় না। কেকের ময়দা তো এখন দুপা দিয়ে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে মাখে কলকাতায়।

অতশত বুঝিনে, মোচরমান না হলেই হল।খুশিদির অজ্ঞানতার আহ্লাদ, আরো গভীরে, জানায়, তা বেমমোও যা খ্রিস্টানও তাই।আমিও তাই, বল? কিন্তু দুপুরবেলা তুই আমার জন্যে হিন্দুর মন্তর পড়লি যে বড়ো।শুয়ে শুয়েই, যিশু কাঁধ নাচিয়ে আহ্লাদিত।

জানলায় ফিকে শীতের শ্রবণসুভগ শুক্লপক্ষের স্তব্ধতা। ভুলো মনের বাতাসে আওয়াজ নেই।যিশু ফিসফিসিয়ে, তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব আমি।আমার কাছে ক্যামেরা আছে, কাল ফোটো তুলব তোমার।

খুশিদির বিষণ্ণ উক্তি, আমার কোনো ছবি নেই, কেউ তোলেনি আজ ওব্দি।ভোটের ছবি তুলেচে যেন শাঁকচুন্নি। তারপর বহুক্ষণ নিরুত্তর থেকে, কিন্তু কী করে যাব, দাদা এক পা-ও যেতে দেবে না। চাদ্দিকে দাদার পঞ্চায়েত, কিসক সভা, হ্যানোত্যানো কমিটি, হিমঘর, পারটির আর সমবায়ের লোকে গিজগিজ করচে।কী করে এড়াব? সবাই চেনে আমাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার মেলা আসছে তো। গাঁয়ের মুখে তো বিরাট মেলা বসে শুনেছি ; আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে হাজার মানুষের ভিড় হয়।সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কেউ খেয়াল

করবে না।আমি কলকাতা থেকে টানা গাড়ি আনব।

শরীর কেঁপে ওঠে খুশিদির।যিশুর মাথাকে চেপে ধরে উন্মুক্ত বুকে।যা ভালো বুঝিস, কর।কিচ্ছু ভাল্লাগে না আর।রাত্তিরেও চুল আঁচড়ে শুস? এক লহমায় যিশু ফিরে গেছে মায়ের কোলে।চাঁদের আলোর ক্ষীণ স্বাদ ওর জিভে।রোমকূপের গোড়ায়-গোড়ায় পড়ে গেছে সাজো-সাজো রব।একত্রে অনোন্যোপায় হয়ে ওঠে দুজনে, অভিভূত, দিশেহারা, বিভোর, আচ্ছন্ন।

অন্ধকারে তিরতির করে কাঁপতে থাকে অন্ধকার।চোরাবালির কেন্দ্র থেকে প্রসারিত হাতের অনুনয়ের মতন খুশিদির নিঃশ্বাস।একে আরেকের ব্রাহ্মমুহূর্ত গড়ে তোলে আর প্রশমিত করে পারস্পরিক স্পন্দন।

প্রাকভোরে, শুক্লপক্ষ তখনও কৃষ্ণপক্ষে ঢলে পড়ার জন্যে তৈরি হয়নি, ঘুম ভেঙে গেলে খুশিদি যিশুকে ঝাঁকায়।এখনো ঘুমোসনি, নিজের বিছানায় যা, বিপদ হবে শেষকালে। যিশু যখন মশারি তুলে বেরোতে যাচ্ছে, ওর বাঁ হাত ধরে, না যাসনে, আমার কাছে থাক।যৌবন ফুরোতে থাকা নারী-পুরুষ চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে নৈশব্দ্যের খাঁই মেটায়।

চরাচরের অপার্থিব ওম নকশিকাঁথার রূপ নিয়ে ঢেকে রেখেছে ওদের দুজনকে।

বহুদূরে, কোনো পথকুকুরের খেদোক্তি শোনা যায়।এই এভাবে পরস্পর, একেই বোধয় শুশ্রুষা বলে, প্রাণ জুড়োনো বলে, মনে হচ্ছিল যিশুর।

অ্যাতো জমিজিরেত প্রতিপত্তি কী করে করলে গো তোমরা?

বিনময় করে।জানিস তো, বিনময়? ওখেনে আমাদের খেতখামার ঘরদোরের বদলে এখেনে কে একজন ফরোজন্দো মোমেনিন ছিল, তার সঙ্গে অদল-বদল।তক্কে-তক্কে ছিল দাদা।

ওঃ বিনিময়! কখনো তো টের পাইনি?

তুই আবার কী টের পাবি? তখন কতই বা বয়েস তোর।

গায়ে কাঁথা চাপা দিয়ে পেছনের ওসারায় এসে দাঁড়ায় যিশু।সকাল হয়ে এল।স্পষ্টবাক বিবাহযোগ্য কোকিল ডাকছে।সঙ্গে ফস্টিনষ্টি আরম্ভ করেছে ফাল্গুনের প্রেমানুভূতিময় কচি-কচি বাতাস।

বেশ ভালো বাগান করেছে ভবেশকা। ঘষাকাঁচ কুয়াশা দেখা যাচ্ছে দূরের ঠান্ডা দোচালাগুলোকে ঘিরে। সজনেফুল আঁকড়ে সদ্যোজাত লিকলিকে সজনে ডাঁটারা বেরিয়ে এসেছে রোদ্দুরের উড়ন্ত উনকির সঙ্গে খেলবে বলে। কাঁটাকাঁটা সবুজ ছুনিফলের মুকুটে তালঢ্যাঙা রেড়িগাছ। পুকুরের পাড়ে মুখ তুলে পাতাহীন গাছে আমড়ার ফিকে সবুজ বউল।ছোটো-ছোটো প্রায়ান্ধকারে দোফলা গাছে পুরুষ্টু সফেদা। পাকা আর ডাঁসা অজস্র টোপাকুল, আলতো নাড়ালেই ঝরে পড়বে গোঁসা করে।গা ভরতি নানা মাপের সবুজ আঁচিল নিয়ে কাঁঠাল গাছ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে মুখে পাউডার মেখে নার্সারি স্কুলের খোকাখুকুর মতন জামরুল ফুলের দলবদ্ধ কুঁড়ি।লালচে-সবুজ ছাই মেখে কচি খসখসে ফলসা পাতা।

নরম তুলতুলে গুটিপোকাকে আলগোছে খেয়ে ফেলল ময়নাপাখি।কত রকমের পাখির ডাক। বেলা হলে আর শোনা যায় না তো! গলায় কোরালের মালা ঝুলিয়ে মোচা ফেলছে সুপুরিগাছের সারি।জীবনমুখী গায়কের দ্রুতলয় গিটারের মতন বাঁশের শুকনো ফ্যাকাশে গাঁটে কাঠঠোকরা।

খালি গায়ে, বাগানের ঘাসপথ বেয়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় যিশু।

আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাতাস। বাতাসে ডাঁটো স্ট্যাচু যেন। সব স্থির। ডানদিকের বিশাল গাছে তেঁতুলপাতাও কাঁপছে না।বাঁধানো ঘাটে বয়ঃসন্ধির বালিকার মতন একধাপ ওপরে তো একধাপ নিচে খেলা করার পর ক্লান্ত হয়ে গেছে টলটলে পুকুর। আঁশটে গন্ধের ঐতিহ্যলালিত কুচোপোনার ঝাঁক ভেসে আছে আলতো রোদে ভেজা প্ল্যাঙ্কটন-পোকা খাবে বলে।ঘাটের জলে কাঁসার এঁটো বাসন।

স্থানীয় চোরেরা ভবেশকাকে বেশ ভয় পায় বোধহয়।

কত জল পুকুরটায়। কত্তো। কলকাতায় হরদম ফেরুল নোংরা, জলের পাইপ পাম্প করার ঝঞ্ঝাট, স্টপকক চুরি, ফি-দিন মেরামত।জলের জন্যে টেনশানের চূড়ান্ত।অথচ এই অজ পাড়াগাঁয় অগুনতি পুকুর।ভবেশকার পুকুর তিনটের মধ্যে এটা সবচে ছোটো। পুকুরের উত্তরে গোয়ালঘর।সঙ্কর গাই রয়েছে দুটো, জার্সি।

কত কি করে ফেলেছে ভবেশকা। দেশভাগের দরুন তাহলে জোতদার বিনিময়ও হয়েছিল। এগাঁয়ের লিগি মুসুলমান গিয়ে ইস্তাহারি রাজনীতিতে দড় দলপতি হিন্দু জোতদার এল।মূল্যবোধ যে কে সেই।খুঁটিগুলোর তেমন তফাত হয়নি।

তিরিশ বছর আগের ভবেশকার স্লোগান লাঙল যার জমি তার আজ ফলে গেছে। হালবলদ, জোয়াল-লাঙল ভবেশকার, জমিও ভবেশকার। সমন্বিত গ্রামীণ বিকাশ, প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প, ডোকরা, সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান শিবির, মৎস্য উন্নয়ন, পঞ্চায়েতের বরাত, তাঁতিদের সুতো, ত্রাণ প্রকল্প, তপশিলি কল্যাণ, হ্যান-ত্যান কমিটি, সমবায় তাপবিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, লোন-দাদন, আলুর বন্ড, ক্লাব, পুজো, নাটকদল, মেলা, বায়োগ্যাস, ধোঁয়াহীন চুলো, প্রশিক্ষণ, মডেল শৌচাগার, সব ভবেশকার, ভবেশকাদের, সব, সব, সঅঅঅঅব।

.

০৫.

পাতালের আলু, মর্ত্যের গতিপ্রকৃতি আর স্বর্গের খুশিদি, সমস্তকিছু ভবেশকার কবজায়। এত আলু যদি সংরক্ষণ করা না-ই যাবে, পড়ে-পড়ে নষ্ট হবে, হিমঘরে গিয়ে পচবে, যাহোক-তাহোক দামে বেচে দিতে হবে চাষিকে, তাহলে বিঘের পর বিঘে পরিশ্রম, টাকা আর সময়ের অপচয় কেন?

ব্লকের আর জেলার আধিকারিকরা করছিলটা কী? কী করছিল? অ্যাঁ?

কোনো একটা অচেনা পাখির ডাকে চমকে উঠেছে যিশু।স্পষ্ট শুনেছিল পাখিটার গান। পরপর তিনবার পাখিটা বলল, ‘বাল ছিঁড়ছিল’।

তিন সত্যিই করেছিল পাখিটা। পরের বছর নিশ্চয় প্রচণ্ড দাম বাড়বে। তখনও কৃষি আধিকারিকরা একই কাজ করবে।ওঃ।চার বছর আগে আলু হয়েছিল একান্ন লক্ষ টন, যখন কিনা সারা পশ্চিমবঙ্গের হিমঘরে রাখার জায়গা ছিল বাইশ লাখ টন। এবছর হয়েছে সত্তর লাখ টন।রাখার জায়গা আটাশ লাখ।

যিশু ভেবেছিল বুঝি কাঁচা ফাল্গুনের ঘাসে শিশির মাখতে বেরিয়েছে একজোড়া বেঁজি, তার আওয়াজ। পেছন ফিরে দেখল ভবেশকা, নিমডাল পাড়ছে নাবালক গাছ থেকে। বলল, এ নাও যিশু, নিমের দাঁতন করো।খ্রিশ্চানরা কি দাঁতন করে? টুথব্রাশ বেরোবার আগে কী করত সিরিল র‍্যাডক্লিফ? আর কঘর বাঙালি খ্রিশ্চান রইল হে এদেশে? চার্চ-টার্চ যাও? নাকি সেসবও বাইরের লোকেরা হাতিয়ে নিয়েছে? নাকতলায় ডালগিশ সায়েবের বাড়িটা আছে? ডালগিশ তো তোমাদের জ্ঞাতি, না? তারপর ডালগিশের বাটলার, আরদালি, বাবুর্চি, খাদিম অনেকঘর খ্রিশ্চান তো ছিল নাকতলা-বাঁশদ্রোণিতে? ব্রিটিশ সায়েবরা ডালগিশের নৌকোয় চেপে পাখি শিকারে যেতো বাঁশদ্রোণীর জলায়!

প্রশ্নাবলীর দাঁতন-বুলেটে যিশুর একাগ্রতা ছত্রভঙ্গ। অপ্রস্তুত, ও বলল, হ্যাঁ, ডালগিশ পরিবারে বাবার মাসির বিয়ে হয়েছিল। বাঙালি খ্রিস্টান বলতে গেলে আর নেই কলকাতায়।বাবা তো ওদিকের বাড়ি বেচে সেই আপনারা কলোনি ছাড়ার বছর দুয়েক পরেই পার্ক স্ট্রিটে ফ্ল্যাট কিনেছিল। সারা পশ্চিম বাংলায় আমিই শেষ বিশুদ্ধ বাঙালি খ্রিস্টান।

হ্যাঁ, বলছিলে বটে। অত বড় বাগানবাড়ি ছেড়ে শেষে সেই ফ্ল্যাটে! তা বেশ, বেশ। নাটকের চরিত্রের চিৎপুরি সংলাপের মহড়ার ঢঙে ভবেশকা। হিমঘরের লাইসেন্সটা আমরা শিগগিরই রিনিউ করিয়ে নেব। কোথায় আটকে আছে জানোই তো, অ্যাতো হিমঘর দেখেছো ঘুরে-ঘুরে।ড্রাই অ্যান্ড ওয়েট বাল্ব-থার্মোমিটারের অর্ডার দিয়ে রেখেছি ঠিকমতন তাপ মাপার জন্যে।পরিচালন সমিতির কার্যবিবরণীও এবার থেকে রেজিস্টারে লিখে রাখার ব্যবস্থা থাকবে, পরিচালকরা সই করবে তাতে। ডিফিউজানের বদলে বাঙ্কার পদ্ধতিতে পালটালে খর্চাখরচ কেমন পড়বে তার একটা তলবি-সভা হবে দিন-সাতেকের মধ্যে।বিজলির চেয়ে ডিজেলের খরচটা হয়তো কম, তাই আরকী।তারপর বিদ্যুৎ তো আজ আছে কাল নেই।

দাঁতনের সঙ্গে চিবিয়ে-চিবিয়ে সেই প্রশ্নগুলোর একনাগাড় উত্তর দিয়ে গেল ভবেশকা যেগুলো মোমতাজ হিমঘরের কর্মীদের করেছিল যিশু, অথচ তারা সঠিক জবাব দিতে পারেনি বা চায়নি।

ওহ-হো, ভবেশকা আমি এখানে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে আসিনি, বলেছি তো তোমায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড কিংবা অমন কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষক সংস্থার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি নিজের কনসালটেনসি খুলেছি তো। একসঙ্গে অনেক কাজ নিয়ে ফেলি, কুলোতে পারি না একলা। এই কাজটা মিৎসুবিশির জন্যে করছি। ওরা আলুর নানারকম ব্যবসায় ঢোকার আগে জেনে নিতে চায়।আমি তো চাষবাসের ব্যাপার বিশেষ জানি না।তাই বাড়তি কথা জিগেস করে ফেলি।

হ্যাঁ। বড়োতাজপুরের মামুদ মাফুজ বলছিল, তুমি নাকি ওর বাপের কাছে জানতে চেয়েছিলে মাদার সিডের ব্রডকাস্টিং কখন হয়।আমরা বলি বীজ আলু পাতা।আরেকটা কথা।তোমার রিপোর্টে লিখো যে আমি এই ব্লকে কাভুর জাতের লাভজনক ওল চাষে সফলতা পেয়েছি।কাভুর ওলে মুখি বিশেষ হয় না, গলা কুটকুট করে না, ছোটো-ছোটো টুকরো কেটে আলুর মতন বসানো যায়।তোমায় খাওয়াবো অখন, তা হলে টের পাবে। আগে এখেনে সবাই সাঁতরাগাছি ওল চাষ করত। সিঙুর, বলরামবাটি, বাসুবাটি, মির্জাপুর, ঝাঁকিপুর, বারুইপানা সবখানে এখন কাভুর বসাচ্ছে চাষিরা। পাঁচশো গ্রাম বীজে দশ কেজি মতন ওল পাচ্ছি, বুঝলে। অনেকে তো ওলের সঙ্গে বাড়তি ফসল হিসেবে লাল শাগ কি নটে বুনছে।

বকবকম ফুরোলে, নিম দাঁতনের সঙ্গে ওলের জ্ঞান-চেবানো কথাবার্তা একদলা থুতুতে পালটে থুক করে রজনীগন্ধার ঝাড়ে ফেলল ভবেশকা।শিউরে উঠল ফুলগুলো।

ধবধবে ফুলগুলো শিউরে উঠছে, স্পষ্ট দেখতে পায় যিশু। এই সাতসকালে ওলের জ্ঞানে বিব্রত লাগে ওর।কেনই বা প্রসঙ্গটা, আর কী-ই বা উদ্দেশ্য, ঠাহর করতে পারে না ও। চন্দ্রমুখী থেকে ওকে কাভুরে নামাচ্ছে ভবেশকা। পরের বছর আলুর দাম তিনচারগুণ বেড়ে গেলে শ্রমিক-মজুরদের খোরাকিটা ওল দিয়ে সামলাবার জন্যে সম্ভবত নিজেকে আগাম তৈরি করছে পশ্চিমবাংলার দলচাম্পিয়ান বঙ্গসমাজ।

ভবেশকা নিমজ্ঞান চেবানো বজায় রাখে।চোত-বোশেখে ওল লাগালে ভাদ্দর-আশ্বিনে ফি-একরে পঞ্চাশ কুইন্টাল মতন পাচ্চি, বুঝলে।আলু যাদের মার খেলো, ক্ষতি নেই, পুষিয়ে নেবে।বোরো থেকে পোষাবার উপায় নেই।চাষের জল নেই।আরেক-দলা থুতুর ছিবড়ে পড়ে রজনীগন্ধার জামাকাপড়ে। আচমকা প্রসঙ্গ পালটে যেতে শোনে যিশু। আমাদের পঞ্চায়েত বিদ্যুতের বিল বাকি রাখে না কখনো, বুঝলে, একটা রেকর্ড সারা পশ্চিমবঙ্গে।আরেকবার থুতুর পর বকনা বাছুরটাকে আঙোই পেড়ে ডাকে ভবেশকা।

জল তাহলে এক ভয়ংকর সমস্যা। এই তো মনে হচ্ছিল গাঁয়ে কত জল। মাটির তলাকার জল যাতে রাজ্যসরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাই ব্লকগুলোকে কালো, ধূসর, সাদা, তিনরকম ভাবে ভাগ করতে বলেছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। চাষিকে বারণ করলেই অন্য পার্টিতে গিয়ে ঢুকবে।যার যেখানে ইচ্ছে শ্যালো বসাচ্ছে। সাদা ব্লক ধূসর হয়ে গেল।জল ফুরিয়ে ধূসর ব্লক হয়ে গেছে কালো।তারপর আর জল নেই। জল নেই তো জেলাশাসককে ঘিরে চেঁচাও। যেন কালেক্টর সায়েব মুতে-মুতে মাটির তলাটা আবার ভরিয়ে দেবে জলে। এরপর খাবার জলও জুটবে না। চাষের কীটনাশক চুয়ে-চুয়ে পাতালের জলও দূষিত হয়ে গেছে।

কত নদীর বুকে, আজকাল, না, সাঁতার নয়, সাইকেল রেস হয়।নিজের চোখে দেখেছে যিশু।আর শুধু বোরো কেন! ওই তো, বাঁকুড়ার মড়ার, বেলসুলিয়া, বাঁকদহতে রবি মরশুমে শ্যালো বসাতো না কেউ। উপচে পড়ত কংসাবতীর খালের জল। আচেরুদ্দি মল্লিক, আরেফ মণ্ডল জোড়া পাঞ্জাবি বলদ বিক্কিরি করে শ্যালো বসিয়েছিল খালের ধারেই।জল ওঠেনি।অক্টোবরে পাতা র‍্যাশন আলুর চারা বাঁচাতে গোরুর গাড়িতে ড্রামে

করে ডিপ টিউকলের জল এনে ঢেলেছিল। বাঁচেনি। দিলশাদ বায়েন, আফিফ দালালদের চোপসানো চোখমুখ দেখে আগামী সংসারের দিনকাল আঁচ করেছিল যিশু।

ওদিকে মেদিনীপুর, কাঁথি, এগরা, রামনগর, বাদলপুর, সাতমাইলের চাষিরা ভোগরাইতে গিয়ে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালের লকগেট অপারেটারদের মোটা টাকা খাওয়ালে তবেই সেচের মিষ্টি জল জোটে। বাদলপুর পঞ্চায়েতের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক দেবেন জানা নিজেই বলেছিল, নিজে। মাঝি-মালোরাও শংকরপুর মেছোঘাটায় ভুটভুটি নিয়ে যাবার জন্যে গাঁটের মালে হাসি ফোটায় অপারেটারবাবুদের মুখে। ফেরার পথে কিলো দশেক মাছ গচ্চা যায়। স্বাধীনতার আগে লোকে ওই খালে নৌকো বেয়ে কলকাতায় যেত, জানেন স্যার। বোরো তো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমসি হয়ে গেল। এবারে আর ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা হবে না, দেখে নেবেন, হবে জল নিয়ে।

বহিরাগত, বহিরাগত, বহিরাগতর মতন এই হুগলি জেলার খানাকুল, মারোখানা, ডোঙ্গল, রামমোহন, চিংড়া, ধনেখালি, পাণ্ডুয়ায় দেখেছে যিশু, অশান্তির তোয়াক্কা করছে না চাষি। মুণ্ডেশ্বরী, শংকরী, দ্বারকেশ্বর নদী আছে। জল নেই। ডি ভি সি আছে। জল নেই। বড়োসায়েব জিপগাড়ি আছে। জল নেই। ভজহরি ভুঁইয়া সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। ছপছপে শংকরীর এখানে-সেখানে হাঁটু জলে বেআইনি বোরো বুনছে চাষি।
মজে-যাওয়া কানা দামোদর আবার বর্ষায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে যায় হুগলি-হাওড়ায়। ত্রাণবাবুদের ঢল নাবে।

গড়চুমুকে আটান্ন কপাটের স্লুইসগেট কোন কাজেই বা এলো, বলুন দিকি? যিশুকে সরকারি আধিকারিক ঠাউরে অভিযোগ করেছিল ক্ষুদিরাম ঢাং। বছর কুড়ির আগের বাণে দ্বারকেশ্বর রাস্তা পালটে সেঁদিয়ে গিসলো গোয়ালসারা, খিলগাঁ, চোটডাঙল, শ্যামবল্লভপুর, কৃষ্ণবল্লভপুর, কলাগাছিয়ায়। নদী তো শুধরে ফিরে গেল আগের খাতে। চাষের জমিতে ফেলে গেল এক মানুষ গভীর ধু-ধু দিগন্তের বালি। হাজার তিনেক জাতচাষি এখন দিনমজুর। দিনমজুর হলেই তো আর কাজ জোটে না!

সেচ দপ্তর কী করে? গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর কী করে?

অচেনা পাখির ডাকে, পর পর তিনবার, সোচ্চার জবাবে চমকে ওঠে যিশু। ভাবনা গুলিয়ে যায়।

শেষবার থুতু ফ্যালে ভবেশকা। কী, এখনও ছোটোবেলার মতন চমকাও নাকি? ন্যাচুরোপ্যাথি করো না কেন? আমার তো আলসার সেরে গেছে।

কটা দাঁত আর আছে ভবেশকার যে নিমের ডাঁটাটা সজনে খাড়ার মতন চিবিয়ে ফেলেছে? নকল দাঁত হলে দাঁতন কেন?

নিমডালের কুচো-থুকথুক শেষে ভবেশকা বলল, কালকে যখন তোমার মা-বাবার দুর্ঘটনায় মারা যাবার খবরটা শুনলুম, মনটা বড্ডো খারাপ হয়ে গিসলো। ওঁয়ারা না থাকলে তো খুশিটা মানুষ হতো না। কত দুঃখের দিন গেছে। ঘাটে বসে পুকুর-কুলকুচো করে ভবেশকা।

বাবা-মায়ের দুর্ঘটনার সূত্রেই আদিত্যর সঙ্গে যিশুর পরিচয়।বাগবাজারে গিসলো বাবা-মা, নয়ন সাহা লেনে ফাদার নরম্যানকে সেকেলে ধর্মান্তরিত বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারের এখনকার হালহকিকতের তথ্য দিতে, অবহেলিত সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।বিরল প্রজাতির এই ধর্মসম্প্রদায়ের নিশ্চিহ্ন হবার কারণ গবেষণা করছেন ফোর্ড ফাউন্ডেশানের দাক্ষিণ্যে। বাবা ছিলেন শেষ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে চাদর, পায়ে পাম্পশু খ্রিস্টান।ক্রিসমাসের দিন মা পরতেন গরদের শাড়ি।খাঁটি বাঙালি খ্রিস্টান মেয়ের সন্ধান করতে-করতে যিশুর বিয়ে দেওয়া হল না।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে, ল্যাজ-ওড়ানো ঘোড়ায় বসা নেতাজির মতন দেখতে ব্রোঞ্জের মনীষীর চোখের সামনে, হাত উঁচিয়ে ট্যাক্সি ধরতে গেলে, তিন নম্বর রুটের প্যাঙপেঙে জবেদকা বাসের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে রক্তাক্ত, মায়ের ডান হাত তখনও বাবার বাঁ হাতের মুঠোয়। রাস্তার লোকেরা প্রথমে বাসটাকে জ্বালিয়ে আর চালককে পিটিয়ে মেরে ফেলে, তারপর একটা পথচলতি প্রাইভেট গাড়িতে বাবা-মাকে চাপিয়ে নিয়ে গিসলো আর জি কর হাসপাতালে।পথেই মৃত্যু।

মৃতদেহ অশনাক্ত অবস্থায় আর জি কর থেকে মাছি ভনভনে লাশগাড়িতে মেঝের ওপর দোল খেতে-খেতে চলে যায় নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে। সারারাত, পরের দিনও, যিশু হন্যে হয়ে খুঁজেছে থানায়, চার্চগুলোয়, বাবার বন্ধু আর প্রাক্তন সহকর্মীদের বাসায়, হাসপাতালে।তৃতীয় দিন এন আর এস মর্গে পৌঁছে স্তম্ভিত।চাপা কান্না আর অসহায় ক্রোধে কণ্ঠরুদ্ধ, ও আবিষ্কার করেছিল উদোম উলঙ্গ বাবা-মাকে। দুজনেরই বাঁ হাত আর কাঁধ থেঁতলে গেছে।ঘড়ি, চশমা, পার্স, আংটি, হার, চুড়ি তো নেই-ই, রক্তে ভেজা পোশাক আর অন্তর্বাস হাপিস। মা-বাবাই কেবল নয়। মর্গের টিমটিমে শীতের ইঁদুরমরা গন্ধে গাদাগাদি পড়ে আছে অনেক লাশ।উলঙ্গ।কাঠ।স্টার্ক নেকেড, ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে পড়ে আছে প্রত্যেকে।উদ্ভিন্ন কিশোরী, পীনোন্নত গৃহবধু, ঢাউস প্রৌঢ়া, হাড়গিলে বৃদ্ধার হাঁ-মুখ-খুলে চেয়ে-থাকা মৃতদেহও রেয়াত পায়নি।

মৃতদেহ খালাস করতে গেলে, কালু ডোমের স্পর্ধিত হাসির খিক-খিক সিগারেট টুসকি ভোলা যাবে না।এসট্যাবলিশমেন্টের নির্মম হাসিখানি।মহানগর কলকাতা আজ এইসব কালুয়া মুদ্দোফরাসের বজ্র-আঁটন মুঠোয়।ধর্মমঙ্গলের কালু ডোম এখন পশ্চিমবাংলার নিখিল মর্গের যক্ষ। থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে সেখানে মুদ্দোফরাসের খিকখিকের বদলে পেটমোটা সরকারি হাসির খাকিরঙা গিগগিগ। পশ্চিমবঙ্গে হাসির সরকারিকরণ হয়ে গেছে।সোশাল অ্যাকশান ফোরামের শিশির ভট্টাচার্য, মানবাধিকার কমিশনের চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ও প্রতিষ্ঠানের উত্তরঔপনিবেশিক ডোমদের কাছে অসহায়।শেষে, একেবারে শেষে, ভেঙে পড়েছে যখন, যখন ওপরতলায় ধরাধরি ব্যর্থ, অরিন্দমের মাধ্যমে আদিত্য বারিকের কাছে পৌঁছেছিল যিশু। আদিত্যর দৌড়ঝাঁপে রেস্ত রফার পর খালাস করতে পেরেছিল মৃতদেহ।

আদিত্য কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, এগুলো একটু-আধটু মেনে নিতে হয় যিশুদা।মন খারাপ করে লাভ কী? স্বাধীনতার পর কত লোকের স্বজন যে অজান্তে পচেছে, কানের লতি নাকের পাটা চোখের পাতা খেয়ে ফেলেছে উত্তরঔপনিবেশিক ইঁদুরে, মনে হয়েছিল যিশুর, ওফ, বীভৎস, বীভৎস।

কী হল, কাঁদছ নাকি যিশু? ভবেশকা বাঁ হাত রাখে ওর, যিশুর, কাঁথাঢাকা কাঁধে।লাল সুতো দিয়ে নকশা-করা একজোড়া উড়ন্ত প্রজাপতির ওপর রেখেছিল হাতটা। যিশু জানায়, না, আজকাল ভোরবেলা আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে।ডাক্তার বলেছে কান্নার থলিটা চোখের তলা থেকে কেটে বাদ দিতে হবে।

যিশু কিন্তু জানাল না যে ক্যরটেজে কফিনদুটো নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করার দিন বিকেলেই, ও যখন কমপিউটার টেবিলের সামনে অনাহারে ক্লান্ত ধানশীষের মতন মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিল, দেয়ালে ভাসাই-এর সেকোয়েরার গড়া কাঠের বেদনাময় খ্রিস্ট, পার্ক স্ট্রিটের বাতিস্তম্ভে হ্যালোজেনের বিষাদে রবিবারের রাস্তা একদম একাকী, হৃদরোগের অতর্কিত আক্রমণে চেয়ার থেকে লুটিয়ে পড়েছিল সাদাকালো চৌখুপি মোজেকে।রক্তচাপ ছ্যাঁৎ করে পড়ে গিয়ে ওপরে সত্তর নিচে চল্লিশ, নাড়ি স্পন্দন কুড়ি। হুঁশাহুঁশহীন স্থানান্তরিত হয়েছিল, এত জায়গা থাকতে, কত জায়গায় খ্রিস্টানদের সুবিধে থাকতে, বাইপাসে একটা হাসপাতালে, যেখানে গেট থেকে ঢুকেই হিন্দু দেবতার মন্দির ডাক্তারদের দায়মুক্ত করার জন্য সদাজাগ্রত।

যিশুর চব্বিশঘন্টা কাজের ছেলেটা, উত্তর দিনাজপুর ভাঙাপাড়া গ্রামে বাড়ি, পতিতপাবন কীর্তনীয়া, পুতু, যাকে কমপিউটার, ফ্যাক্স, ই-মেল, অডিও কনফারেনসিং, ইনটারনেট চালাতে শিখিয়ে দিয়েছে যিশু, সামনের ফ্ল্যাট থেকে অজয় ব্যানার্জিকে ডেকে আনতে, ওই অজয়ই ভরতি করিয়েছিল হাসপাতালটায়, চেনাজানা আছে বলে।

নিজেই প্রচণ্ড টেনশনে ছিল অজয়, তবু অনেক করেছিল।ও তো নিজেও একলা থাকে। ওর দিদির হেনস্থার খবর সেদিনই বেরিয়েছিল খবরের কাগজে।যিশুকে ভরতি করে, পতিতপাবনকে ইনটেনসিভ কেয়ারের সামনে বারান্দায় বসিয়ে, বাগবাজারে নরম্যান সায়েবকে খবর দিয়ে, রাত্তিরের দূরপাল্লার ট্রেনে গিয়েছিল দিদির কাছে।

কী হয়েছিল হে? পুতু বলছিল নাকি অনেক নোংরামি? বিছানায় শুয়ে, অজয় অসহায় ফিরে এলে, জানতে চেয়েছিল যিশু।

কথা বলার আগেই ফুঁপিয়ে উঠেছিল অজয়।তারপর সরি বলে, ধাতস্থ হবার পর, যা বলল, তা শুনে, ওষুধগন্ধের পারদর্শী মশারির শীতাতপে শুয়ে, যিশুর মনে হয়েছিল, এসব স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ আর উত্তরঔপনিবেশিক হিন্দুত্বের দোষ।খ্রিস্টান সমাজে এরকম ঘটনা অসম্ভব। কালু মুদ্দোফরাসের ইবলিস ঔরসে জন্মতে আরম্ভ করেছে বাঙালিরা।

দিদি বেঙ্গলি কোলফিল্ড উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস।শুক্কুরবার ইশকুল খোলার সময় গেটের মুখে নানা বয়সের ছাত্রী আর তাদের বাবা-মা চাকর-চাকরানির সামনে একদল লোক কান ধরে ওঠবোস করিয়েছে, শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে মহিলাই ছিল বেশি।আসলে, একদল স্থানীয় নেতা ইশকুলের মধ্যেই জোর-জবরদস্তি দুটো ঘর জবরদখল করে আরেকটা ইশকুল চালাচ্ছিল বলে দিদি ওদের সেই কবে থেকে বলছিল সময়টা আরেকটু এগিয়ে নিতে, যাতে মাধ্যমিকের ক্লাস আরম্ভ হলে বাচ্চাদের চেঁচামেচি এড়ানো যায়। কথায় কান দেয়নি ওরা। দিদি তাই রেগে-মেগে

জবরদখল করা দুটো ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।তাইতে এই অবস্থা।ভেবে দেখুন একবারটি।

সে আবার কী রে বাবা! ইশকুলের মধ্যেই জবরদখল ইশকুল? শুনিনি তো আগে। বলেছিল হতবাক যিশু।একদল ছত্রাক-প্রতিম বাঙালির কাছে জবরদখল একটা ভালো আর বৈধ মূল্যবোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে। ইজরায়েলের জবরদখলে প্যালেসটাইন। ঘরবাড়ি জমিজমার জবরদখল ছোটোবেলা থেকেই দেখেছে ও।ওদের নিজেদের ধানি জমি দখল হয়ে কলোনি হয়েছিল।তখনকার ওই অঞ্চলের মুসলমান চাষিগুলোর জমি বসত দখল হয়ে পরের প্রজন্মে তো বলতে গেলে তারা চাষবাস থেকে একেবারে উৎপাটিত।কিন্তু ইশকুল দখল করে ইশকুল! নাঃ, ভাবা যায় না।

হাসপাতালের সেবিকা মেনকা পাইক পাশে দাঁড়িয়ে গল্প গিলছিল।বলল, যাকগে, আর এসব শুনতে হবে না, মনিটর দেখুন হার্টবিট পঁচাশিতে চড়ে দপদপ করছে।

হাসপাতালের কর্তারা এমন লোভী যে ভরতি হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকিয়ে দিসলো ইনটেনসিভ কেয়ারে।তারপর টানা পনেরো দিন রেখে দিলে আই সি সি ইউতে, যিশু একজন মালদার রুগি টের পেয়ে।দরকার ছিল না, তবু দুবেলা ইসিজি, ইকো, রক্তের নানা পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান, অ্যানজিওগ্রাফি। তারপর বেলুন অ্যানজিওপ্লাসটি করে, কুঁচকির ওপর স্যান্ডব্যাগ চাপিয়ে, খাটের হাতলে পা বেঁধে রাখলে।মান্ধাতা আমলের সব চিকিৎসা পদ্ধতি। অনেক রুগি এদের খপ্পরে পড়েছে ঢাকা-চাটগাঁ থেকে এসে। যন্ত্রপাতি স্টেরিলাইজ করা ছিল না বলে যিশুর ডান দিকের উরু হাঁটু পর্যন্ত জোঁক লাগার মতন ছিট-ছিটে কালো ফোসকায় ভরে গিয়েছিল।ওফ, দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন।সরে উঠে ফেরার পর পুতু পুজো দিয়ে এসেছিল নবদ্বীপের মায়াপুরে, হিন্দুদের চার্চে।

ইনটেনসিভ কেয়ারটা ছিল বিশৃঙ্খলা, অযত্ন, দায়িত্বহীনতা, উদাসীনতা আর অকর্মণ্যতার স্বর্গরাজ্য।

ছোকরা ডাক্তার-ডাক্তারনিগুলো শোবার পোশাক পরে রাত্তিরে ঘুমোতে চলে যায়, রুগিদের দিকে খেয়াল রাখার বদলে।সেবিকা, নার্স আর ঝি-চাকরগুলো ঢুলতো পালা করে, নাকও ডাকত।মাঝেমধ্যে বকরবকর ফস্টিনষ্টি।

হাঁসফাস রুগির উদ্দেশে ইয়ার্কি থামিয়ে ডাক্তারকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনতে-আনতে, দেখেছিল যিশু, শরীরে বারতিনেক খিঁচ ধরে সে টেঁসে গেল।রুগির মরে যাবার পর, বাইরে রাত-জাগা অভূক্ত দিশেহারা স্বজনকে ডেকে এনে, মৃতের দেহে লাগানো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির চক্রাবক্রা সবুজ আলো দেখিয়ে, মুখে অভিনয়ের কাঁচু আর মাচু এনে বলেছে, পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ, আমরা চেষ্টা করছি, ভগবানে ভরসা রাখুন। আত্মীয়রা বাইরে বেরিয়ে যেতেই ঊর্ধ্বতনরা অধস্তনদের নির্দেশ দিয়েছে, ডেডবডি এখন রিলিজ করিসনি, বিল সেকশান থেকে আগে পুরো পেমেন্টের কনফার্মেশান আসুক।

শুনে-শুনে আর দেখে-দেখে, প্রতিদিন অন্তত একবার, মনে হয়েছিল যিশুর, ভগবান লোকটা হিন্দুদের অসাধারণ আবিষ্কার।তা না ঈশ্বর, না দেবতা।

আত্মীয়স্বজনকে, মৃত অথচ জীবন্তের-অভিনয়রত রুগি দেখানো হয়ে যাবার পর, যন্ত্রপাতি অতিতৎপরতায় খুলে, খরচাপাতির কাগজ বানিয়ে, কমপিউটারে যোগফল মিলিয়ে, লাশকে সাদা চাদরে ঢেকে, স্ট্রেচারে চাপিয়ে, অপেক্ষারত ভগ্নহৃদয় আত্মীয়কে বলা হত, অনেক চেষ্টা করেছিলাম আমরা, বাঁচানো গেল না। হোটেলের মতন, হাসপাতালটায় লাশেরও চেকআউট টাইম আছে। লাশ তো আর বলবে না যে সে অনেক আগেই চেকআউট করেছে, বিলটায় একদিনের বাড়তি খরচ দেখানো হয়েছে।

দেখা করতে এসে সদ্য-পরিচিত আদিত্য বারিক বলেছিল, এসব মেনে নিতে হয় স্যার, সমাজ ব্যাপারটা তো চিরকাল এরকমই।

একজন পয়সাঅলা মারোয়াড়ি বুড়িকে অপারেশানের পর মেডিকাল চেয়ারে বসিয়ে, মুখের ওপর ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে, যাতে না ঘুমিয়ে পড়ে, লেডি অর্থোপেডিক সার্জেন হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে এসে দেখে, ইনটেনসিভের ইনচার্জ ডাক্তারটা, বুড়িটা যন্ত্রনায় চিৎকার করে প্রলাপ বকছিল বলে, কড়া ডোজের ঘুমের ইনজেকশান দিয়ে অজ্ঞান করে নেতিয়ে রেখেছে। বুকের ওপর মাথা-ঝোলানো ধনী পরিবারের গৃহকর্ত্রীর সামনে, ইনটেনসিভের কাঁচঘরে আধমরা মানুষদের মাঝে দাঁড়িয়ে, দুই ডাক্তারের সে কী বাংলা-ইংরেজি খিস্তিখাস্তা। যিশুর মনে হচ্ছিল নিউইয়র্কের হার্লেমের ফুটপাতে শুয়ে গালাগাল শুনছে।

কোনো রুগি প্রলাপ বকলে, ঝি-চাকরগুনো মাঝরাতেও তাকে নকল করে ভ্যাঙাত, যেন রাস্তার নির্মম চ্যাংড়ারা লেগেছে পাগলের পেছনে : মাঁ কোঁতায় গ্যাঁলে, জঁল খাঁবো জঁল খাঁবোঁ ডুঁডু খাঁবোঁ, ওঁরে আঁলোঁটা জেঁ্বলেদেঁ, যঁতীন কিঁ এঁলো, ওঁ মাঁ মঁরে গেঁলাঁম, ওঁহ আঁর কঁষ্ট সহ্য হঁয় নাঁ ঠাঁকুর, বাঁবাঁগোঁ আঁর পাঁরছি নাঁ, বাঁড়ি নিয়েঁ চঁল রেঁ, বাঁড়ি যাঁবোঁ, হেঃ হেঃ হেঃ, দাদু, সকালে পোঁদে ডুশ দেবো, আর চেঁচিও না। ভাষার নতুন কলোনাইজারদের বচননাট্য।

শেষদিন তো কর্মীদের অতর্কিত স্ট্রাইকের ধাক্কায় বিজলিবাতিহীন ইনটেনসিভে একসঙ্গে তিনজন মরে গেল। আন্দোলনের কোল্যাটরাল ড্যামেজ।

ভেলোর যাওয়া উচিত ছিল, বলেছিল ফাদার নরম্যান, বা কোনো খ্রিস্টান হাসপাতালে।

হাসপাতালটায় কমবয়সী অগুন্তি নগণ্য মাস-মাইনের প্রশিক্ষার্থী নার্স। সবাই বলে সেবিকা। কলকাতায় শব্দের খেলায় বেশ্যারা যেমন যৌনকর্মী, মুটেরা যেমন শ্রমিক, ঝি-চাকররা যেমন কাজের লোক, তেমন ফালতু কাজের জন্য সেবিকা।

শাসক তার শোষণপ্রক্রিয়াকে বৈধতা দেবার জন্য শব্দের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে রূপের প্রতিরূপ।

শিশু-থুতনি মেনকা পাইক মাছের কাঁটা বেছে, ভাত মেখে, যিশুর মুখে একগাল পুরে বলেছিল, কাকুদা, তোমায় তো শুয়ে-শুয়ে খেতে হবে এই কয়দিন। মুখের মধ্যে মেনকা পাইকের তর্জনী মধ্যমা অনামিকা যখন যিশুর অস্তিত্বকে স্পর্শ করেছে, মায়ের জন্যে অদম্য মন-কেমনের হাহাকারে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠেছে ও, গোপনে। শোকের রক্তাভ শিহরণ কণ্ঠকে রুদ্ধ করে ছড়িয়ে পড়েছিল ফুসফুসে।

মেনকা নিজের নাম বলেছিল ম্যানকা।লেখা না বলে বলত ল্যাখা।জোড়াভুরু ছিপছিপে স্বাস্থ্যবতী, কালোর মধ্যে চটক, অতিসোনালি কানের দুল, প্যাতপেতে লালফুল ছাপাশাড়ি, মুখমণ্ডলে ঘামের ফসফরাস দ্যুতি, দুচোখে দুষ্টুবুদ্ধি বন্যের অদৃশ্য চোরাস্রোত, চকচকে কোঁকড়া চুল টানটান বাঁধা। আরেকজন, কিশোরী-থেকে-তরুণী মেয়েকে সঙ্গে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল একদিন, ভিজিটিং আওয়ারে, আমার বুইন কাকুদা, মহাকরণে কাইজ করে।

কোন বিভাগে?

কুন ডিপাট রে তর?

তিন তলায়।

কৃষি আধিকারিক ডক্টর ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছিল যিশু, বাঁ হাতের আঙুলে ঝোলানো অনেকগুলো কাপ, ডান হাতে চায়ের কেটলি।

ইশ রে, কাকুদা! কেমন আছে তোমার শরীর? একেবারে সেরে গেছে তো? সম্ভাষণের আহ্লাদ উপভোগ করেছিল যিশু।চালু-চায়ের অনুকাপে চুমুক দিয়ে, বি-বা-দী বাগের আকাশে দেখেছিল, ছাইমাখা মেঘেদের সফরসূচি চূড়ান্ত করতে বেরিয়ে পড়েছে কালবৈশাখী।

চলি রে কেটলি, একদিন তোদের দুজকে তাজ বেঙ্গলে লাঞ্চ খাওয়াব, মেনকাকে কথা দেয়া আছে।বলে, নিচে নেমে বেরোবার মুখে, দ্রুতগামী ট্রেনের নিশুতি শব্দের মতন বৃষ্টি।ওফুটে কারপার্কের মাকাল গাছে, ঠোঁটে খ্যাংরা নিয়ে ভিজছে স্থপতি কাকপুরুষ। আকাশচুম্বী হাওয়ায় প্রতিভাদীপ্ত বিদ্যুতের স্নায়ুপ্রদাহে, কাতরে ককিয়ে ওঠে কয়েকটা অল্পবয়সী মেঘ।

০৬-১০

০৬.

ওঃ, মরে গেলুম হুজুর, আহ, আরেব্বাপ, অঁক, ছেড়ে দিন স্যার, আমি কিচ্ছু জানি না স্যার, উঃ বাপরে, আঃ, বাবাগো, আআআআঃ।

আদিত্যর জন্যে বহুক্ষণ অপেক্ষারত অরিন্দম অসুস্হ বোধ করছিল ক্রমশ, লকাপ থেকে ছিটকে-আসা আর্তচিৎকারে। বমি-বমি আসছিল। অরিন্দমের কাহিল প্রতিক্রিয়া উপভোগ করছিল টেবিলের ওদিকে মিটিমিটি তাগড়া ভুঁড়িদাস পুলিশ অফিসারটা, বোধয় সিআইডি ইন্সপেক্টার। অনেকবার এসেছে বলে মুখ-চেনা, বলল, আপনি বরং নিচে গিয়ে গেটের কাচে টাটকা হাওয়া নিন। আসলেই পাঠিয়ে দোবো।

অরিন্দম উঠে পড়ল ব্রিফকেস নিয়ে। অরিন্দমকে ওর অফিস থেকে দশ কুড়ি পঞ্চাশ একশো টাকার টাটকা প্যাকেট এনে দিতে বলেছিল আদিত্য। বোনের বিয়ের যৌতুক, তাই করকরে টাটকা নোট চাই, জানিয়েছিল আদিত্য। থোক টাকা থাকলে উঁচু জাতের ভালো চাকরে পাত্র পাওয়া সহজ, পাত্রী যে জাতেরই হোক না কেন। এই একগাদা টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে চায় না অরিন্দম। মা, ছোটো ভাই বা তার বউ জেনে ফেললে কেলেঙ্কারি। পাটনায় থাকতে হঠাৎই একবার ও মাসকতকের জন্যে পাগল হয়ে গিসলো বলে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেল। পা ব্যথা করছিল। এই শহরের চতুর্দিকব্যাপী নিনাদে হারিয়ে যায় ব্যক্তিগত আর্তনাদ আর অসহায় কাতরানির ছোট্টো-ছোট্টো শব্দকণা। আক্রমণ আর আত্মরক্ষার জৈব ও যান্ত্রিক উপস্হিতি সারাটা শহরের চরাচর জুড়ে।

পুরুষকর্মীদের চাউনি রুমাল দিয়ে মুখের ওপর থেকে পুঁছতে-পুঁছতে বাড়ি ফিরছে আলগা চটকের গৃহবধু কেরানি। সঙ্গিনীর সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু গণেশঠাকুরের শুঁড় ডানদিকে শুভ না বাঁদিকে। ক্ষীণস্বাস্হ্য সরকারি বাস চলে গেল, নাগরিক বোঝাই, ফোঁটার মতন মানুষ ফেলতে-ফেলতে, জিরোবে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের জ্যামে। বাসে উঠলেই লোকে বসতে চায় এ শহরে, যুবকরাও, যাতে কাঁধে কাঁধ না মেলাতে হয়। কাঁধে কাঁধ কেবল ছাপার অক্ষরে।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অভ্যাসমতন পথচারিণীদের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল অপ্রস্তুত অরিন্দম। খিনখিনে ট্যাক্সির কাতার। ভেজাল ডিজেলের নাকজ্বালানো ধোঁয়া। ধোঁয়া-ধুলোয় মুখ ভার করে আছে ক্লান্ত আকাশ।

অফিসে আবার এলেন কেন অরিন্দমদা? পেছন ফিরে আদিত্যর থমথমে চেহারা দেখতে পেল অরিন্দম। মানুষকে নিজে হাতে পেটানোর আহ্লাদ

থেকে, মুখের আনন্দময় প্রতিভা থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, আর কোনও দিন মুক্তি পাবে না আদিত্য। প্রতিনিয়ত ওর দরকার পড়বে প্রহারযোগ্য দেহ, সারাজীবন। রিটায়ার করলে কী করবে ও? ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশান বিভাগে চলে যেতে পেরেছে তার মানে, কাঠখড় পোড়াবার ব্যবস্হা করে।

তোমায় তো বাড়িতে পাওয়া যায় না।

তা নয়। এসব করকরে টাকাফাকা অফিসে রাখতে চাই না। দেখলেই তো হিংসে।

কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও। ছুটি তো? এখন?

কী যে বলেন না, এখনও কবুলতি লেখানো হয়নি। চলুন ওফুটে চায়ের দোকানটায় একটা ছেলে আছে আমাদের গ্রামের। ওর হাতে পাঠিয়ে দেব। আদিত্য বিব্রত বোধ করে অরিন্দমের সারল্যে। নোটগুলো কোথা থেকে এলো, বড়ো মাপের নোট কেন, কিছুইকি সন্দেহ করে না অরিন্দমদা? টিকে আছে কী ভাবে অমন অনর্থক বোকামি নিয়ে, এই মারিকাটারি সমাজে!

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের ধর্মশিবপুর গাঁয়ে, অজয় নদের তীরে, আদিত্য বারিকের বাস্তুভিটে। ঝিলুট থেকে কাঁচা রাস্তা আছে গ্রামে যাবার, তৃণমূল-কংরেস-সিপিয়েম মকদ্দমাবাজিতে আধখ্যাঁচড়া। সপ্তম পাঁচসালায় রাস্তাটা হবার আগে গাঁয়ে ফুলপ্যান্ট পরে ঢোকা যেত না বর্ষাকালে। কাঁধে বেলবটম, বাঁহাতে জুতোজোড়া, আন্ডারওয়্যার পরে ঢুকতো কলকাতা-বর্ধমানের কুটুমরা। ওদের গ্রামটা বাদে আশপাশের গ্রামগুলো মুসলমান চাষিদের। জোতদার বর্গাদার কামলা সবাই মুসলমান। ধর্মশিবপুরে আজ যাদের বাস, সেসব শীল, কাঁসারি, বারিক, কর্মকার, সাহা, শূর, পাল, কুণ্ডু, দাঁ, সাঁপুই, বায়েন, গায়েন, সরদার, পোড়েল পরিবার এসেছিল গঙ্গারাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের মন্ত্রী বিষ্ণু সিংহের রাঢ়দেশ অভিজানে সঙ্গী হয়ে। সেসব গৌড়ীয়দের প্লেস অব ডোমিসাইল এখন রাঢ়।

র‍্যাডক্লিফ সায়েবের ভয়ে নেয়ামত মণ্ডল পালিয়েছিল পাকিস্তানে। পরে হাওয়া বুঝতে এলে নরহরি মণ্ডল নেয়ামতের একশো ছেচল্লিশ বিঘে জমি কিনে নিয়েছিল পচা আলুর দরে, মহাফেজের দলিলে তারিখের গোলমাল করে। পাকা দলিল হয়নি, তাই রেজেস্ট্রি হয়নি। এর মধ্যে একশো বিঘে ছিল খোদখামার আর ওয়াকফ চিরাগি জমি, যা নরহরির ছেলে সত্যসাধনকে দিয়ে খাস লিখিয়েছিল ভূমিসংস্কার দপ্তর, আর যা রাঢ়ের লোক পায়নি। চাষবাস না করেও তার অনেকটা পেয়ে গেসলো সন্তোষ দাসের মামাতো ভাই। সন্তোষ দাস এ-তল্লাটে লাল-পার্টি করার জন্যে এসেছিল সত্তর সনে। বে-থা করে থেকে গেল। নিজেদের এখন দাশ লেখে, বলে কায়েত। মনুসংহিতা থেকে কেউ বেরোতে পারে না, তা সে লাল পার্টি হোক বা নীল পার্টি বা সবুজ পার্টি।

প্রথমে মুসলমান গাঁয়ে-গাঁয়ে বকবক বকবক করে গান্ধির কোল থেকে মার্কসের কোলে চাষিগুলোকে তুলে নিয়ে গিসলো সন্তোষ জেঠু। মুসলমানগুলো তো চালাক কম নয়, আগাম টের পায়। ওরা সদাসর্বদা শাসকের সঙ্গে আছে। কি লাটসায়েব, কি ফজলুল হক, কি নাজিমুদ্দিন, কি সুরাবর্দি, কি বিধান রায়, কি জ্যোতি বসু, কি মমতাদিদি। হলে হবে কী! কোত্থেকে একদল কিশতিটুপি-পরা লিগি এসে ফিসফিস-গুজগুজ চালালে যে মুসলমানগুনো আর সাউ সরদার নাইয়া ঘরামি পদবি রাখতে চায় না। সউদির রিয়ালে মেটে মসজিদগুলোকে ওব্দি সবুজ তেলরঙে ছুপিয়ে ফেলেচে।

প্রতিভা ছিল বটে সন্তোষ জেঠুর, বুঝলেন অরিন্দমদা, নইলে সহদেব মন্ডলের ছেলেটা নকশাল হয়ে ওর মুন্ডু কেটে লটকে দিত না, নিজের গ্রামে অরিন্দমকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলেছিল আদিত্য। শৈশবে দেখা সেই দৃশ্য আজও, সময় বুঝে, আদিত্যকে কাবু করে। বুঝলেন অরিন্দমদা, আমার মামার বাড়ি ছুতোর-গাঁ গ্রামের পরামাণিক শ্মশানসাধুরা মানুষের মুণ্ডু ঝুলিয়ে চোত সংক্রান্তির ভোরে যে নাচ দেখাত, তার চে ভয়ের দৃশ্য ছিল বাঁশের খুঁটিতে টাঙানো সন্তোষ জেঠুর কাটামুণ্ডু। সারারাত শিশিরে-ভেজা জলজ্যান্ত মুণ্ডুটা চোখ রাঙাচ্ছিল, যে দেখতে গেছে তাকেই।

সেই কবে, ছোটোবেলাকার কথা, পরের বছর শ্মশানসাধুদের হাতে ঝোলানো মুণ্ডুগুলোর মধ্যে দুটো ছিল সহদেব মণ্ডলের দুই ছেলের। ছোটোটা পূর্বস্থলী, ওই যে, গেছেন তো আপনি, ওখানে গুলি খেয়ে মরেছিল। বড়োটার ধড় পাওয়া গিসলো হুগলির শেষপুকুর গ্রামে। বুঝলেন অরিন্দমদা, সাধুরা অনেক দিন ধরে মাথাগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিল তেল-সিঁদুর মাখিয়ে, গাজনাতলায় নাচবে বলে। এখন তো কাটামুণ্ডু বেআইনি হয়ে গেছে বলে সাধুরা কুলি দিয়ে কাজ চালায়, দুধের বদলে ঘোল, আর কি। তার ওপর নাপতেরা আর কেউ সাধু হতে চায়না। তার চেয়ে গেরুয়া পরে মেড়োর টাকায় হিন্দু পলিটিক্স করলে তবু কিছু পয়সাকড়ি হয়। চলুন না মামার বাড়ি, ব্রামভোন অতিথি পেয়ে মামামামিদের আনন্দই হবে।

আমার তো গায়ে পৈতে-ফৈতে নেই।

আরে ও তো পুরুতমশাইকে সকালে অর্ডার দিলে বিকেলে সাপ্লাই দিয়ে দেবে। পুরুতটা আবার বিজেপি, আগে সিপিয়েম করত। সিপিয়েমের পুরুত আসে কালনা থেকে। লোকটা স্টেট ব্যাংকে সিকিউরিটি গার্ড। চলুন না, জিপের ব্যবস্থা করি থালে।

চলো যাওয়া যাক, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অত ইনটিরিয়রে যাইনি কখনও।

খড়্গেশ্বরী নদীর ধারে ছুতোর-গাঁ গ্রামে আদিত্যর মামার বাড়ি। ঈশানেশ্বরের খেসসা গান, ফোকলা দাঁতে, আদিত্যর দিদিমার উদ্ভাসিত কণ্ঠে, পুলকিত করেছিল অরিন্দমকে। দুই মামা মিলে বর্ধমানে ফার্নিচারের দোকান খুলে,

বেতাহাশা কাঁচা পয়সা করেছে, জামাজরেত, ট্রালট্র্যাক্টর, চারাকাটার যন্তর, বিলিতি গাই, দুটো শ্যালো, আড়াই বিঘের পুকুর। আদিত্য যখন বাবার কাঁধে চেপে মামার বাড়ি যেত, মামারা এত সচ্ছল ছিল না। কোচবিহার থেকে কাঠের টানামালের ব্যাবসা করে দিন ফিরিয়ে নিয়েছে। দহরম আর মহরম উঁচু মহলে। এফিডেভিট করে রায় পদবি নিয়েছে। মেয়েদের জন্যে ফরসা উদারচেতা বর পেয়েছে, মোটা টাকা যৌতুক দিয়ে।

বুঝলেন অরিন্দমদা, ছোটোমামা দৌড়ঝাঁপ না করলে, এ এস আয়ের ইনটারভিউটা গুবলেট হয়ে যেত। দুরাত্তির ওর মামারবাড়িতে থেকে, অরিন্দমের মনে হয়েছিল, আদিত্যর মামারবাড়ির সবায়ের গা থেকে র‍্যাঁদামারা কাঁচা কাঠের গন্ধ বেরোয়। সত্যি। বড়োমামার শালকাঠ, বড়োমামির সেগুনকাঠ, ছোটোমামার নিমকাঠ, ছোটোমামির শিশুকাঠ। মাতুলালয় যেন ছালছাড়ানো গাছের জঙ্গল।

কোচবিহারে তুফানগঞ্জে, মানসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তো মামাদের, মানে আমার মায়ের, মামাতো ভাই। একবারটি ওখানেও নিয়ে যাব আপনাকে, বলেছিল আদিত্য । লুকিয়ে-লুকিয়ে আসাম থেকে কাঠ আসে। অবশ্য কাকেই বা লুকোনো। বনকর্মীরা ব্যবস্হা করে, মাস মাইনে পায়।

তোমাদের শিডুল হপ্তা আর ওদের শিডুল মাস?

বিক্কিরি বাবদ তোলা দিতে হয় আলফা আর বোড়োদের, সোনার বাংলা থেকে চিনের আর পাকিস্তানের বোমাবন্দুক আনার জন্যে। একটু ইদিক-উদিক হলেই ডুয়ার্সে এলেমজি চলে। কুমারগ্রাম, বকশির হাটে ছানবিন হয়। হাঃ হাঃ, পুলিশকেও তো দিতে হবে। ছোটোমামা নিজেকে টিম্বার মাফিয়া হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসে, কিন্তু কাঠের ব্যাপারিরা সে স্বীকৃতি দিতেই চায় না।

কলকাতায় না থাকলে কোনো কিছুতেই স্বীকৃতি মেলে না। স্বীকৃতিরও কতোরকমের চাহিদা, চাইলেই পাওয়া যায় না।

ছুতোর-গাঁ'র মুসলমানগুনো ধর্মশিবপুরের মুসলমানগুনোর চে ফরসা। করিম মুনশি আর ফরিদ মোল্লার বাড়ির সবাই ফরসা আর ঢ্যাঙা। দাদু বলে ওরা সব খাঁটি আর আমাদের গাঁয়ের কেলটেগুলো পাতি, জানেন তো পাতি মানে নমোশুদ্দুর থেকে যারা নেড়ে ধর্ম নিয়েচে। ফরসা না হলে আমেদ মামুদ করিম জালাল নামগুলো ঠিক মানায় না। বুঝলেন অরিন্দমদা, ছুতোর-গাঁ'র নাম পালটে রায়গ্রাম রাখার দৌড়ঝাঁপ চলছে। বড়োমামা বলছিল, ছুতোর-গাঁ'র কুসুমেটে তেঁতুলে, দুলে, বাগদি, হাড়িয়া সব এফিডেভিট করে রায় হয়ে গেছে। মামাদের চেয়ে উঁচু পরিবার বলতে উগ্রক্ষত্রিয় মন্ডলরা আর ব্রামভোনরা।

কর্নওয়ালিসের ছাপ্পামারা জমিদাররা যখন ছিল, তখন বাড়ি-ঘর-মন্দির-মসজিদের স্থাপত্য বলে একটা ব্যাপার ঢুকেছিল গ্রামগুলোয়।

এখন তো গ্রামে-গ্রামে তোমার মামাদের মতন পয়সাওলা লোক কম নয়, বলেছিল অরিন্দম। অথচ কোনো নতুন স্থাপত্য দেখা দিল না উত্তরঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গের পল্লিসমাজে। গরিব সাজাটাই এখন গ্রামবাংলার স্থাপত্য। পেল্লাই উঠে গেছে বাড়ি, এদিকে প্রলেতারিয়েত জুগ জুগ জিও, শাল্লাহ।

ভাগ্যিস অর্ডার দেওয়া পৈতেটা পরেছিল অরিন্দম। আদিত্যর দিদিমা-মাইমা-ছোটো বউদির কাছে ওটার জন্যে অনাস্বাদিত খাতির চলছে। অরিন্দমের চেয়ে বয়সে ঢের বড়ো ওর দিদিমা আর মামিরা চান সেরে এসে হঠাৎ পায়ের কাছে মেঝেয় ঢিপ-ঢিপ। এই জন্যেই গ্রামে যেতে অস্বস্তি হয়। জাতিপ্রথা বেশ জেঁকে টিকে আছে ভেতরে-ভেতরে, নানা জাতের মানুষ এখনও এক সারিতে খেতে বসতে চায় না, তিরিশ বছরের বামপন্থী রাজনীতির শেকড়ের ফ্যাঁকড়া ছড়ালেও । ইশকুলের ফ্রি খাওয়ার খিচুড়ি রাঁধতেও বামুন বউ দরকার হয়। অবশ্য ছোটো ভায়ের বিয়ের সময়েও পরতে হয়েছিল রেডিমেড পৈতে।

তোমার বড়ো মামার ছেলে-বউকে দেখলুম না?

বড়দা-বউদি ফিবছর পুজোয় চাইবাসায় শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। ওখানে দশজন জামাই মিলে খুব হইহল্লা হয়। সত্যি, আরে স্ট্রাইক করেনি আগে। পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে বড়দার, কিন্তু কোনও বার পুজোয় নিজের মা-বাপের কাছে থাকেনি।

তুমি বিয়ে করে কী করো দেখা যাক।

পুলিশে কাজ করে বিয়ে করার ঝামেলা আছে। আপনি করে ফেলুন না বিয়েটা। ব্রামভোন বাড়িতে কুচ্ছিত মেয়েরও রূপ থাকে। ছুতোর-গাঁয়ে ব্রামভোনরা সব ঈশানেশ্বরের পুজুরি, বুঝলেন তো। স্বাধীনতার পর সব মন্দিরের দখল নিয়ে নিয়েছে ব্রামভোনরা। দুলেদের ধর্মরাজের মন্দিরটা নিয়েছে। দেয়াসি তাঁতিরা বুড়ো-গাছতলায় কালাচাঁদ মন্দিরের সেবায়েত ছিল ; তাদের হটিয়ে সেটাও হাতিয়েছে। ব্রামভোনগুলোই দেশটাকে ডোবাল। জহোর্লাল তো ব্রামভোন ছিল, তাই না?

একটা মন্দিরের মধ্যেই অতগুলো পুতুল ডাঁই করে রাখা দেখলুম, অনেকগুলোর রঙ চটে গেছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চলছে নাকি? শ্রীহীন দেবতাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবশিষ্টাংশ!

আপনাদের আজগালকার ব্রামভোনদের ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে বড্ডো অচ্ছেদ্দা। ওগুলো ধর্মঠাকুরের মূর্তি। মামারবাড়ির এদিকটায় অনেক-অনেক মন্দির ছিল আগে। এখন আর কে দেখাশোনা করবে বলুন? সেসব

ঠাকুরের থান থেকে এনে রেখেছে ওই মন্দিরে। কত মূর্তি তো চুরি হয়ে বিদেশে পাচার হয়ে গেল । অবশ্য বিদেশে গিয়ে যত্ন-আত্তি পায় মূর্তিগুলো, সেও তো একরকম পুজোই, বলতে গেলে। সেবায়েতরা আজগাল দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমানে রিকশা চালায়, হকারি করে। বর্ধমানে দেখলেন তো, ঠেলায় চাউমেন বেচছে, আমায় যে ডাকলে, ও ছেলেটা তাঁতি বাড়ির।

আদিত্য ওর ইতিহাস-ভুগোল বজায় রাখে, আমাদের ধর্মশিবপুর গাঁয়ের অনেকে পাততাড়ি গুটিয়ে রানিগঞ্জ, আসানসোল, নিরসা, গোবিন্দপুর, ধানবাদ গিয়ে দুপুরুষ কয়লাখনিতে কুলিগিরি করছে। এমন সাতবাষ্টে হাড়গিলে চেহারা করে ফেলেছে, যে দেখলে টের পাবেন না বাঙালি না বিহারি, হিন্দু না মুসলমান। আমরা তো ঠাকুদ্দার জন্যে পার পেয়ে গেলুম, নইলে কী দশা যে হতো। তল্লাটের মুসলমানগুনো তো সোশালিস্ট ছেড়ে মুসলিম লিগে ঢুকে পড়েছিল, বুঝলেন, তার মধ্যেই ঠাকুদ্দার দৌলতে আমাদের ফ্যামিলির নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ভেদিয়া বেরাণ্ডা ছাড়িয়ে নিগন কৈচর উজানি কোগ্রাম ওব্দি। ঠাকুদ্দা তো বাবাকে ওয়ার্ধা আশ্রমে নিয়ে গিসলো। জহোর্লালের কোলে-বসা বাবার ফোটো আছে। তখনও টাক পড়েনি জহোর্লালের। সেসব এখন বাক্সবন্দি। আর বোধয় বেরুবে না।

তোমার পুলিশে চাকরি এবার অন্যরকম ইজ্জত এনে দিয়েছে, কী বলো?

ধুৎ, ইজ্জত-টিজ্জত নয়। ভয় পায় লোকে। বেশ ভাল্লাগে লোকেদের ভয় পাওয়াটা। শ্রদ্ধার ভালোলাগার থেকে ভয়ের ভালোলাগাটা সুপিরিয়র। হাঃ হাঃ।

তুমি ছুতোর-গাঁ, ধর্মশিবপুর, মঙ্গলকোটের অ্যাতো গল্প জানলে কোত্থেকে? ঠাকুদ্দার কাছে?

না-না। ইশকুলে আসলাম স্যারের কাছে। ভুগোল পড়াতে-পড়াতে লোকাল ইতিহাস পড়িয়ে দিত। নিজেকে বলত রাঢ়ীশ্রেণি পাঠান। পূর্বপুরুষ কে একজন মোহম্মদ শামিম খান নাকি আলিবর্দি খাঁর সেনাদের সঙ্গে আরবি ঘোড়ায় চেপে বর্গিদের তাড়াতে-তাড়াতে এসে পৌঁছেছিল কাটোয়ায়। গঙ্গারাম নামে একজন কবি ছিল আগেকার কালে, তার লেখা মহারাষ্ট্রপুরাণে আছে নাকি গল্পটা। আসলাম স্যার তো কুচকুচে কালো। আর ঘোড়াটার টাট্টু বংশধররা এখন মন্তেশ্বর কিংবা দাঁইহাটে এক্কা টানে। হাঃ হাঃ, এক্কাও উঠে গিয়ে চাদ্দিকে ভ্যান রিকশা অটো ম্যাক্সি-ট্যাক্সি চলছে। আসলাম স্যার আজও ভূগোলের ক্লাসে ইতিহাস পড়ায়। ইতিহাস তো গপপো, বানিয়ে নিলেই হল। ভূগোল তো তা নয়।

এখনও পড়াচ্ছেন? স্কুলমাস্টাররা তো শুনি রিটায়ার করে পাঁচসাত বছর ওব্দি পেনসন পাচ্ছে না।

টাকের ওপর টুপি পরে আঙুল দিয়ে সাদা ধবধবে দাড়ি আঁচড়ায় আর দুপুরে ছেঁড়া আসন পেতে দেয়ালমুখো নামাজ পড়ে টিচার্স রুমে। এখন তো টিচার্স রুম বলতে পশ্চিমের নোনা ইঁটের স্যাঁতসেঁতে ঘরটা, প্রায়ই ঠান্ডা খড়ামারা মেঝের ওপর দিয়ে গোখরো সাপ এদিক থেকে ওদিক নিশ্চিন্ত মনে ফণা গুটিয়ে চলে যায়। ছাত দিয়ে জল পড়ে। এখন তো একটাও ক্লাসঘরে দরোজা-জানলার আড়কপাট নেই।

আদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল অরিন্দম। নিজেকে ঘিরে গ্রেটনেসের বুদবুদ তৈরি করতে চাইছে ও, আদিত্য। সবাই, ওর চেয়ে ছোটো, দরিদ্র, নিকৃষ্ট, দুস্থ, শ্রীহীন, অবহেলিত। অনেক মানুষ প্রেমহীনতাকে ভালোবাসে।

অরিন্দম বলল, তুমি তো নিজেই স্কুলে মাস্টারির চেষ্টা করেছিলে, বলেছিলে একবার।

ওঃ, সে এক কেলো হয়েছিল বটে। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া হাইস্কুলে গিসলুম ইন্টারভিউ দিতে। এগারোজন প্রার্থী ছিল, বুঝলেন। চৈতন্য খামরুই বলে এক প্রার্থীর তো পাঞ্জাবির তলায় ছেঁড়া গেঞ্জি ওব্দি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু গুজগুজ ফিসফিস হাসাহাসি থেকে দশ মিনিটেই আমরা টের পেয়ে গিসলুম যে স্কুল কমিটি ওই পদের জন্যে আগে থাকতেই লোক ঠিক করে ফেলেছে। ইন্টারভিউটা লোকদেখানে।

আমরা তো ইন্টারভিউ না দিয়ে বাস ধরার জন্যে ফিরে গিয়ে গ্যাঁজাচ্ছিলুম রাস্তার ধারে। হঠাৎ না, হইহই করতে-করতে তিরিশ চল্লিশজন লোক এসে ঘিরে ধরে কিল চড় লাথি থাপ্পড় কঞ্চিপেটা আরম্ভ করে দিলে। আমি ভাবলুম আমাদের ডাকাত ভেবে গণপ্রহার আরম্ভ হল বুঝি। আজগাল গ্রামে শত্রুপেটানোর এটা সবচে সহজ আর সস্তা কায়দা বেরিয়েছে। ভাবলুম আর বোধহয় বাঁচার উপায় নেই। সব তো পাঁচ ফিটের গাঁইয়া বাঁটকুল। তিনটেকে দিলুম একটা করে পাঞ্চ, বুঝলেন। কেঁউয়ে কুকুর হয়ে কাৎ।

তখন ওদের নেতামতন লোকটা হুকুম ঝাড়লে যে ইন্টারভিউ না দিয়ে ফেরত যেতে পারবে না কেউ। ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে, জামা খামচে, পেছন থেকে ঠেলে, স্কুল ওব্দি ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে নিয়ে গিসলো আমাদের, পেছন-পেছন গ্রামের প্রায় একশো হাফল্যাংটো কচিকাঁচার দল, নেড়ি কুকুরের ঘেউ ঘেউ, একদল পাতি হাঁস গোঁতা খেয়ে নেবে গেল পুকুরে, তাইতে তিন-চারটে রুই-কাতলা লাফিয়ে উঠল, উড়িসশালা, সে গাঁড়েগোবর অভিজ্ঞতা ভোলা যাবে না। কয়েকজন চাষি বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। ইন্টারভিউ-ফিন্টারভিউ কিসসু নয়। হেডমাস্টারের ঘরে একটা রেজিস্টারে সবাইকে দিয়ে সই করিয়ে নিলে। ইন্টারভিউ না দিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে গেলে তো শিক্ষক বাছাই বাতিল হয়ে যেত। তাই অমন হেনস্থা।

কয়েকটা লোকের মুখ মনে রেখেছি। কখনও যদি পেয়ে যাই কলকাতায় কোথাও তো পোঁদের চামড়া তুলে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।

এক্ষুনি লকাপে সেই কাজটা করছিলে বুঝি? কী করে পারো? আমার তো গলা শুকিয়ে বুক ধড়ফড় করতে লাগল বলে বেরিয়ে এলুম। তোমার সঙ্গে এবার বোধহয় আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। বলার পর, অরিন্দমের খেয়াল হল যে এই কমবয়সি আদিত্য ছাড়া ওর আর বন্ধু নেই কোনও ; এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে গল্প করা যায়। নানারকমের গোলমালে আক্রান্ত হয়ে উঠেছে অপরিহার্য অস্তিত্ব।

আরে, এই ক্রিমিনালগুলোকে আপনি জানেন না। মহাফেজখানা থেকে কিছু গুণ্ডা ফাইল বের করিয়ে দেবো আপনাকে পড়তে, তাহলে টের পাবেন। আদিত্যর মুখময় ঘুরঘুর করছিল বিমূর্ত অভিভাবকত্বের গর্ব। তাস যেভাবে তার তুরুপ লুকিয়ে রাখে, সেভাবে হাসির মৃদুতা ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে রেখেছিল আদিত্য।

অরিন্দম যেন হেমন্তের স্মৃতিভারাক্রান্ত কাঠফড়িং। বলল, জবাবদিহির সুরেই বলল, করেছে কী লোকটা? শুনি।

তিলজলার গোলাম জিলানি খান রোডের নাম শুনেছেন? গেছেন ওদিকে কখনও? র‍্যাফ নেমেছে। দুটো পাইপগান, রামদা, আর একগাদা বোমা পাওয়া গেছে। পুলিশের ওপর বোমা চালিয়েছে, অ্যাতো বুকের পাটা। কন্সটেবল গোপাল দাসকে তো চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। শঙ্কর ঘোষ, কুমার দত্ত, এরশাদ খান, শঙ্করনারায়ণ পাণ্ডে, ওদেরও অল্পবিস্তর চোট লেগেছে। আসল দুটো খুনে হাওয়া হয়ে গেছে বোমার ধোঁয়ায়। চারটে হারামজাদাকে ধরেছি আমরা।

তিলজলা? অরিন্দমের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

কেন? তিলজলায় আবার কী আছে?

তিলজলায় একজন থাকে। আমি তাকে কখনও দেখিনি। তার বিষয়ে জানিও না কিছু। এমনকী নামও জানি না। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। মনের ভেতর প্রেমের ফাঁকা জায়গাটায় বসিয়ে রেখেছি তাকে।

আদিত্য স্তম্ভিত। রেশ কাটলে বলল, আপনাদের এইসব ন্যাকান্যাকা কাব্যি-কাব্যি পারভারটেড কথাবাত্রা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

.

০৭.

নিঃস্ব, সন্ত্রস্ত, অভুক্ত ভবেশকাকা কাঁধে খুশিদিকে চাপিয়ে বর্ডার স্লিপ হাতে বনগাঁ হয়ে শ্যালদা প্ল্যাটফর্মে উঠেছিল। জহোর্লাল ওদের মাটি থেকে ওদের উপড়ে ওদের দুরবস্হা দেখতে গিসলো নিজের চোখে। শ্যালদা থেকে

চটকলের গুদামে। সেখান থেকে বালিগঞ্জের যশোদাভবন ক্যাম্প। তারপর কলকাতার দক্ষিণে ধানখেত আর জলাজমিতে যে যেমন ঠাঁই নিতে পারে।

যিশুর দাদুর অনেক ধানিজমি ছিল ওদিকে। মুসুলমান ভাগচাষিদের বাস ছিল। এখন তো সেসব জলাজমির নাম হয়েছে সূর্যনগর, আজাদগড়, নেতাজিনগর, শ্রীকলোনি, গান্ধি কলোনি, বাঁশদ্রোণি, বিজয়গড়, রামগড়, বাঘাযতীন, কত কী। যিশুর দাদুর ইংরেজ বন্ধুরা ডিঙি চেপে পাখি শিকারে যেত সেসব জলাজমিতে।

আচমকা মানুষের ঢলে ভরে যেতে লাগল দিগন্ত ওব্দি ধানখেত আর জলাজমি। ঠ্যাঙাড়েরা রাতবিরেতে তুলে দেবার চেষ্টা করত লোকগুলোকে। যিশুর দাদুও ভাড়াটে লেঠেল আর তাগড়া সব বৌবাজারি গুণ্ডা লাগিয়েছিল, গল্প করেছিল ভবেশকা। ভবেশকারা যে জায়গাটায় থাকত, লেঠেল-গুণ্ডাদের অনেকদিন ঠেকিয়ে জিতেছিল বলে জায়গাটার নাম দিয়েছিল বিজয়গড়। বারোভূতের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল জিতে। নিজেরা ভারি-ভারি রোলার টেনে রাস্তা বানিয়েছিল ভবেশকারা। রাত্তিরে পাহারা দিত দল বেঁধে।

সেসব রাস্তায় সাইকেলে ঘুরেছে যিশু, দিনের বেলায়। বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, শান্তিপল্লি, চিত্তরঞ্জন, রিজেন্টপল্লি, বিবেকনগর, দাশনগর, আদর্শপল্লি, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ, বাপুজিনগর, বঙ্গশ্রী, নেলিনগর, শহিদনগর, মিত্রবাস, পোদ্দারনগর, মনেও নেই সব।

এখন গিজগিজ করছে মানুষ, উঁচুউঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি, ধনীদের আবাসন, চেনাই যায় না।

ভবেশকা ছিল অসাধারণ নেতা। চলে আসার সময়ে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ছিল ফার্স্ট ইয়ারে। পোড়-খাওয়া তাঁমাটে পেশি, ড্যাংডেঙে হাত-পা, চওড়া ছাতি, কোঁকড়াচুল ভবেশকা রোজই বেরিয়ে যেত আন্দোলন করতে। খুশিদিকে যিশুর মায়ের কাছে রেখে যেত।

এরকম নেতাকে হাতে রাখা ভালো, এই ভেবে বাবা বলেছিল, যিশুর সঙ্গে খুশিও যাক না স্কুলে, টিউটর রেখে নিচ্ছি না হয়। প্রস্তাবে ভবেশকার কীইই রাগ। বললে, তাহলে আর আপনাদের বাড়ি আসব না। মিতালিদের বাড়ি রেখে যাব।

ট্র্যামের ভাড়া যখন এক পয়সা বাড়ল, প্রথম ট্র্যামটায় ভবেশকাই আগুন ধরিয়েছিল, পুলিশ রেকর্ডে আছে। পাকিস্তানি ওপার বাংলা থেকে তখন সত্তর হাজার লোক এসে কলকাতায় ফ্যা-ফ্যা করছে, অথচ রোজগারপাতির কাজ নেই। তখনও কলোনিগুনো পশ্চিমবঙ্গে ছিল, কলকাতা হয়নি। নিত্যিদিন কলকাতায় গিয়ে পিকেটিঙ, ট্র্যাম জ্বালানো, বাস পোড়ানো, ব্যারিকেড, বোমা, অ্যাসিড বালব, মিছিল, র‍্যালি। বোমা

বানাতে গিয়ে ভবেশকার কড়ে আঙুল উড়ে গিসলো। খুশিদির কান্নাই থামে না। কাঁদলেই টোল পড়ত থুতনিতে।

তেসরা জুলাই জ্যোতি বসু, গণেশ ঘোষ, জ্যোতিষ জোয়ারদার, সুবোধ ব্যানার্জি গ্রেপ্তার হতে, কালিঘাট ট্র্যাম ডিপো, শোভাবাজার-চিৎপুর ক্রসিং, একডালিয়া বাজার, শ্যামবাজারে তুলকালাম হয়েছিল। রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি ভবেশকা। টিয়ারগ্যাসের শেল কুড়িয়ে এনে দিত ভবেশকা। খুশিদির মোটে ছাব্বিশটা জমেছিল। যিশুর আটচল্লিশটা। দুটো আজও আছে ডাইনিং টেবিলে নুন-গোলমরিচ রাখার কাজে। ভবেশকা ইউসিআরসি আর ট্র্যামভাড়া বৃদ্ধি কমিটি, দুটোতেই ছিল। অক্টারলোনি মনুমেন্টের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রোজ বক্তৃতা দিতে যেত আর তারপর ভিড়ভাঙা মিছিলে শ্লোগান। বক্তৃতা দিতে-দিতে অল্প সময়েই কলকাতার কথা বলার টান রপ্ত করে ফেলেছিল।

পনেরো জুলাই হয়েছিল সাধারণ ধর্মঘট। সেই প্রথম বাংলা বন্ধ। উৎসব। পশ্চিমবাংলার বাঙালির জীবনের মূল্যবোধ পালটে গেল। কর্মসংস্কৃতি পালটে গেল। বন্ধ। নতুন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

একদিন বিকেলে বাবার হাত ধরে গড়ের মাঠের মিটিং দেখতে গিসলো যিশু। দ্রোহের জ্যোতিতে মথিত ভবেশকার মুখ মনে পড়ে। ষোলোই জুলাই কলকাতার রাস্তায় সেনা নেমে গেল। তখনকার দিনে র‍্যাফ ছিল না। শোভাবাজারে ভিড়ের ওপর গুলি চলেছিল আঠেরো তারিখে। প্রফুল্ল সেন ভয়ে এমন কেলিয়ে গিসলো যে বিদেশে আরাম আদ্দেক বাকি রেখে তিরিশ জুলাই তড়িঘড়ি ফিরতে হয়েছিল বিধান রায়কে। জহোর্লালের তো তখন কানে-তুলো চোখে-ঠুলির রোগ, ভবেশকা বলেছিল। আইন ভাঙা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু সবাই মিলে আইন ভাঙলে, ভাঙা আইন আর জোড়া লাগে না। যত আইনই তৈরি হোক পশ্চিমবঙ্গে, সেই থেকে, ভেঙে-ভেঙে ঝনঝন করে পড়ে যায়। আদালতের জজকে চটি ছুঁড়ে মারে। টেলিফোনে হুমকি দেয়। উপায় নেই। উপায় যে ঠিক কী, কেউই জানে না। চায় না জানতে।

চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, ভারতরক্ষা আইনের প্যাঁচে যখন টালিগঞ্জ থানার সেপাইরা অশোকনগরে পঁয়তাল্লিশটা আস্তানা ভাঙতে এলো, তখন ছুটি হয়ে গেসলো নাকতলা স্কুলে, যাতে ছাত্র আর টিচাররা প্রতিরোধে শামিল হয়। সন্তোষ দত্তর চেলা ছিল ভবেশকা। যুগান্তর বলতে যেটুকু টিকে ছিল, তা-ই করত দুজনে। পুনর্বাসন মন্ত্রী আভা মাইতিকে ওনার অফিসে গিয়ে ধমকে ছিল ভবেশকা। কী রোয়াব, ওহ, দ্যাখে কে!

বিধান রায়ের আমলে যে খাদ্য রায়ট হয়েছিল, তা আবছা মনে আছে যিশুর। তখন তো বর্গা আইনও হয়নি, পিএল চারশো আশির ল্যাং খেয়ে সবুজ বিপ্লবও হয়নি।

ধানচালের কেনাবেচা সরকারি আওতায় নিয়ে গিয়ে গুবলেট করে ফেললে বিধান রায়। বাজার থেকে উবে গেল চাল-গম। খাবার খুঁটতে কলকাতার ফুটপাথ ভরিয়ে ফেলেছিল গাঁয়ের লোকে, যে লোকগুলো কানিতে মাটির রং নিয়ে জন্মায়। ভবেশকা বিধান রায়কে মুখের ওপর বললে, সংগ্রহ বিতরণ তদারকির জন্যে গণসমিতি গড়া হোক পাড়ায়-পাড়ায়।

বিধান রায় ভাবল, অ, বিরোধী দল পেছনের দরজা দিয়ে সেঁদোতে চাইছে। খাদ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্ল সেন। তিরিশ হাজার পুলিশকে ধানচাল যোগাড়ের তদারকির কাজে লাগিয়ে দিলে। দাম বাঁধার হুকুম আর লেভি অর্ডার তুলে নেওয়া সত্ত্বেও, চাল গম ডাল তেল মশলার দাম বাড়তে লাগল। হু হু। হু হু। বিধান রায়ের বুকের ব্যারাম ধরিয়ে দিলে প্রফুল্ল সেন আর অতুল্য ঘোষ। খাদি-খদ্দর জামাকাপড় তো উঠেই গেল পশ্চিমবঙ্গে।

গোলমাল আঁচ করে শুরু হল ভবেশকাদের ধরপাকড়। সেই নিয়ে তেইশবার জেল। গোলমাল কী আর সহজে থামে। ছাপোষার পেটে দানা নেই। আগস্টের শেষ দিনে, ডালহাউসি স্কোয়ারে, হাজার লোকের মিছিলের মাথায় ভবেশকা। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট আর এসপ্লানেড ইস্ট ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। একশো চুয়াল্লিশ চলছে। কী ভিড়, কী ভিড়।

লাউডস্পিকারের দরকারই হতো না তখনকার দিনে। মিছিল ভাড়াও করতে হতো না, ট্রাক ভাড়া করে ময়দানে লোক জড়ো করতে হতো না। মহাসমাবেশের পোস্টার দিতে হতো না। রাস্তার ওপরেই বসে গিয়েছিল বউ-ঝি, পোলাপান, মরদরা। হাতাহাতি আর ঢিল ছোঁড়াছুড়ি ছড়িয়ে পড়ল ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ, কলেজ স্ট্রিট। ট্র্যামের লাইন নিজের হাতে উপড়ে ফেললে ভবেশকা। ড্রাইভারের ফেলে-পালানো বাসটায় আগুন ধরিয়ে দিলে। পুলিশের সোঁটা ভবেশ মন্ডল, অমর বসু, রাম চ্যাটার্জি, চিত্ত বসু, মাখন পাল, মোহিত মৈত্র কাউকে রেয়াত করলে না।

পরের দিন ভোর পাঁচটায় খুশিদিকে মায়ের জিম্মায় দিয়ে বিধান রায়ের বাড়ির সামনে ছাত্রদের জড়ো করে ফেলেছিল ভবেশকা। মাথা-গরম টাটকা সভা-ভাঙা মিছিলটা যখন এগুচ্ছে, প্রিন্সেপ স্ট্রিট থেকে রইরই করে এসে হামলে পড়েছে পুলিশ। খণ্ডযুদ্ধ। সুযোগ বুঝে গুণ্ডা-মস্তানরাও ফাঁকতালে নেমে পড়েছিল। তোড়ে বৃষ্টি এসে কিছুক্ষণের বিরতি দিলে কী হবে, ভবেশকা আশুতোষ বিল্ডিঙে ছাত্রদের জড়ো করে, ঠেলাগাড়ি আর বিদ্যুৎ বিভাগের মই এনে রাস্তা জ্যাম করে দিলে। পুলিশের হাত থেকে বেটন ছিনিয়ে নিয়েছিল ভবেশকা। সন্ধে নামতে, রাস্তায়-রাস্তায় আলো ভেঙে ফেলার নেতৃত্ব দিলে।

অন্ধকারে জ্বলেছে গাড়ির টায়ার, ট্র্যাম-বাস। ঠেলাগাড়ি দমকল অ্যামবুলেন্স। মরে ছাই হয়ে গেল সনাতন কলকাতিয়াদের তিলোত্তমা মোহনবাগানি কলকাতা, জীবনানন্দ দাশ নামে এক কবির কলকাতা।

গোবিন্দ বল্লভ পন্থের মাথা-কাঁপানো অনুমতি নিয়ে গুলি চালালে পুলিশ। ভবেশকার বাহুর মাংস খাবলে শিস দিয়ে চলে গিয়েছিল গনগনে বুলেট।

ভবেশকা তোমার সেই গুলি লাগার দাগটা আছে?

না হে, অ্যাতো দিন থাকে নাকি! কবেই মিলিয়ে গেছে। পুকুরের জলে মুখ ধুয়ে গোরুর গোয়ালের দিকে চলে গেল ভবেশকা। এই সাত সকালেই গেরুয়া আলখাল্লা পরে আছে, সত্য সাঁইবাবার ডুপলিকেট। ওটা পরেই শোয় বোধয়।

ভবেশকা বলত, কংরেসের জন্য, শিশুর জন্য, কাশ্মীরের জন্য, হিন্দির জন্য, এডউইনার জন্য, কৃষ্ণমেননের জন্য, আনন্দভবনের জন্য, জহোর্লালের প্রাণ কাঁদে। আমাদের দুর্গতির জন্য কাঁদে না। এখন ভবেশকাও জন্যকে বলে জন্যে, বাঙাল থেকে ঘটি হয়ে গেছে নিজের অজান্তে।

কিন্তু দোসরা সেপ্টেম্বর জহোর্লাল আর ওনার খাদ্যমন্ত্রী এস কে পাতিলের টনক পঙ পঙ করে নড়ে উঠতে, পশ্চিমবঙ্গে ট্রেন-ভরতি চাল-গম পাঠিয়েছিল কেন্দ্রিয় সরকার। তেসরা সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়ে রেখেছিল মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। ভবেশকা এই কমিটিতেও ছিল।

হাওড়ার খুরুট থেকে বামনগাছি ওব্দি ধোঁয়াক্কার হয়ে গিসলো দড়িবোমায়। দাশনগরে চটকলের গুদোমে আর মজদুরদের ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল ভবেশকা। দাউ দাউ দাউ দাউ দাউ দাউ। জগাছা, বামনগাছি, মালিপাঁচঘরায় গিয়ে আম-জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল ভবেশকা। ধর্মঘটকে সফল করে তুলেছিল সুভাষ মুকুজ্জের পদ্য গেয়ে-গেয়ে। কমরেড তুমি নবযুগ আনবে নাআআআআআ? খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তখন প্রায় রোজই নাক-ফোলানো ভবেশকা।

আর এখন? স্বাধীনতার ষাঠ বছর পর, দেয়ালে লেখা থাকে, দেখেছে অরিন্দম, বহু গ্রামে, “কমরেড তুমি আর গাঁড় মারবে না।”

সকাল হতে না হতে শোভাবাজার আর বিডন স্ট্রিটে শুরু হয়ে গেল ভবেশকাদের হ্যাঙ্গাম। মায়ের কাছে খুশিদিকে সোপর্দ করে সেখানেও পৌঁছে গেছে চটি আর ধুতি-শার্ট পরা উশকোখুশকো ভবেশকা। রাত্তিরে মানিকতলা থানা আক্রান্ত। নেতৃত্বে ভবেশকা। ঢাকুরিয়ায় পুলিশ আউটপোস্টে বোমা। ভবেশকার কাঁধে বোমাভরা ব্যাগ। খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, কালীঘাট, ভবানীপুর, বেলঘরিয়ায় ভবেশকার খ্যাপানো জনতার ওপর গুলি চালালে পুলিশ। বেহালার বাসের গুমটি আর ট্র্যাম ডিপোয় আগুন ধরিয়ে দিলে রাগি জনতা। নেতৃত্বে ভবেশকা।

ভবেশকার মগজ থেকে প্রতিদিন নতুন-নতুন প্রতিবাদের শব্দ, শব্দবন্ধ, ভাষা বেরোচ্ছে। বনধ, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, ধরনা, র‍্যালি, মিছিল, সমাবেশ, পথসভা, গেটসভা, পিকেটিং, মোড়মিটিং। ভুল বানানে ছেয়ে গেছে শহরের দেয়াল।

চৌঠা সেপ্টেম্বর তো যারই মুখে রাগি-রাগি ভাব দেখেছে, তাকেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কতজন যে মরেছিল কে জানে। মর্গে লাশ ল্যাংটো করার সেই শুরু। লাশ লোপাটের গণিতের ম্যাজিক তো আগেই শিখিয়ে গিয়েছিল ইংরেজরা। পুলিশকেও নিজের হাতে গড়ে-পিটে পুলিশ বানিয়েছিল ব্রিটিশরা। দুশো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

কলকাতা আর শহরতলির অবস্থা একটু-একটু করে থিতোল।

সেবার তবু সামলেছিল। ষাটের মাঝামাঝি আর পারল না প্রফুল্ল সেন। একে বিধান রায় নেই, তার ওপর ভারতজোড়া ঘাটতি। আলু তো বাজার থেকে একদম লোপাট। প্রফুল্ল সেন বললে, তাতে কী, কাঁচকলা খাও, আপেল খাও। ধানের লেভি হুকুম জারি করলে সরকার। মানে, চালকলগুলোর পুরো মাল চলে গেল সরকারের একচেটিয়ায়।

ভবেশকা বলেছিল, বুড়ার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াসে।

ব্যাবসাদাররা রেগে কাঁই। কলকাতার বড়োবাজারকে চটিয়ে দিলে কোনো সরকার টেকে না। তাদের বিকিকিনি তো লাটে। সরকারিদর আর বাজারদরের মধ্যেকার গভীর খাদে পড়ে গেল বেচারা কংরেস। ধান পাকার আগেই তুলে নিয়ে বিহার আসাম পাকিস্তানে চালান করে দিতে লাগল জোতদাররা। রেশনের দোকান ফাঁকা। মাছিরাও ডানা গুঁজড়ে গুমুচ্ছে।

লোকে বলে সেটা ছিল তিতকুটে ফসলের শীত। খবরের কাগজের ক্রোড়পত্রে ভবেশকা।

চাষিবাড়ির খেতমজুর বউ-ঝিরা চালপাচারের মজায় সেই যে ফেঁসে গেল, সংসার করার কায়দাই পালটে ফেললে। সংসারের ঝক্কি নেই, কাঁচা ট্যাকা, ট্রেনের গুলতানি, একদিনের টিকিটে প্রতিদিন যাতায়াত, রাত্তিরটা হাজতে কখনওবা, হোমগার্ড আর পুলিশের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। মোড়লদের বানানো এতকালের বেড়াগুলো ছেদরে গেছে সেই থেকে।

আগেরবার বিধান রায় তড়িঘড়ি দার্জিলিং থেকে ফিরে তুলে নিয়েছিল লেভি অর্ডার। এবার বুড়োহাবড়া কংরেসের তলানিরা টেরই পায়নি যে পথে-পথে নেমে পড়েছে কচি ছোকরার রাগি দল।

ভবেশকা বললে, পচা গাছডারে শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলার এই-ই সুযোগ। এবিটিয়ে, ওয়েবকুটা, বারো জুলাই, এসেফাই, পিয়েসিউ, এয়াইয়েসেফ, ডিয়েসো, সিটু, কোঅর্ডিনেশান, কিসান সভা, এসপ্লানেড ইস্টে মিলে-মিশে একাক্কার।

বিবাদি-পাড়ার সরকারি আর সওদাগরি অফিসের চাকরেরা আওয়াজে-আওয়াজে কালা হয়ে যেতে লাগলো বলে ওখানে লাউডস্পিকার বাজানো বন্ধ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। তা সত্ত্বেও চাষাভুষোরা মহাকরণে কাজে এলে কেরানিরা তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর শুনতে পায় না। স্ফিংকসের মতন বোঁচা-নাকে বোসথাকে।

তখন ভবেশকার গড়নপেটনের আদলে দিকে-দিকে শ্রমিক-কৃষকের ছবি এঁকেছিল বড়ো দেবুদা। সেই থেকে লালশালু হলে দেয়াল-পেন্টাররা ওরকমই শ্রমিক আঁকে। এমনিতেও, যদিও বাঙালি শ্রমিকগুলো প্যাংলা, বেঁটে আর রুগ্ণ।

আবার এরকম ছবিও আঁকা হয়েছিল, মঞ্চে মাইকের ডান্ডা বাঁ হাতে আর আকাশের দিকে ডানহাত, বক্তৃতা দিচ্ছে ভবেশকা। অবস্হান, অনশন, ফেস্টুন, শ্লোগান, ওঃ, সরকারের ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেল।

ভবেশকার গরিমা তখন দ্যাখে কে। বসিরহাটে মহকুমায় হামলা। নেতৃত্বে ভবেশকা। কৃষ্ণনগরে স্টেশনে আগুন। নেতৃত্বে ভবেশকা। মদনপুর, পায়রাডাঙা, বিরাটির এলআইসি, স্কুল পর্ষদ, উদবাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর তছনছ। নেতৃত্বে ভবেশকা। রামরাজাতলায় বম্বে মেল থামিয়ে আগুন। নেতৃত্বে ভবেশকা।

কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে মরা আনন্দ হাইতের শব মর্গ ভেঙে বের করে মিছিলের আগে-আগে ভবেশকা। ভবেশকার নির্দেশে, যে যেখানে মরেছিল, রাস্তায় গলিতে পার্কে মাঠে, লাল সিমেন্টের দেড় বাই আড়াই ফুটের শহিদ বেদি বানানো হচ্ছিল সেদিনকেই। অনেক জায়গায় শহিদ বেদির বদলে রাস্তায় হাম্প তৈরি হয়েছিল।

তারপর ব্যাস, ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের একদিন সকালে পাড়ার সবাই টের পেল, ভবেশকা রাত্তিরে ফেরেনি। কিন্তু খুশিদিও বাড়িতে নেই। আগের দিন সন্ধে থেকেই দেখা পাওয়া যায়নি ওদের। কলোনির লোকেরা কত জায়গায় খুঁজল ওদের। কোথাও ওদের লাশ পাওয়া গেল না ; হাসপাতালে, থানায়, মর্গে।

কত জায়গায় সাইকেলে চেপে খোঁজ করেছিল যিশু, দিনের পর দিন। ভোরে তিলকনগর, সকালে পোদ্দারনগর, দুপুরে নেলিনগর, বিকেলে বাপুজিনগর। না, কেউ ওদের খবর জানে না। কেউ দেখেনি ওদের। অমন চটক আর গা-গতর, কেউ তুলে নিয়ে যায়নি তো খুশিদিকে, মা বলেছিল বাবাকে। খুঁজতে-খুঁজতে, নিজের প্রগাঢ় অনুভূতির ক্ষত আবিষ্কার করে কেঁদে ফেলেছিল যিশু, একা-একা দাশনগরের কাঁচা রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আর ভবেশকা-খুশিদি কিনা এখানে, কলকাতার এত কাছে, মুণ্ডেশ্বরী নদীর ধারে এই শেষপুকুর গ্রামে, সেই থেকে। কলকাতা থেকে টানা গাড়িতে

সারাতি, তারপর ভ্যান রিকশায় গোপের হাট। চাঁপাডাঙা ওবি ট্রেনে এসে ম্যাক্সিট্যাক্সিতে সারাতি আসা যায়। ভবেশকা কিনা এখানে। কলকাতায় যায় নিশ্চই। প্রথম পোড়ানো ট্র্যামের ছাই মেখে বাঙালির যে নতুন সৎসমাজ, ভবেশকা আজ তার অগুন্তি সন্তানদের একজন।

কীইইইইরে, রোদ উঠে গেল, ক্যাঁদরা গায়ে দাঁড়িয়ে আছিস ঠায়, যা দাঁত মেজে নে।

কণ্ঠস্বরের জলতরঙ্গে ধ্বক করে উঠেছিল যিশুর হৃৎপিণ্ড। চ্যাটা খোঁপায় যিশুদি। হ্যাঁ, সকাল বেলাকার, রোদ্দুরে তার প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেলেছে। পুকুরে ভাসছে মাদুরকাঠির মতন চিকচিকে রোদ। পাঠরত স্কুলবালকের মতন দোল খাচ্ছে সুপুরি গাছের ঝাঁকড়া মাথা। যিশু বলল, তোমার গলার আওয়াজ অবিকল সেরকমই আছে খুশিদি ; তুমি একটুও বদলাওনি। চলো না, আজকেই চলে যাই।

না না না না না না না না। খুশিদি স্পষ্টত আতঙ্কিত।

অ্যাতো কীসের ভয় খুশিদি। এই বয়সেও ভয় পাও!

ভয় তোর জন্যে। আমি বড্ডো অপয়া। তোর যদি বিপদ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার মেলার ভিড় যেদিন থাকবে, অনেক লোকের ভিড় হয়, তখন যাওয়াই ভালো। টের পাবে না কেউ। কলকাতা থেকে টানা গাড়ি আনিস। ঘোমটা দিয়ে নেব।

এখন তোমার গা থেকে তোমার মতন গন্ধ বেরুচ্ছে না। ভয় পেয়েছ বলে।

আমার মতন গন্ধ? আছে বুঝি? পঞ্চায়েত প্রধান আচে না? অসীম তালোধি ওর মেয়ের ভুতের ব্যারাম আচে। দাদা ওষুদপথ্যি করে। রোগবালাই ঝাড়ার জন্যে রাসপা ত্রিফলা হিং রসুন শুঁঠ নিসিন্দে কুঁচিলা বেড়ালা হোত্তুকি চিতেমূল সব বাটছিলুম একসঙ্গে। বোধয় তারই গন্ধ পাচ্ছিলি। বাটতে-বাটতে কালকের মন্তরগুনো, যেগুনো আমার জন্যে বলছিলিস, মনে পড়ে গেল। তাই দেকতে এলুম অ্যাতোক্ষুণ ধরে ঘাটে কী কচ্চিস।

ভবেশকা ঝাড়ফুঁক করে বুঝি? অদ্ভুত। কোথায়, ভবেশকা?

দাদা তো বেরিয়েচে। কাজ ছিল কি? দুপুরের আগে ফিরবে না।

তাহলে এসো। খুশিদির হাত শক্ত করে ধরে যিশু। এসো আলচাষির আর চাষের গল্প করি। অভিভূত হাতের পর্যটনপ্রিয়তার কাছে সমর্পিত, স্পর্শে অবহিত হয়ে ওঠে দেহ। মুগ্ধ যিশু গলা নাবিয়ে বলল, যদি জানতুম তুমি এই গ্রামে আছ, তাহলে বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান মেদিনীপুরে অযথা সময় নষ্ট করতুম না। এসো।

.

০৮.

শেষপুকুরের হিমঘর কখনও মুসুলমান মালিকের ছিল। শাজাহানের তাজমহলের মতন হিমঘরটাকে দ্বিতীয় বেগমের স্মৃতিমন্দির করেছিল লোকটা। হিমঘরের পেছনের মাঠে স্বামী-স্ত্রীর কবর, ইঁটের দাঁত-বেরোনো, ছাগলছানারা ওটায় চড়ে লাফ খেতে শেখে। লোকটার ছেলে দেশত্যাগের কাটাকাটির সময়ে গায়ে হাতে পায়ে ছোরাছুরির চোট নিয়ে পাকিস্তানে ভৈরব নদীর ধারে পালিয়েছিল। ভবেশকার সঙ্গে ওর যোগাযোগটা ভবেশকার নাছোড় অধ্যাবসায়ের ফসল।

বর্ধমান থেকে আরামবাগ হয়ে সারাতি পৌঁছেছিল যিশু। আসার দিনই দেখেছিল, তারকেশ্বর-আরামবাগ রোডে চারটে করে আলুর বস্তা সাইকেলে চাপিয়ে সার বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে প্যাংলা গলদঘর্ম ছেঁড়ালুঙ্গি খালি-গা চাষিরা।

চাষির কাছ থেকে ফ্যালনা দামেও আলু কেনার লোক নেই। চাষি ধারে বেচবে ছোটো আড়তদারকে, ছোটো আড়তদার বড়ো আড়তদারকে, বড়ো আড়তদার শ্যালদার কাঁচাবাজার কিংবা বড়োবাজারের পাকাবাজারকে।

চাষিরা আর ছোটো আড়তদাররা কবে যে টাকা পাবে তার ঠিক নেই। আলুর চেয়ে খড়ের আশি আঁটির দাম বরং বেশি। আলু বিকোচ্ছে না। এদিকে খড়ের দাম চড়ছে। আলু বিকোয়নি বলে চাষিরা বীজ আলুর ঋণ শোধ করতে পারেনি। ছোটো আড়তদাররা বীজ আলুর টাকা আদায় করতে না পেয়ে অসহায়। ধরট নিতে চাইলেও এগিয়ে আসছে না কেউ।

প্রশ্ন তুলে উত্তরটা লিখে নিতে দেখলে, কুণ্ঠিত-সঙ্কুচিত হয় গাঁয়ের লোক। লেখালিখিকে সন্দেহ করে সবাই। বুকপকেটে একটা ছোটো টেপ রেখেছে যিশু যাতে কেউ টের না পায়। যারা অভিযোগ জানাতে চায়, তাদের জিগ্যেস করতে হয়। কোন চাষির দুঃখের বোতাম কোথায়, আঁচ করে টিপলেই, গল-গল করে বেরোতে থাকে ক্রোধ কষ্ট দুর্দশা হতাশা গ্লানি অভিশাপ।

চাষির অভিশাপ একদিন ফলবেই, চাষিরাই বলে সেকথা।

বড়োতাজপুরের মামুদ মাফুজ। আগে তো লোডিঙের সময় থেকেই আলুর দর চড়ত। বণ্ডের ব্যামো ধরিয়ে দর কমিয়ে দিলে। আমরা কিচু বুঝিনে? ঘোড়ার ঘাস খাই? ওই তো, আলু চাষের জন্যে ঋণ নেয়নি শ্বেতলেশ্বর গাঁয়ের সমবায় সমিতি। তাদের সদস্যরা বণ্ড পেলে কী করে? হাঃ। আমাদের কাচ থেকে সংরক্ষণ বাবদ বাড়তি ট্যাকা আদায় হচ্ছে। অথচ মহাজন আর ফড়িয়া দালালরা চাষি সেজে বণ্ড পেয়ে গেল। ভক্তিপদ কুণ্ডুর চার হাজার প্যাকেট ঢোকানো হয়েচে, ইদিকে এক ডেসিমাল জমিও নেই। হাতে-পায়ে কুঠ হয়ে মরবে যত বেজন্মার দল, এই আমি বলে রাকচি।

খিলগাঁয়ের ক্ষুদিরাম ঢাং। এবছর শীত পড়েছিল টানা, না কী গো? বিষ্টিবাদলা ঝড়ঝাপটা হয়নে। হাওয়াটাও শুগনো ছিল এবার। তা বোরো চাস তো হবে নে। আর গেল বছর আলুর দাম উটেছিল ভালো। ভেবেছিলুম, আলু তুলে সব ধার-দেনা মিটিয়ে দিতে পারব এবার, ওই যে দেকুন না, ওই চালটাও সারিয়ে নিতুম, মেজো মেয়্যাটার বিয়ের জন্যিও জমাতে পারব কিছু ট্যাকা। কিচ্ছু হল নে। আমাদের দেকার কেউ নেই। আমাদের কতা শোনার কেউ নেই। কীটনাশক খেয়ে মরতেও ভয় করে গো বাবু।

বেলসলিয়ার আচেরুদ্দি মল্লিক। দেখেন না কেন, বাড়িতে সকাল থেগে উটে কাজ হয়েচে পচা আলু আর ভালো আলু আলাদা করার। নিত্যি দিন। আলুর তো পাহাড় জমে গেচে।পচা বাছতে বেলা হয়ে যায়, তাপপর দাগ ধরলিই কেটে-কেটে গরু-ছাগলকে খাওয়াচ্চি। গরুগুনোও আর আলু খেতে চায় না। আগে তো টানের সময়ে দাগি আলুও কাঁচাবাজারের মহাজন নিয়ে যেত। রাত্তিরে আলুর পাহারাও হয়েচে ঝকমারি। ছেলে দুটোর রাত জেগে-জেগে শরীর বেগতিক হয়ে গেল। ওর মায়ের হাত দুটো দেকুন। দেকাও হাত দুটো, দেকাও, দেকাও না, লজ্জাশরমের কী, উনি তো হালিম-কালিমের চেয়েও ছোটো। দেকুন, পচা বেছে-বেছে হাতময় দানা বেরিয়ে গেচে।

হালিম মল্লিক। আমাদের গাঁয়ে পচা আলুর নাম হয়েচে কলিমালু, নেতার নামে। আলুর গোলমালের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে ওননো বিভাগে পাটাচ্চেন শুনলুম।

বাদলাপুরের দেবেন জানা। চল্লিশ বছর আগে দার্জিলিঙের বিজনবাড়িতে আলুর ধসা রোগ হয়েছিল, বুঝলেন বিশ্বাসদা। কেন্দ্র সরকার তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ করে দেছলো। তা সে অর্ডার তোলবার কারুর খেয়াল হল না অ্যাদ্দিনেও। তেনারা পোঁদে তেল দে ঘুমুচ্চেন। ইদিকে অন্ধ্র উড়িষ্যা থেকে তো ফি বছর আলু এসছে এখানের বাজারে। এখান থেকে নুকিয়ে-নুকিয়ে গেছে সিকিম ভুটান আসাম। লাগ-লাগ টন আলু পচার পর এখুন অর্ডার তোলার কাগজ বেরুচ্চে বলে শুনিচি। কেন্দ্র সরকারে জহোর্লালের টাইম থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোক নেই। জহোর্লাল দিনকতকের জন্যে চারু বিশ্বাসকে মন্ত্রী করেছিল, তাও ফ্যালনা। নেতাগুনোর বাপের দুটো করে বিয়ে। তাই বিমাতা-বিমাতা করে নাকে কাঁদে।

খাগড়াপাড়ার সত্যনারায়ণ সামান্ত। আমি স্যার দিসি উপায় করিচি। এই বটগাছতলায়, ওই যে, ওখেনটায়, আড়াই ফুট গত্তো খুঁড়ে প্রথমে বালি, তার ওপর কীটনাশক ছড়িয়ে আট কুইন্টালটাক আলু রেকিচি। তার ওপর আড়াআড়ি-লম্বালম্বি খড় বিছিয়ে আবার ওষুদ ছড়িয়ে দিইচি। ওই ইঁটের পাঁজা চাপিয়ে ঢেকে দিইচি। তিনচার মাস তো অন্তত থাগবে। তারপর

কপাল। ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে। কত দৌড়োদৌড়ি কল্লুম। এক প্যাকেট মতনও জায়গা পেলুম না। পঞ্চায়েতের কোটাও পেলুম না, সরকারি কোটাও পেলুম না। আর কত দাম ধরে মালিকের কোটা নিতে গেলে আমাদের মতন চাষির পুষোবে না। জেলাসদরে বল্লে, মন্ত্রীর ঠেঙে চিটি আনো, থালে সরকারি কোটা পাবে। কাকে ধরি? বলেন। তাই এই উপায় করিচি। ইদিকে সেলসিয়াস আবার চল্লিশে চড়তে চলেচে।

গুপ্তিপুরের বুড়ি। আলু-পচা আন্ত্রিকে নাতি মারা গেচে। নিববংসো হবে, অ্যাই বলে রাগলুম। যমে নেবে, যমে নেবে।

খড়ি নদীতে জোড়া-নৌকোর মাচানে দাঁড়িয়ে কুতিরডাঙার অক্ষয় ঘোষাল। আলু পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ সদ্য পকেটকন্দরে স্ফূরতুবঃ হিমঘরনন্দনঃ।

বড়োপলাশনের শ্যামদাস প্রামাণিক। দশ প্যাকেট আলুর জন্যে মাসে এক প্যাকেট সুদ। অতিষ্টো করে মাল্লে। পাপের ভোগান ভুগতিই হবে।

ষাটপলনের কেষ্ট দেবনাথ। দাদা সিপিয়েম করে, আমি ফরোড ব্লক করি, ভাবছি এবার তৃণমূলে যাবো। আমি না পেলে দাদা। দাদা না পেলে আমি। কেউ তো বন্ড পাবো। তাছাড়া কৃষি বিপণন আর সমবায় তো সিপিয়েম দলের হাতে। আমাদের অসুবিধা তেমন হয় না।

জমিরাগাছির অনন্ত কুণ্ডু। আপনি একবার ভেবে দেখুন স্যার। ধান আর গমের বেলায় সংগ্রহমূল্য বছর-বছর বাড়িয়ে দিলে বলোরাম জাখড়। আলু কি জাখড়ের অ্যাঁড়, অ্যাঁ? তা কেন সংগ্রহ করবে না সরকার? তার কেন সংগ্রহমূল্য হবে না? বলুন আপনি। আলুও তো ক্যাশ ক্রপ। আসলে পঞ্জাব আর হরিয়ানার বেলায় দরোজা হাট করে খোলা। আমাদের বেলায় পোঙায় লাতি।

এর আগে অনেক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে যিশু। কত কারখানা আর ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দিতে সাহায্য করেছে মোদি গোয়েঙ্কা মল্ল ভারুচা খান্না খৈতান লালওয়ানি কেশওয়ানি মাহিন্দ্রা শিল্পপতিদের। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। স্রেফ মগজ খাটিয়ে। এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি আগে। পেরু না বোলিভিয়া কোত্থেকে এসে বাঙালি জীবনে ঢুকে পড়েছে নির্বিকল্প আলু, পর্তুগিজদের অবদান।

আলুহীন পৃথিবী ভাবাই যায় না। বেলে কিংবা পলি দোআঁশ অল্প-টোকো জমিতে মখমল মাটির লেপ চাপা দিয়ে কেমন ডিম্বাশয় গোলগাল, তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে গভীর আয়ত চোখে ভূমিষ্ঠ হয় চন্দ্রমুখী আলু। ভূমিষ্ঠ হয় জ্যোতি অলঙ্কার কুন্দন সিঁদুরি নবীন সফেদ কুমার বংশের খোকাখুকু যুবকযুবতি। এদের অনেকে চন্দ্রমুখীর সদবংশের নামে পৌঁছোয় বাজারে। ভিজে হাওয়া আর কুয়াশা সহ্য হয় না ওদের। নাবি, ধসা, ভুষা,

সাঙ্কোষপোরা রোগে ধরে। বড্ডো সুখী ওরা, তাই উই পোকা, পিঁপড়ে, কাটুই পোকা, লাল বিটল, জাব পোকা, থিপস, সাদা গ্রাব, সুতলি পোকার দলবল সুযোগ পেলেই ওদের শীতের রাত্তিরে জাপটে ধরে। ওদের আঃ উঃ লক্ষ্মীটি পায়ে পড়ি, প্রাণে মেরো না, বাঁচাও-বাঁচাও নিঃশব্দ চিৎকার মাঝরাতে মাটিতে কান পেতে শুনতে পায় আলমপুর গ্রামের কাশীনাথ মাইতি। টাকার মতন আলুও বহুবল্লভা।

সে আলু, পচলে যে আটদশ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসের দখল নিয়ে নেবে, নানা রকমের মাছি আর উনকিকে দূরদূর দেশ থেকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনবে, সোহাগ পেতে, সে অসহ্য দুর্গন্ধের সঙ্গে গতবছর বৈশাখে পরিচিত হল যিশু, পরপর কয়েকটা হিমঘরের তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে। ওফ, নরক, নরক।

শীতযন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল পোলবা দাদপুরের বালিকুখাড়ি সমবায় হিমঘরে। পচে জল হয়ে গেল আলু। পাঁচ হাজার চাষি পরিবার সর্বস্বান্ত, রিপিট, সর্বস্বান্ত, লিখে রেখেছে যিশু। চাষিরা হিমঘরের সামনে গিয়ে ধরনা দিচ্ছিল বলে একশো চুয়াল্লিশ জারি হল। একদিকে হিমঘরের লোকেরা আরেক দিকে চাষিরা। সে কী হাতাহাতি মারামারি লাথালাথি। চুঁচড়ো থেকে বিরাট পুলিশপার্টি গিয়ে লাঠিপেটা করে বাগে এনেছিল। দিনদুপুরে মশারির মধ্যে বসে ল্যাপটপ খুলেছিল, অ্যাতো মাছির ঝাঁক। না খেয়ে ছিল বারোঘন্টা, নিরম্বু। তারপর পালিয়েছে। কত জনের যে হাঁপানি ধরে গেল কে জানে। চারটে চাষির বাড়িতে সাতটা বাচ্চা মরেছিল আন্ত্রিকে। অনেকের গা-ময় দাগড়া দাগ বেরিয়েছে, গাঁয়ের বদ্যিরাও তার ওষুধ জানে না।

দুর্গন্ধ সৃষ্টি করায় মানুষের জুড়ি নেই। যত উন্নতি, তত আবর্জনা, তত নোংরামি, তত দুর্গন্ধ।

গোস্বামীমালপাড়ার হিমঘরে সাতষট্টি হাজার প্যাকেট নষ্ট হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হালিম মাজেদ ছিল জেলাশাসকের আপিসে, কোনো কাজে। বললে, বিমার টাকা উশুল করেও হিমঘর সমিতি বিমা করায়নি। চোত মাসে বিমা কোম্পানির লোক এসেছিল, কিন্তু কম ভোল্টেজে যন্ত্র বিকল হয়ে আলু পচার ভয়ে বিমায় রাজি হয়নি। বেলমুড়ি থেকে বিজলি আসে টিমটিম করে। দুটো জেনারেটর, তা দুটোই পড়ে আচে ভেঙে। হিমঘরের সহসভাপতি মহম্মদ জাকারিয়া বলেছিল, কিচু আলু বাঁচানো যাবে। তা বাঁচানো যায়নে কিচুই। নির্বাচন এসে পড়েছিল বলে মজুর-কামলা-মুটিয়া পাওয়া যায়নে। এলেকশান এলে কিচু পয়সার মুখ দেখতে পায় ওরা।

পচে হালুয়া হয়ে গিসলো আলু। অমন সুন্দরী চন্দ্রমুখী কন্দ নিজেরা পচেছে, থলেগুলোকেও পচিয়েছে। আলুর পাহাড় থেকে আগ্নেয়গিরির পচা লাভাস্রোত। আশপাশের ভাদিলপুর, দেপুর, কেয়োলপার গাঁয়ের লোকেদের পাতলা পায়খানা আর ভেদবমি থামতেই চায় না। প্রাণ একেবারে অস্থির,

আইচাই, কাহিল। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই আলুপচা রোগ সারাতে বিফল। হিমঘরের বাইরে পচা আলুর কাই কেঁখে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়েছিল। দুর্গন্ধ আর একরোখা মাছি যায়নি তবু। পচা আলুর গ্যাস বের করতে ছেঁদা করা হয়েছে দেয়াল। তবু হিমঘরে গুমরে মরছে পচা আলুর শবের বদগন্ধ।

কলকাতায় তখন বিদেশি সিনেমার উৎসব চলছে। বিটকেল নামের পরিচালকদের হাফল্যাংটো ছবি দেখার জন্যে হাড়হাভাতে বিদ্বানদের দাঁতকেলানে লাইন।

আর আলু যেটুক বেরোতে পেরেচে, বলেছিল বালিকুখাড়ির লুৎফর রহমান, এমনভাবে চাষিবাড়ির ছেল্যামেয়্যার পেচনে লেগেচে বাবু, যে ওঝা ডেকেও ছাড়চেনে। বিষ্টি পড়লে আর দেকতে হবেনে। আলুর গুয়ের বান ডাকবে। নিমাই ঢোলের মিষ্টির দোকান একমাস বনদো।

কালনার বংশীধর হিমঘরে বীজ আলু পচে গেছে। হিমঘরের ভাড়া জমা দিয়ে গেটপাস পাবার পরও বীজ আলু দিলে না। অ্যাতোটা পথ এসে চোপোররাত হয়রানি। একদিন তো চারঘন্টা রাস্তা অবরোধ হল। হয় বীজ দাও নইলে দাম দাও। হিমঘরের চাকরেবাবুরা গণপিটুনির ভয়ে টেবিলে খোলা কলম ফেলে হাওয়া। শয়ে-শয়ে চাষি জড়ো হচ্ছে আর গলার শিরা ফোলাচ্চে। ভবভূতি কপালি জমি তৈরি করে, ছেলেকে বীজ আনতে পাঠিয়েছিল। শক্তি সরকার পাওয়ার টিলার ভাড়া নিয়ে, জমিকে দিন দশবারো পতিত রেখে, জল কমপোস্ট রেড়ির খোল নিমের খোল দিয়ে, জো বুঝে মাটি ভেঙে আলু বোনার নালা কেটে ফেলেছিল। অলড্রিন আর ব্রাসিকল এনে রেখেছে। তারপরই বজ্রপাতের মতন সর্বনাশা খবর। আলুর মড়কে বীজ নষ্ট। দিন দশের মধ্যে না পাতলে ফলন হবে না।

দুজনেরই করোনারি থ্রমবোসিস, আলুপচা রোগে, বললে সদর হাসপাতালের ডাক্তার।

মুটিয়া মজুর সর্দারদের ভাগা আর কমিশন থেকে কাটমানির নিষ্পত্তি না হওয়ায় বীজের আলু বাইরেই পড়েছিল টানা পনেরো দিন। বীজ আলু হল চাঁপা ফুলের পাপড়ি। অযত্ন ওদের সহ্য হয় না। তিন নম্বর চেম্বারে তিরিশ হাজার প্যাকেট বীজ আলু নষ্ট হল। এক চাষির বীজ অন্যকে দিয়ে যদ্দিন চলে চালিয়েছে। দিতে-দিতে ফুরিয়ে গিসলো। আলুর অদৃষ্ট, চাষির অদৃষ্ট।

কিন্তু আলুর গপ্পো নিয়ে তুই কী করবি রে? বলল খুশিরানি মণ্ডল।

ভবেশকা অ্যাতো সম্পত্তি আর টাকা নিয়ে কী করবে, বলো তুমি, অ্যাঁ? সেই ভবেশকার এমন ভুঁড়িটুড়ি, ঠাকুরদেবতা, ঝাড়ফুঁক, দলাদলি, আলখাল্লা, ওফ, আমি তো ভাবতেই পারি না। ট্র্যামের ভাড়া এক পয়সা বেড়েছিল বলে, আর আলু পাওয়া যাচ্ছিল না বলে, কী-ই না করেছিল ভবেশকা। ভবেশকাকে দেখছি আর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গেরুয়া,

বাবারচুল, সত্যসাইবাবা, মাদুলি, গোমেদের আঁটি, জলপড়া। আধুনিক লোকটার তো দফারফা। কেন, অ্যাঁ, কেন?

যিশু জানে খুশিদি অবোধ, নিষ্পাপ, অজ্ঞান, তাই নির্বাক।

তোমার জন্মের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভবেশকা তোমায় একটা ভারি কালো লোহার শেকলে আষ্টেপৃষ্টে আগলে রেখেছে, রুমালে চোখ বেঁধে। কত চাষির আলু নিশ্চিন্তে পচিয়ে ফেললে ভবেশকা। পঞ্চায়েতের যে পঁচাত্তর শতাংশ বন্ড তা-ও গোলমাল হয়েছে, কালোবাজার হয়েছে, আর মালিকদের কুড়ি শতাংশ তো সোজা বেচে দিয়েছে পাকাবাজারে। এমনকী চাষির বন্ডেও ভবেশকার সই না থাকলে হিমঘরে তোলা যাবে না। সেই ভবেশকা, ভাবতে পারো তুমি! বুকের মধ্যে চব্বিশঘন্টা বারোভুতের মেলা চলছে ভবেশকার।

জানি। খুশিদির চোখের পাতা কাঁপে।

খুশিদি কেঁদে ফেলবে। যিশুর হৃৎপিণ্ডের কপাটক ফরফর শব্দ করে নিঃশব্দে। ভবেশকার প্রসঙ্গ পালটায়। বুঝলে, বীরভূমে ষাটপলসা হিমঘর চালানো নিয়ে সে কী খেওখেয়ি। হিমঘর সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ দাশ আর বাদবাকি সদস্য রেবতী ভট্টাচার্য, অম্বিকা দত্ত, জনার শেখ এরা হল ফরোয়ার্ড ব্লকের, কিন্তু আরেক সদস্য মিনতি ঘোষ, যিনি পঞ্চায়েত প্রধান, তিনি সিপিয়েমের, এখন পালিয়েছেন তৃণমূলে। সমবায়ের পাঁচ লাখ টাকার হিসেব মিলছে না অভিযোগ তুলে বিশ্বনাথ দাশ বরখাস্ত করলে সহকারি ম্যানেজার শিশির ঘোষ আর ক্যাশিয়ার বৈদ্যনাথ মণ্ডলকে। ব্যাস, আর দ্যাখে কে ; বেঁধে গেল দু-দলের কাজিয়া। ময়ূরেশ্বরের সিপিয়েম সভাপতি ত্রিপুরেশ্বর মণ্ডল দখল নিলে চেয়ারম্যানের কুরসি। আদালতের হুকুমে বিশ্বনাথ দাশ ফিরে পেয়েছে চেয়ার। এই আলুমন্থনের বিষের ভাগটা চাষিদের।

জানি, এখানেও সিপিয়েম, তৃণমূল, কংরেস আর বিজেপি হয়েচে। সবাই মিলে একটা নাম নিলেই তো হয়। চাপা কান্নায় খুশিদির অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বরে ভাঙন।

গল্পের রেশ থামলে খুশিদির আপ্রাণ ধরে রাখা অশ্রুবিন্দু টপ করে ঝরে পড়বে আর যিশু চেতনায় ঘটে যাবে বিস্ফোরণ।

কথা বলা বজায় রাখে ও, যিশু। পুরশুড়ার হরপার্বতী হিমঘরে কী হয়েছে জানো না? দেড় কোটি টাকার আলু পচিয়ে, বিদ্যুৎ পর্ষদের কয়েক লক্ষ টাকার বিল না মিটিয়ে, পুরোনো মালিকরা নতুন এক ব্যাবসাদারকে চুপচাপ হিমঘর বেচে দিয়ে পালিয়েছে। চাষিদের ক্ষতিপূরণ যে কে দেবে বা আদৌ দেবে কিনা, কেউ জানে না।

নতুন মালিক পচা আলু বাইরে বের করে পোড়াচ্ছিল। সেই তেল-চিটচিটে ধোঁয়ায় গোলাপজাম আর জামরুল ওব্দি পাকা জামের মতন কালো হয়ে

গেছে। পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পতিতপাবন জানা শেষে গিয়ে আলু পোড়ানো বন্ধ করলে।

খুশিদির ম্লান মুখাবয়বে তবু পরিবর্তন নেই।

যিশু বলল, এবছর মোহনবাটির হিমঘরে অ্যামোনিয়ার ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে সোমথথ পাটগাছগুলো অজ্ঞান হয়ে গিসলো।

খুশিদির ভাব পাল্টাচ্ছে না দেখে যিশু দুবাহু ধরে চোখে চোখ মেলে জানায়, মিছেই এসব গল্প করছি। তুমি কি কিছু বলবে? খুশিদি? বলবে কিছু?

.

০৯.

সন্ধ্যা। চাঁপাডাঙা লোকাল থেকে হাওড়ায় নেমেই সুটকেস হাতে দৌড় লাগাতে চাইছিল যিশু। পারছিল না। রাস্তা আটকে ধিরে-ধিরে হাঁটছে ফণাতোলা সাপের মতন সতত উদ্যত নিতম্ব, একগাদা, নানা আদল আর আদরায়। সামান্য ফাঁক পেতেই পাশ কাটিয়ে আবার দৌড়োয়।

একজন ষণ্ডা পুলিশ অফিসার আচমকা ওর বাহু আঁকড়ে থামাতে, রক্ত চলকে ওঠে হৃৎপিণ্ডে। পায়ের পাতা, আঙুলসুদ্দু, শিরশির করে ওঠে মোজার ভেতরে, ভয়ে, গলায় শ্লেষ্মা উথলোয় হঠাৎ। কোনো অপরাধ না করেও অপরাধের বোধ মগজে ঘুরঘুর করে ওর, মুহূর্তে মনে হল যিশু বিশ্বাসের।

সম্বিতস্হ হয়ে যিশু থ আর ক্রুদ্ধ। আদিত্য। সঙ্গে অরিন্দম, বিটকেল জুটি।

আদিত্যর ভিড়-জমানো অট্টহাস্য, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ওফ ভয় পান পুলিশকে! কী কেলেঙ্কারি করে ফিরছেন দাদা? অ্যাগবারে চোখকান বুজে দৌড়োচ্ছিলেন। তা কই, কোনো কেটলিবাই বা খুন্তিসুন্দরীকে তো দেখছি না। ওপাশ দিয়ে সটকিয়ে দিয়েছেন?

হাত ঝাঁকিয়ে ছাড়ায় যিশু। শ্যাঃ, এরকম ইয়ার্কি ভাল্লাগে না। অরিন্দম, তুমি আবার অপর্ণা সেনের মতন মার্কেটেবল হাসি দিচ্ছ কেন?

আদিত্য পাছায় দুহাত, পেছনে ঝুঁকে, জিভের ডগা মুড়ে কথা বলার কায়দা, পুলিশে চাকরি পেয়ে শিখেছে, বজায় রাখে। ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ, নির্ঘাৎ কিছু গোলমাল করে ফিরছেন আটপুর জাঙিপাড়া থেকে, বলে দিন দাদা, বলে দিন, আমরাই বাঁচাব, আমরাই হলুম গে রোকখোক আর ভোকখোক।

আরে ট্যাক্সি ধরতে ছুটছিলুম, কেঁচিয়ে দিলে। চলো, একটা ট্যাক্সি পাইয়ে দাও। সুটকেস প্ল্যাটফর্মে রেখে, সিগারেট বের করে ধরায় যিশু, তারপর খেয়াল হওয়ায়, এগিয়ে দ্যায় আদিত্যর দিকে।

অ্যাতো টাকা রোজগার করেন, একটা গাড়ি কেনেন না কেন?

গাড়ি? বাবা-মায়ের বিয়ের দিনেই গাড়ি কিনে দিয়েছিল দাদু, সেটা চুয়াল্লিশ সন। সে গাড়িতে চেপে শ্রীরঙ্গমে শম্ভু মিত্তির বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন দেখতে গিসলো দুজনে, প্রথম দিনের শো। পরে তো শ্রীরঙ্গমের নাম হয়েছিল বিশ্বরূপা, এখন কাছাকাছি পার্ক করা যায় না। তা হল থেকে বেরিয়ে দেখলে গাড়ি হাপিস। আর পাওয়া যায়নি গাড়ি। বাবা আর গাড়ি ছোঁয়নি। আমিও বাবাকে ফলো করছি। গাড়ি রাখা আর চালানো কলকাতায় ঝকমারি, এমন তোদের গিরগিটি এসট্যাবলিশমেন্ট।

মানে? অন্য দিকে তাকিয়ে অন্য কিছু খোঁজায় মনস্ক, ধোঁয়ার টুসকি ঝেড়ে জানতে চায় আদিত্য।

গিরগিটির মাথা কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও কমলা রঙের হলেও, গিরগিটিটা গিরগিটিই থাকে। তুই এসব বুঝবি না। অরিন্দম এখানে কেন? কেউ আছে-টাসছে নাকি?

হ্যাঁ, অরিন্দমদা অফিস থেকে দুদিন ছুটি নিয়ে বিহার থেকে আসা সব গাড়ি আমার সঙ্গে অ্যাটেন্ড করছে। অরিন্দমদার অফিসের এক পুরোনো বন্ধুর কলকাতায় আসার কথা আছে। লোকাল ট্রেনটা এখনও বিয়োচ্ছে, তাই চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে আদিত্য।

অরিন্দমের বন্ধু তো তোর তাতে কি?

এককালে অরিন্দমদার সহকর্মী ছিল লোকটা। চাকরি ছেড়ে এখন গয়া পালামউ জাহানাবাদ হাজারিবাগে খেতমজুর খেপিয়ে বিপ্লব করছে। সে ব্যাটা ব্রামভোন।

তা করুক না ; তোর চাকরিতে তো বাধ সাধছে না।

আরে কলকাতায় আসছে অ্যাসল্ট রাইফেল বোমাফোমা কিনতে। শালা আর জায়গা পেলে না। লোকালের টুপটাপ বিয়োনো শেষ। নিত্যযাত্রীদের পচা কর্মসংস্কৃতির ঘেমো গন্ধ। মমমম।

ওওওওহ। তাই ফুল ড্রেসে চোর ধরতে বেরিয়েছিস, আর অরিন্দম এসচে খোচরগিরি করতে। যিশু কাঁধ নাচিয়ে হাসে।

আদিত্যর জিভের ডগা এখনও মোড়া। আরে এই সাবভারসিভ এলিমেন্টগুলো দেশের কাঠামোটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দিচ্ছে না। আগে তবু রঞ্জিত গুপ্ত, দেবী রায়, রুণু গুহনিয়োগীর মতন দায়বদ্ধ অফিসাররা ছিল। সেরকম ডেডিকেটেড অফিসার আর আজগাল কোথাআআআয়।

অরিন্দম গম্ভীর, নিরুত্তর। এরকম অনেকবার হয়েছে ওর। ওর উপস্থিতিতে ওর উদ্দেশে করা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে আরেকজন। লোকালটা বিইয়ে শেডে ফেরার ভোঁ।

বাড়ি ফেরার তাড়া, তার ওপর ক্লান্ত, দৌড়ে ট্যাক্সি ধরার ধান্দায় কুলি নেয়া হয়নি ; যিশু স্টেশানের ভিড়ে বিরক্ত। বলল, বেশি-বেশি পোঁদপাকামি করিসনি, বুঝলি। মরবি শেষকালে। ভদ্রেশ্বর থানার ওসি ভোলানাথ ভাদুড়ি, ডোমকলের কন্সটেবল তপন দাস, জয়নগরের এস আই অশোক ব্যানার্জি, ওদের মতন বেঘোরে মরবি। আর ডেডিকেশান সাবভারসান এসব কপচাসনি ফালতু। এই তো জুন মাসে, রায়গঞ্জ থেকে খড়-বিচুলি নিয়ে একটা ট্রাক শিলিগুড়ি যাচ্ছিল, তার ড্রাইভার অরুণ দাস তো ইসলামপুর থানার বেরাদরদের তোলা দিতে পারেনি বলে ওকে আর খালাসিটাকে আড়ংধোলাই দিয়ে ওদের রক্ত জবজবে মুখে মুতলেন তেনারা। ইটস আ ফ্যাক্ট, আই অ্যাম নট জোকিং। আমি তখন ইসলামপুরে ছিলুম। অন্য লরি ড্রাইভাররা জানতে পেরে যখন একত্রিশ নম্বর হাইওয়ে অবরোধ করল, তখন কেস গুবলেট করার জন্যে তোর ব্রাদাররা খালাসিটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে পাশের চোপড়া থানায়। আমার কাছে খাপ খুলিসনি, বুঝলি। দুশো পাতার প্রজেক্ট রিপোর্ট প্যারা বাই প্যারা মুখস্হ বলতে পারি। ভুলে যেও না ইন্দিরা গান্ধি যে অভিশাপ কুড়োল তাতে নিজে তো গেলই, ছেলে দুটোও অপঘাতে মারা গেল। আর তোদের তো হেমেন মণ্ডল, শ্রীধর দাস, রাম অবতার, জয়চাঁদ শৈঠিয়া, রশিদ খান, বালা ভাগানি, রমেশ সিংদের মতন দায়বদ্ধ ক্যারেক্টার না হলে চলে না। যিশু, সংলাপের অস্বাভাবিক দ্রুততায় হতবাক করে ওদের দুজনকে।

ওদের ঘিরে বেগতিক জনতার আগ্রহ শুরু হওয়ায়, অপ্রস্তুত আদিত্য বলল, আপোষের স্তুতিময় কণ্ঠে, আরে চটছেন কেন, চলুন-চলুন, ট্যাক্সি পাইয়ে দিচ্ছি। দেশভাগের পর আর ফলে, উত্তরঔপনিবেশিক ভিড়ের ঠ্যাঙাড়ে, খামখেয়াল, প্রতিদ্বন্দ্বীর যে কোনও একটা পক্ষকে গণশত্রুর ছাপ দিয়ে দিতে চায়। কাউকে শত্রু ঘোষণা করার মধ্যে ঘোষকের আত্মপ্রসাদের হুকুমনামা থাকে।

বাঙালিজীবনে এখন শত্রু না থাকাটা অবক্ষয়। প্রেম, তার মানে, শুধু ঈশ্বরের জন্যে, পাথরের দেবী-দেবতার জন্যে, প্রকৃতির জন্যে।

অরিন্দম বিব্রত। গণশত্রু শব্দটা খাঁটি বাঙালির নয়। বলল, আর রাষ্ট কোনো নেড়েকে ধরলেই সন্দেহ হয় আজকাল, নির্ঘাত ফাঁসাচ্ছে।

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে আদিত্যর যিশুকে প্রস্তাব, অরিন্দমদা আপনার আবিষ্কার-করা কেটলিউলির সঙ্গে পরিচয় করতে চাইছিল।

কেন? ওর কি নিজের মুখ নেই কথাটা পাড়ার? যিশুর পক্ষে রাগ করাটা ওর স্বাস্হ্যের পক্ষে জরুরি। কারুর দিকে না তাকিয়ে বলল, আগের নিজের বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করুক, মুচলেকা দিক, ধরিয়ে দিক, ভারতরত্নটত্ন পাক।

যিশুদা আপনি আমায় জানেন, তবু এমন কথা বলছেন কেন? আসার আগে আদিত্য আমায় কিছুই বলেনি। অরিন্দম স্বার্থপর আম-জনতা আর ফিচেল হাবডুস নিত্যযাত্রীর ধাক্কা, এড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও, খেতে-খেতে, যিশুর সুটকেস আদিত্যর হাতে, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড পর্যন্ত তিনজন চুপচাপ হাঁটে। আদিত্যকে দেখে একজন সাদাপোশাক ভিকিরি বেঁকানো শিরদাঁড়া সোজা করে সেলাম ঠুকল। পোশাকের রাষ্ট্র-ক্ষমতার দাপটে আদিত্যকে জায়গা ছেড়ে দেয় লোকে। হাঁটেও সেভাবে আদিত্য। উত্তরআদর্শবাদী নবযুগের কমিসার।

কিউ-এর চেঁচামেচিকে দাবড়ে, আদিত্যর দরজা খুলে দেয়া প্রথম ট্যাক্সিটায় বসে, অরিন্দমের দিকে স্মিত তাকিয়ে, প্রশমিত যিশু জানায়, কেটলিউলি ঘৌড়দৌড় দেখতে চায় অরিন্দম, পরিচয় করিয়ে দেব, নিয়ে যাবেনখন রেসকোর্সে। নিজে গেছেন তো কখনও? না গিয়ে থাকলে রাসেল স্ট্রিটে খোঁজ নিয়ে শিখে নিন। ওখানে প্যাংলা আর পাঁড়মাতাল রেসুড়েদের কাছে ভালো টিপস পাবেন।

যিশু হাত নেড়ে চলে গেলে, আদিত্য অসংকোচে বলল, আচ্ছা অরিন্দমদা, আপনি তো ক্যানসারে বুককাটা প্রেমিকাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, সে এপিসোড শেষ, নাকি? না, মানে এমনিই জিগেস করছিলুম।

অফিস এক বছরের জন্যে ম্যানিলায় আমাকে ট্রেনিঙে পাঠিয়েছিল, জানো তো? এক বছরের ছাড়াছাড়িতে ব্যাপারটা কেমন যেন আপনা থেকেই চুকে-বুকে গেছে। আমি যখন ছিলুম না তখন অফিসে এ নিয়ে এমন ফিসফিস-গুজগুজ হয়েছিল যে ওর পক্ষে পিছোনো ছাড়া উপায় ছিল না। বেশিদিন বাঁচবে না, লিখেছিল আমাকে। সত্যিই বোধয় বাঁচবে না। রুগণ চেহারা হয়ে গেছে। আর তো কথাবাত্রাও হয় না। ও-ও এড়িয়ে যায়, আমিও এড়িয়ে যাই। একই অফিস বলে খুবই এমব্যারাসিং। ট্রান্সফার নিয়ে লখনউ চলে যাব ভাবছি। এখানে একদম ভাল্লাগে না। অরিন্দমের কণ্ঠে পরাজয়বোধ। অসহায়তার ঘূর্ণিপাকে বুঁদ হয়ে সদাসর্বদা প্রেমে পড়ে থাকতে চায় ও। একজন নারীকে ছেড়ে আরেকজন নারীর কাছে পৌঁছোনো ওব্দি ও ছটফট করে, আতঙ্কের ঘোরে থাকে। থিতু হতে পারে না কোনও নারীতে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ছোটো ভাই বিয়ে করে নিয়েছে। মা চিন্তিত। ম্যানিলায় গিয়েও মালয়েশিয়ার যুবতী প্রশিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্কে পাতিয়ে ফেলেছিল।

অরিন্দমের কথা শুনে আদিত্য বলে ওঠে, আরে না-না, এখন যাবেন না। আগে লোকটাকে শনাক্ত করে দিন। কেরিয়ারের ব্যাপার। সিগারেটের বোঁটা মাটিতে ফেলে সরকারি জুতো দিয়ে মাড়ায় আদিত্য। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আবার প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি ফিরতে অসুবিধা হচ্ছিল ওদের। পাজামা-পাঞ্জাবি-লুঙ্গিতে একদল ক্লান্ত পুরুষের জটলা লক্ষ করে আদিত্যর মন্তব্য, এই মালগুলোকে দেখছেন, সব বর্ডার পেরোনো ঢাকাইয়া পাতি-নেড়ে, রাতারাতি ঢুকে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে-গাঁয়ে, সবকটা লিগি, অ্যান্টি

ইনডিয়ান এলিমেন্ট। ধমমো-শিবপুরেও জুটেছে। এগুলো আর ওই বাঙালগুলো, আমাদের পুরো পশ্চিমবঙ্গটাকে নষ্ট করে দিলে। আর ভারতবর্ষকে ডোবালো ব্রামভোনগুনো।

আদিত্য যে কতরকমের অ্যান্টিবডি খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে জানে, মনে হল অরিন্দমের। মুসলমানরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনায় কেউ-কেউ এভাবে নিজের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে হয়তো। ও বলল, কিন্তু ওরা এখানে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টও করতে আসেনি, আর তোমার কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম নথি করে কাঁদতেও আসেনি। ওরা জানে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ-লক্ষ কাঙালির কাজ ফাঁকা পড়ে আছে। সেই কাজগুলো করতেই আসছে ওরা। খাটবে-খাবেদাবে, বাচ্চা বিয়োবে, সাধ-আহ্লাদ করবে, মরে যাবে। কেন, বিহার-উড়িষ্যা থেকেও তো বছর-বছর লোক আসছে, কাজ পাচ্ছে, কাজ করছে, থেকে যাচ্ছে, নয়তো ম্যানহোলে নেমে পরিষ্কার করার কাজ কে করবে?শুধু এখানকার বাঙালিদেরই দেয়াল-জোড়া ন্যাকা-শ্লোগান প্যানপ্যানানি আর বুকনি।

আদিত্যর পছন্দ নয় এরকম যুক্তি। ঘরে-ঘরে কত বেকার ছেলেমেয়ে, দেশ রসাতলে যাচ্ছে, কেন্দ্র সরকার বঞ্চনা করছে, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, সমাজের অবক্ষয় নিয়ে বক্তব্যের রেকর্ড বাজায়। অরিন্দমকে বহুক্ষণ চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, রসিক পাসওয়ান লোকটা বুড়ো হলে কী হবে। সহজে মুখ খোলেনি, বুঝলেন। চারদিন সময় নিয়েছে ভাঙতে। বাকিগুলোকেও আমরা ধরবই।

অরিন্দম ভিন্ন খেয়ালে। ও যখন পাটনা অফিসে এইচ আর ডিতে কাজ করত, অতনু চক্রবর্তী আর সুশান্ত ঘোষ দুই জিগরি বন্ধু ছিল ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে। টাকাকড়ি পরীক্ষক, কয়েন-নোট এগজামিনার। চাকরি ফেলে রেখে, কাউকে কিছু না বলে, দুজনেই পর-পর দুম করে উধাও। বাড়ির আরাম আর স্বজনজ্ঞাতির সংস্রব ছেড়ে এভাবে কেন চলে যায় মানুষ! তারা কি কারুর বা কোনও কিছুর সোহাগ-বঞ্চিত? ওভাবে উধাও হবার সাহসকে আসলে ও ঈর্ষা করে। নয়তো আদিত্যর সঙ্গে কাল আর আজ দুটো ছুটি নষ্ট করছে কেন! পচা টাকার উপত্যকায় দিনের পর দিন কাজে হাঁপিয়ে উঠেছিল বোধয় ওরা দুজনে। এখানে যেমন রোজকার দশ কিলো-কুড়ি কিলো কয়েন ওজন করার চাকরিতে বিরক্ত হয়ে পুলিশে আদ্দেক মাইনেতে ঢুকে গেছে আদিত্য।

প্রথমে সুশান্তটা উধাও হয়ে গিসলো। দুশো একর জমি আর সাত একর ফলবাগান আর রোববারি হাট ছিল ওর দাদুর, মুঙ্গেরের পিপারিয়া গ্রামে। ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত জোতদার ব্যাজনাথ সিংকে উচ্চ আদালতে বাঁচিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল ওর উকিল-ঠাকুদ্দা। যতদিন যাদব ক্রিমিনালদের দৌরাত্ম্য ছিল পিপারিয়ায়, সুশান্তরা গোপ বলে, ফসলের বখরা আর হাটের খাজনা পেতে ওদের অসুবিধা হয়নি। বস্তা-বস্তা চাল ডাল

গম সরষে রাখা থাকত পাটনায় ওদের গর্দানিবাগের বাড়িতে। কজ্জল ধানুকের দৌরাত্ম্যে সুশান্তর বাপ জ্যাঠা কাকা পরে আর পিপারিয়া-মুখো হতে পারেনি। ধানুক, বিন্দ, ভূমিহাররা তখন একদিকে আর যাদবরা আরেক দিকে। যাদবদের নিত্যিদিন খুন করত ধানুকরা।

তারিণী মণ্ডল নামে আরেকজন নির্মম ক্রিমিনালের সাহায্যে, ওই সব জমিজমা আবার দখল করার উদ্দেশ্যে, কাউকে কিছু না বলে, কিছু টাকা জমিয়ে সুশান্ত গিসলো নওয়াগাছির কাজি-কোরাইয়ায়। ওই মণ্ডলরা এককালে হুগলি জেলার বাঙালি চাষি ছিল, থেকে গেছে দিয়ারায় গিয়ে।

আরেকজন মানুষের যা কিছু ভালো, সে সদগুণ আমার নেই, সেই দুর্বলতার খাতিরে আমি, আমরা, তাকে আক্রমণ করি, ভাবছিল অরিন্দম। প্রথমে সুশান্তকে আটকে রেখে মণ্ডলরা ওর বাবা-জ্যাঠার কাছে দশ লাখ টাকা ফিরৌতি বা ক্ষতিপুরণ চেয়েছিল। অত টাকা কোত্থেকেই বা দেবে। সুশান্তকে পছন্দ হওয়ায় তারিণী মন্ডল নিজের চোদ্দো বছরের মেয়ের সঙ্গে সুশান্তর বিয়ে দিয়ে দিলে। আর ফিরতে পারেনি সুশান্ত, হয়তো চায়ওনি ফিরতে। অপরাধীদের সঙ্গে দিনভর আর তাদের মেয়ের সঙ্গে রাতভর কাটাতে-কাটাতে অপরাধকেও ভালোবাসতে অভ্যস্ত এখন ও, সুশান্ত। বাপ জ্যাঠা কাকার বিশাল একান্নবর্তী ছিল সুশান্তদের। ওর জন্যে সব পাঁকমাটি।

লালু যাদব মুখ্যমন্ত্রী হবার পর যাদব ক্রিমিনালরা তাদের হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছে, লড়ে দখল করে নিয়েছে। অপরাধের জাতীয়করণ হয়ছে অনেক গাঁয়ে-গঞ্জে, এমনকী শহরেও। জেলাশাসককেই পিটিয়ে মেরে ফেলেছে হাজিপুরে। পিপারিয়ার দুশো একর জমি আর সাত একর ফলবাগান ফিরে পেয়েছে সুশান্ত। পাটনায়ও গিয়েছিল তারপর, নিজের বাড়িতে, গর্দানিবাগে। পারিবারিক অন্তরালকে ভাঙা, হয়ে গেছে অসম্ভব। বাংলা কথাবাত্রাও আর গড়গড় করে বলতে পারে না, গাঁইয়া হিন্দি মিশিয়ে বাংলা বলে। দূরত্ব বরং বেড়ে গেছে সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায়। ফিরে গেছে শ্বশুরের দেশে। দিয়ারা-দুপুরের উড়ন্ত রুপোলি বালিয়াড়িতে।

সুশান্তর পর উধাও হয়ে গেল অতনু। একদম বেপাত্তা। কতরকমের যে গুজব রটেছিল ওর নামে। একজন লোক যতদিন বাঁচে, তার নামে কতরকমের গল্প হয়। মরে গেলে গল্পগুলোও মরে যায়। কেউ যে বেঁচে আছে তাকে নিয়ে রটনাগুলোই তার প্রমাণ। একা থাকত অতনু। নিজেদের বাড়ি। সব ছিল। সংসার পাতলেই মিটে যেত। সাজানো বাড়ি ছেড়ে আচমকা নিরুদ্দেশ। হাওয়া। পালঙ্ক, বিছানা, হাফ-তোলা মশারি, ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপ, মিউজিক সিসটেম, বিছানায় টেপে এনরিকো কারুসোর ক্যাসেট, টিভি, ডিম-মাখন, সবজি, কোল্ড ড্রিংকস ভরা থকথকে বরফ-ঝোলা ফ্রিজ, মিক্সার-গ্রাইণ্ডার, থালা-বাসন, জামাকাপড়, বাংলা-ইংরিজি হাজারখানেক বইপত্তর, পড়ে রইল যেমনকার তেমন, যেন ফিরবে এইমাত্তর,

বাজারে গেছে। ওর প্রতিবেশি পদমদেও সিনহার বিধবা স্ত্রী দরোজায় তালা দিয়ে খবর দিয়েছিলো উদবিগ্ন বন্ধু-বান্ধদের, অতনুর অফিসকে।

কতরকম জনশ্রুতি পাক খেয়েছে অতনুকে নিয়ে। পাগল হয়ে গেছে। আত্মহত্যা করেছে। সাধু হয়ে চলে গেছে নেপালে। ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে বেঘোরে মরেছে। শেফালি বাউরি নামে এক হাফ-গেরস্তর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সংসার পেতেছে। শেষে কিনা, আশ্চর্য, অরিন্দম ওকে দেখতে পেল হাজারিবাগের ঘন জঙ্গলে। মাওবাদি কমিউনিস্ট সেন্টারের নিখোরাকি খেতমজুরের ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর গণবিবাহে। রেড বুক থেকে ইংরিজিতে মন্তর পড়ে বিয়ে দিচ্ছিল। চিনাভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা, চিনে ছাপানো রেড বুককে বিয়ে দেবার বই করে ফেলেছে! দেড়-দুশো হতদরিদ্র, ময়লা, স্নানহীন, হাফল্যাংটো গ্যাঞ্জামে বিয়ে শেষে অতনুর দিকে ভিড় ঠেলে এগোবার আগেই লোপাট হয়ে গিয়েছিল। দেখতে কি আর পায়নি অরিন্দমকে? এড়িয়ে গেল। স্রেফ উপেক্ষা করল। অদ্ভুত। অতনুর জীবনে অরিন্দমের জন্যে আর এক চিলতেও পরিসর নেই।

পাটনা অফিসের চাপরাশি রসিক পাসওয়ানই নিয়ে গিয়েছিলো ওই জঙ্গলে। পাটনা থেকে অসীম পোদ্দারের ডিজেল অ্যামবাসাডর গাড়িটা কিনে কলকাতায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অরিন্দম। অনেককে বলেছিল সঙ্গে যেতে। রসিক রাজি হল। দুজনে পালা করে চালিয়ে কোন্নোগর আসার পর রসিক পাসওয়ান বাসে করে চলে গেল হাওড়ায় ওর জেলার লোকের কাছে। আশ্চর্য, এই দেড় বছর চাকরি থেকে বেমালুম নিরুদ্দেশ ছিল রসিক। ভোটবাগানেই ধরেছে ওকে পুলিশ। ধরেছে গুণ্ডাদের দেওয়া তথ্যে। লোহার বাবরির সরকারি মান্যতাপ্রাপ্ত ক্রিমিনালদের সাহায্যে বন্দুক-টন্দুক জোগাড় করছিল। ও যে ভোটবাগানে লুকিয়ে রয়েছে, সেই চিঠিটা, অরিন্দমকে আদপে সত্যিই কে যে লিখেছিল, সে সন্দেহ আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর কি হাত আছে তাতে?

সমাজ কাউকে নিরুদ্দিষ্ট থাকতে দেবে না। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে খুঁজে বের করবেই। এবার টেনে বের করতে চায় অতনুকে। লোকচক্ষু নামের একটামাত্র চোখের এই সমাজ। জিভ তার অনেক। আদিত্য সেদিন বলছিল, লেকচার ঝাড়ছিল, যে, সমাজ যাদের সহজে খুঁজে পায় না, তারাই যতরকমের গোলমাল বাধায়। লুকোছাপা, গোপনীয়তা, প্রায়ভেসি দেখলেই তাকে উপড়ে ফেলতে হবে, হিঁচড়ে বের করতে হবে সবার সামনে। রঞ্জিত গুপ্ত, দেবী রায়, রুণু গুহনিয়োগীর দায়বদ্ধতার সেটাই ছিল চাবিকাঠি। আদিত্য সেই আদিম বুনো চাবিটা প্রায় করায়ত্ত করে ফেলেছে।

অধ্যাপকের দামি উন্নাসিকতার আদলে বলেছিল আদিত্য, এই এখন যদি রুণু স্যার গোয়েন্দা বিভাগে থাকতেন তাহলে অ্যাতো মার্ডার হত না। জানেন, গত বছর, এক হাজার আটশো আটত্রিশটা মার্ডার হয়েছিল, আর তার আগের বছর এক হাজার সাতশো পাঁচটা, যখন কিনা মেয়েদের ওপর

অত্যাচার গত বছর হয়েছিল সাত হাজার তিনশো উনআশি আর তার আগের বছর সাত হাজার তিনশো একাত্তরটা। ওই যে বললুম, ডেডিকেটেড অফিসার নেই। আগে ডিসি বিভূতি চক্রবর্তীর মতন লোক ছিল। অফিসারদের আর কত নাম করব? রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, রাজকুমার চ্যাটার্জি, নীহার চৌধুরী, রবি কর, উমাশংকর লাহিড়ি, অরুণ ব্যানার্জি, আদিত্য কর্মকার, দীপক কর, আশিস মুখার্জি, তারপর আপনার পাঁচুগোপাল মুখার্জি, বুঝলেন, এসব নাম বাঙালির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পিওর গোল্ডে। এরা না থাকলে নকশাল মিনেস ইর‍্যাডিকেট হত না পশ্চিমবঙ্গে।

তা থাকবে। অন্যমনস্ক বলে, অরিন্দমের খেয়াল হল যে, সোনার বাংলা অক্ষর সত্যিই দ্যাখেনি ও আজ ওব্দি। এবারে ছোটোভাইয়ের বউয়ের জন্মদিনে একটা ভারি সোনার গিনি গড়িয়ে দেবে। বাংলা হরফ থাকবে তাতে, 'সোনার বাংলা'। চাঁদ সদাগরের মুখ? বল্লাল সেনের মুখ? না, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ। কিন্তু কোন মুখ্যমন্ত্রী?

আজগাল তো পদ্য লিকিয়েরাও পুলিশ কমিশনার হয়ে যাচ্চে। জিভের ডগা মুড়ে জানায় আদিত্য। রুণু স্যার ঠিকই বলেছিল, পদ্য লিকে-লিকে কলকাতা পুলিশের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল তুষার তালুকদার।

তুমিও লেখো না। তুমি পারবে। ধর্ষণকে বলতে হবে নিগ্রহ বা নির্যাতন।

অরিন্দমের খোঁচাটা সূক্ষ্ম হয়ে গেল বোধহয়, মর্মার্থ বুঝতে পারল না আদিত্য। বলল, পাগল নাকি। পদ্য লেকে বলে দীপক রুদ্র আর পার্থসারথী চৌধুরী সুপারসিড হয়ে মুখ্য সচিব হতে পারল না, দেখছেন না। প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ তো পদ্য লেকে বলে প্রোমোটি আই এ এস হতে পারেনি। তারাপদ রায় অবশ্য হয়েছিল মজার-মজার পদ্য লিকতো বলে। চাকরিটা খাবেন দেকছি। পদ্য নাটক-ফাটক লিকে মন্ত্রী-টন্ত্রী হওয়া যায় বটে। কিন্তু সিরিয়াস সরকারি কাজে ওসব চলে না। আদিত্য নিজে নিজের জন্যে স্তোকবাক্যের বুজকুড়ি কেটে মাথামুণ্ডু বকে যায়।

নিজের ভাবনায় মশগুল হবার দরুন, হাওড়া স্টেশানের অখিল ভারতীয় কচকচানি অরিন্দমের চারিপাশে শ্রুতির অবুঝ পার্টিশান তোলে। যিশুকে ওভাবে ধরে একটা ড্রাই রান দিলে আদিত্য। বর্ধমানের কোন-এক ধর্মশিবপুর গ্রামের, যেখানকার মানুষ এই একুশ শতকেও মাঠে হাগতে যায়, সেখানের এই স্বাস্থ্যবান যুবক একদিন মহিলাদের সামনে-পেছনে রুল ঢুকিয়ে রাষ্ট্রের আইন সামলাবে। যাকে ইচ্ছে ধরে তার পায়ের আর হাতের নখ উপড়ে নেবে, এক-এক করে। মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে, কিল চড় ঘুষি লাঠি লাথি, মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে, যতক্ষণ না পেশি থেঁতলে লোকটা হেদিয়ে পড়ে। লোকটার ধড় সাপের লেজের মতন ছটফট না করা পর্যন্ত মুণ্ডু

জবরদাস্ত চুবিয়ে রাখবে জলে। ফেটে রক্তাক্ত অজ্ঞান না-হওয়া ওাঁদ পায়ের পাতায় অবিরাম লাঠির বাড়ি মারবে ; কড়িকাঠ থেকে উল্টো ঝুলিয়ে। যতক্ষণ না শব্দ ওঠা বন্ধ হয়, হাতের গাঁটে পায়ের গাঁটে রুল পেটাবে। চুলের মুঠি ধরে, একবার এদেয়ালে একবার ওদেয়ালে মাথা ঠুকে দেবে। শিশ্নে মারতে থাকবে ফুটরুল দিয়ে। হাত-পা বেঁধে শুইয়ে বুটজুতো পায়ে উরু মাড়াবে। সিগারেটের টুকরোর ছ্যাঁকা দেবে, মেয়েদের নরম জায়গায়। ফাঁকে-ফাঁকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করবে মা-বাপ তুলে। পালাতে বলে, জলজ্যান্ত গুলি করবে পেছন থেকে ; মরে গেলে চ্যাংদোলা করে এক-দুই-তিন বলে ফেলে দেবে হাসপাতালের আঁস্তাকুড়ে।

এসবই ব্রিটিশের কাছ থেকে কংরেসিরা পেয়ে, দিয়ে গেছে বামপন্থীদের ; তারা আবার পরের কর্তাদের দিয়ে গেছে, অম্লানমগজে। সমাজ বোধহয় কোনোকালেই বদলায় না। অধঃপতনের যাত্রাপথকেই বোধহয় প্রগতি বলে। কিন্তু যতই যাই হোক, যিশু বিশ্বাসের কথাটাই ঠিক। 'প্রান্তিক চিরকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়।'

অরিন্দম দেখল, জি আর পির চারজন কন্সটেবল তিনটে দেহাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আদিত্যকে সেলাম ঠুকলো কন্সটেবলগুলো। আদিত্য, কী রে জবাই করতে যাচ্ছিস, বলায়, একজন অম্লপিত্তকফে ভোগা কন্সটেবল চোখ টেপে, গাঁইয়াগুলা মহিলা কামরায় চাপতাসিলঅঅ।

অরিন্দমের প্রশ্নবাচক ভুরুর উদ্দেশে আদিত্য রসিক হয়ে ওঠে। ওরা ওই দেহাতিগুলোকে জি আর পি থানায় ঢুকিয়ে একটাকে বলবে জামিনদার খুঁজে আনতে। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে টপ করে তো আর পাবে না জামিনদার। থানার দরোজার সামনে, দেখগে যাও, উবু হয়ে বসে আছে হুদো-হুদো হবু জামিনদার। ছাড়ান পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে দেহাতিগুনো। কত রকমার কেস যে সারাদিন ধরছে তার ইয়ত্তা নেই। জি আর পির সঙ্গে বেশ ভালো বোঝাপড়া আছে জামিনদারদের। রেস্ত খসালেই ছাড়া পেয়ে যাবে লোকগুনো। জামিন, জামিনদার, জামিনের কাগজ সব ভুয়ো। রেস্ত পাওয়া হয়ে গেলেই ছিঁড়ে ফেলে দেবে ওসব কাগুজে প্রমাণ-টমান। অনেক দেহাতি-পার্টি তো হাতে হেভি মালকড়ি নিয়ে কলকাতায় আসে। আমাদের ওদিকের কালনার শৈলেন ঘটক জামিনদারি করে এক বছরেই সাত বিঘে দোফসলা জমি কিনে ফেলেছে। অবশ্যি উবু হয়ে বসার ওই জায়গাটুকু অনেক দাম ধরে পেতে হয়েছিল শৈলেন ঘটককে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি-অভিমুখী যাত্রী-ঠাসা লোকাল ট্রেনের চকিত-করা ভোঁ বেজে ওঠে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ঘটকালি মন্দ নয়, বলল ও, অরিন্দম।

ট্রেনটা ঘট করে শব্দ করে ছাড়তেই, আদিত্যকে ভ্যাবাচাকায় ফেলে, তাতে উঠে পড়ল অরিন্দম। টা-টা।

.

১০.

বাড়ি ফিরলেও অশান্তি। ছোটো ভাইটার বউ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে কেরানি। অ্যামবাসাডরে পাশে বসিয়ে, সুপর্ণাকে ওর অফিসে নামিয়ে, অরিন্দম চলে যায় বি-বা-দী বাগে নিজের দপ্তরে। তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে ভয় করে। ভাইয়ের অনুযোগ যে, ইচ্ছে করে গাড়ি আস্তে চালায় অরিন্দম। জ্যামহীন হরিশ মুখার্জি দিয়ে যাবার বদলে সিগনালের অজস্র ব্যারিকেড-বাধা গাড়িকন্টকিত আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ দিয়ে যায়। দুজনে বেসে প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি। চলন্ত গাড়িতে হাসাহাসি করে ভাসুর-ভাদ্দরবউ। অনেকে নিজের চোখে দেখেছে। পাড়ার বেকার ফুটপাতবাজরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে ওদের হাসির আদান-প্রদানে, ছি ছি। পাড়ার মোহোল্লা কমিটির নেত্রী অঞ্জনা হাজরার একমাত্র মেয়ে বলে খাপ খোলে না কেউ। কই, বাড়ি ফিরে তো হাসাহাসি হয় না।

কী ঘোর বিপদ অরিন্দমের। হঠাৎ কী করেই বা বলবে, এই সুপর্ণা, কাল থেকে তুই বাসে যাস। ঘড়ির ব্যাপারে পাগলামি আছে সুপর্ণার। টেবিলে-টেবিলে, প্রতিটি ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে, বিভিন্ন বাজনার গোল লম্বাটে চারকোণা ছকোণা ঘড়ি ঝুলিয়েছে। বৈঠকখানার দেয়ালে টাঙিয়েছে হরিণ-শিং বিদেশি ঘড়ি, আধঘন্টা অন্তর পাখি বেরিয়ে ডাকে। একঘন্টা অন্তর সমস্ত ঘড়িগুলো বাজতে থাকলে নিভৃত আ্লাদ হয় অরিন্দমের, বিগ বেনের স্মৃতি যেন। অবশ্য সব ঘড়িগুলোই দিনের বেলায় বাজে ; অন্ধকার হলেই তারা বোবা। সাতদিনের জন্যে অরিন্দম ওকে সাতরঙা হাতঘড়ি কিনে দিয়েছে বলেও উষ্মা।

ভাদ্রবধুর অফিসে প্রশ্নফাঁস, জাল মার্কশিট, ফেলকে পাশ করানো, নম্বর বাড়ানো কেলেংকারির দরুন সেদিন অরিন্দমের টেবিলের সামনে বসে হিঁয়াঃ হিঁয়াঃ হিঃ হিঃ হিঃ খিক খিক হিঁয়াঃ ইঁয়াঃ করে হাত-পা-মাথা নাড়িয়ে-নাচিয়ে হাসি উপহার দিয়ে গেল পাটনা অফিসের মহাত্যাঁদোড় নোটপরীক্ষক মোহন রাজবংশী, যেন ওসব নোংরামির জন্যে অরিন্দমই দায়ি। ব্যাটা তো কোনও কাজ করে না অফিসে। নোটের প্যাকেট গোনার বদলে বাঁ পাশ থেকে ডানপাশে নিয়ে সই মেরে দিত। তারপর সারাদিন কোনো অফিসারের ছেলেমেয়েকে কোথায় ভরতি করাবে, ডোনেশানের দরদস্তুর, পরীক্ষায় ভালো নকল ছেলেকে বসানো, ইনভিজিলেটারের সঙ্গে রফা, এইসব সমাজসেবা করে বেড়ায়, আর তার জন্যে কমিশন খায়।

পাটনায় থাকতে একবার প্রচ্ছন্ন টিটকিরি মেরেছিল অরিন্দম, লালু যাদব আর জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে। তার প্রতিশোধ নিয়ে গেল।

অরিন্দম ভাবছিল যে ওর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সবায়ের সমস্যা। সেই ছাত্রজীবন থেকে একের-পর-এক প্রেমাস্পদার সঙ্গে ও সম্পর্ক গড়েছে আর

তা ভেঙে গেছে। গড়া-ভাঙার মাঝখানটা ঘিরে একটা করে দূষিত গল্প ছড়ায়। বিশ্বাসযোগ্যতায় দূষণ ঘটে। শেষ গল্পটা তুলি জোয়ারদারকে নিয়ে। যারা কখনও প্রেম করেনি, তারা মনে করে প্রেমের জন্যে বুঝি মেয়েমানুষটাই সবকিছু। তা তো নয়। নেশায় যেমন নেশাটাই মুখ্য, ড্রাগটা তো গৌণ।

ম্যানিলায় একবছর ট্রেনিঙে ছিল বলে, অরিন্দমকে নিয়ে নারীসঙ্গ বিষয়ে অনুমানভিত্তিক কথা ও কাহিনি ছড়িয়েছে অফিসে। ডলার বাঁচিয়ে হংকং আর ব্যাংককের লাল-আলো এলাকার সুমসৃণ মোঙ্গল-ত্বক আদর করার উত্তেজক জিভ-ভেজা গল্প।

ছোটোভাইটাও অরিন্দমের নানা গল্পগাছায় ছোটোবেলা থেকে প্রতিপালিত। তার কাছে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠা অসম্ভব।

শ্যাওড়াফুলি লোকালে উদ্দেশ্যহীন উঠে পড়েছিল অরিন্দম। কোন্নোগরে নামল না, ছোটোকাকার শ্রাদ্ধে যাওয়া হয়নি। হিন্দমোটরে নামল না, অ্যাতো রাতে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন মেজোকাকা। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে এমন সমস্ত কেউটে গোখরো লাউডগা অজগর শঙ্খচূড় কিরাইত চিতি চন্দ্রবোড়া কানড় ময়াল বের করে-করে কামড় খেতে থাকবে যে রাতভর ঘুমোতে দেবে না। প্রতিটি কামড়ের আগে বলবে, গল্পটা হল এই ; অথচ তা গল্প নয়, তাঁর জীবনের দুঃখকষ্টের চিলতে।

লাটের পর লাট ঘামে পচা নিত্যযাত্রী উঠছে-নামছে, কোথাও না কোথাও যাবে। তীর্থযাত্রীর মতন একটা উদ্দেশ্যময় নির্ধারিত গন্তব্য তো আছে। বাড়ি, পরিবার, দিনানুদিনের যৌনতা, রুটিনবদ্ধ কর্মসূচি। খুঁটিতে টাঙানো পোশাকের ঘাম, পকেটে নিত্যযাত্রীর মাসিক টিকিট। এটাই তো সুখপ্রদ আধুনিক জীবন।

ট্রেনটার শেষ স্টেশান শ্যাওড়াফুলিতে, নেমে পড়ল অরিন্দম। মাকে টেলিফোন করে দিল, পিসিমার বাড়ি যাচ্ছে, পরশু অফিস হয়ে ফিরবে।

অন্ধকারের অন্ধিসন্ধিতে পঁকপঁক তুলে এগোয় রিকশা। খোঁদল-কানা টিমটিমে রাস্তায় বৃষ্টির আবেগ-মাখা কাদা। দুপাশের হামলে-পড়া দোকানদারিতে নোনাডাঙা রোডটা অনোন্যপায়। বৃষস্কন্ধ ট্রাক চোখ বুজে র‍্যাশান পাচার করাচ্ছে। পাঁঠার শিড়িঙে মরদেহের অবশিষ্টাংশ ঝুলে আছে একাকী উদাসীন কসায়ের চ্যাঁচারি-চিলমনের আবডালে। শহুরে বর্ষার অকাল-ছপছপে গলিতে রিকশা থামল।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যতটা চোখ মেলা যায়, থিতু হয়ে জিরোচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের সজল মেঘ।

পিসিমা যে পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন তা পৌঁছে টের পেল অরিন্দম। পিসতুতো ছয় ভাই, ইঁটের অর্ধেক তৈরি দাঁত-বেরোনো বাড়িতে ঢুকে দেখল

ও, আলাদা-আলাদা মিনি সংসার বানিয়ে ফেলেছে যে-যার ছাদ-পেটানো নানান মাপের খুপরি-ঘর ফ্ল্যাটে। আজকে বড়ো বউদির জন্মের সুবর্ণজয়ন্তীতে, ওদের একত্রে মদ খেতে বসার দরুন, স্কচ হুইস্কির ভরাযৌবন বোতলদুটো পিসিমা-পিসেমশায়ের উপস্থিতির কাজ করল। নয়তো অরিন্দম ঠিক কোন ভায়ের অতিথি, সে সমস্যা এক অপ্রস্তুত ঝামেলায় ফেলে দিত এই বাদলা রাত্তিরে। দুই বোন আর তাদের স্বামীসন্ততিও হাজির।

গ্রামীণ প্রকৃতি-পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিটি পরিবার নিজের বাড়ির মধ্যেই মেলা বসাচ্ছে এ-যুগে। পাঁঠাবলির বিকল্প ব্রয়লার। নাগরদোলা আর ফকির-বাউলের বদলে ভিসিপি-ভিসিআর এনে বা কমপিউটারে হিন্দি সিনেমার জগঝম্প। একান্নবর্তী এ-যুগে একবোতলবর্তী। হয়তো একসঙ্গে বসে ইনটারনেটের ট্রিপল এক্স পানু।

সত্যিকারের বাউল-ফকিররা বোধহয় আর টিকবে না বেশিদিন। লালন থাকবে ইশকুল-কলেজের পুঁথিপত্তরে, সীমান্তের ওই পারে থাকবে হাছন রাজা, বিদ্যায়তনিক রমরমায়। টিভি আর নাটক-মাচানে থাকবে পূর্ণদাস বাউল।

অফিসের কাজে একবার মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল অরিন্দম। তাঁতিদের কীভাবে সাহায্য করা যায় যাতে মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়ি কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর শাড়ির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারে তা খতিয়ে দেখতে ধরমপুর, কুমিরদহ, ছয়ঘড়ি, নতুন হাসানপুর, দুর্লভপুর, গুধিয়া, হাসানপুর, হরিহরপাড়া, বাগড়ি, আলিনগর অঞ্চলে ঘোরাঘুরির সময় ফকির-বাউলের হেনস্তার অভিযোগ পেয়েছিল অরিন্দম।

বোঝলেন বাবু, আমরা নাকি কাফের, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদা করি না বলে আমরা নাকি আল্লার বান্দা নই, আমাদের গানবাজনা নাকি হারাম, রোজা রাখি না বলে ইন্তেকালের পর জান্নাতে আমাদের জায়গা নেই। বলেছিল সিরাজ ফকির। আড়াই হাজার ট্যাকা দিতে হয়েচে গান করি বলে। কংরেস সিপিয়েম ফরোড ব্লক তৃণমূল কেউ বাঁচাতে আসলেনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ হলে কী হবে, পাকিসতানি জামাত আছে সেখানে লুক্যে। কুষ্টিয়া রাজশাহি পাবনা থিক্যা আসসা বুল্যে যায় ফকির যেন কাফেরের মতন দোল না খ্যাল্যে, যেন নুন না খায় কাফেরের ভোজে। পরামাণিক ঘরামি কলু মোহন্ত মাঝি পদবি বাদ না দিল্যা তার ঘর্যে সাদি-নিকা বন্ধ করা হব্যে। বিয়া আকিকা ইদ বকরিদে লালনের গান গাইবা না। কাজেম মোহন্তর মেয়্যের সোহরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আর তার আবার বিয়া কাফেরদের মতন দিল্যা, তাই লবণচল বন্ধ। রইসুদ্দি ফকির, একবাল হোসেন, কাজেমালি দোতারা নিয়্যা নেচেছিল। তেনাদের হুমকি দিয়্যা গেছে পূববাংলা মানে ওপারের তবলিগ। কিসের রাষ্ট্র যে ওপারের লোক এসে হুমকি দিয়ে যায়, অ্যাঁ, বলেন । পাসপোর্ট-ভিসা লাগ্যে নাই তবলিগঅলাদের।

আমরা আল্লার বান্দা না পাকিস্তানের বান্দা বল্যেন আপনে। জানতে চেয়েছিল ফজলু ফকির।

এমন অবস্হায় বালুচরি শাড়িকে ঢাকার বাজারে আর প্রবাসী ধনী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় করা শক্ত। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধবগঞ্জে মহাজন আর তাঁতিরা গোঁ ধরে আছে যে হিন্দু মোটিফ পালটাবে না। মুর্শিদাবাদি তাঁতিকে বালুচরি বোনা শিখতে হলে প্রথমে মাধবগঞ্জের মোটিফ শিখতে হবে। চাঁদ তারা উট তাঁবু খেজুরগাছ মিনার এসবের নকশা জ্যাকার্ডে তুলে যে সরকারি কম্পিউটারবিদ বিষ্ণুপুরে প্রচার করতে গিসলো তাকে তাঁতিরা আর মহাজনরা প্রচণ্ড মার দিয়েছিল।

অরিন্দমের মনে হয়েছে এ তো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত এক দুর্বোধ্য সমাজ, এর জট পাকাতে-পাকাতে দড়ির মুখ খোঁজাকে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলেছে। অথচ মুর্শিদাবাদের বালুচর গ্রামেই জন্মেছিল বালুচরি।

হতভম্ব অরিন্দম বলেছিল, কিন্তু জেলা সদরে যে শুনলুম বাউল ফকির সংঘের সভাপতি শক্তিনাথ ঝা, তারপর কলকাতার সব গণ্যমান্য লোকেরা, মহাশ্বেতা দেবী, আবুল বাশার, প্রকাশ কর্মকার, মনোজ মিত্র, আজিজুল হক, কবির সুমন, সুজাত ভদ্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওনারা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে দরবার করেছেন।

সিরাজ ফকির : ওই কলকাতায় গান-গপপো-থেটার করেন, তেনারা?

অরিন্দম : হ্যাঁ হ্যাঁ।

সিরাজ ফকির : তা তেনারা থাকে কলকাতায় আর নাসিরুদ্দি ছায়েব ভোটে জেতে হেথায়।

অরিন্দম : ওহ।

সিরাজ ফকির : খেতে জল দিচ্ছিল জব্বার ফকির। ওর পাম্প তুলে নে গিয়ে রেখে দিলে পঞ্চায়েতের ছইফুদ্দি সরকারের বাড়ি। যে-ই জব্বারের জন্যে তদবির করেছে সে-ই জরিমানা দিয়েছে। তুঁত খেত আর পলু চাষ লাটে উটেচে গো। আর আপনে এসেচে মুরশিদাবাদি শাড়ি বাঁচাতে।

অরিন্দম দেখেছে, বাহকরাও বলেছে, মহাকরণে মন্ত্রী আর সচিবরাও জানে, চিন আর কোরিয়ার উন্নতমানের রেশমসুতো চোরাপথে আসছে মালদা মুর্শিদাবাদ নদিয়া বাঁকুড়ায়।

আহা, করে খাচ্চে গরিব মুটেরা। বড্ডো দুঃখুগো কুষ্টিয়া কোটচাঁদপুর কুমিল্লায়। বিদেশি সাম্যবাদী দেশের সরকার তাই স্মাগলিঙে নিয়োজিত। বাঁকুড়ায় দেখেছিল অরিন্দম, তাঁতি আর মহাজনের আড়ংধোলাই-খাওয়া কম্পিউটারবিদ দেখিয়েছিল, বালুচরি শাড়ির মফসসলি দিকটা এদেশি রেশম, আর শাড়িটার সদর পিঠে কোরিয়ার সিল্ক।

এখানের রেশমচাষিরা পড়ে-পড়ে মার খাচ্চে। দিনকতক পর দাড়িদঙ্কা হয়ে মরবে। আমাদের কিছু করার নেই স্যার। আমরা স্মঅঅঅঅল ফ্রাই। হ্যান্ডলুম অফিসার, নস্যি-নাকি হুতাশ জানিয়েছিল, অনুকুলচন্দ্র বসাক। আর তুঁত-চাষি হাজি ইসরাইল বলেছিল, পাশের মালদা জেলায় অবস্হা আরও খারাপ। আমরা লাভজনক দাম পাই না। ভালো জাতের ডিমও পাই না আজ্ঞে। কাজের সময়ে বিদ্যুৎ থাকে না। সেচের জল বাড়ন্ত। সারের দাম বেড়েই চলেছে। আমাদের কতা কেউ ভাবে না। আমাদের দেখার কেউ নেই। এই আপনারা কলকাতা থেকে আসেন, লিখে নিয়ে চলে যান। বিহিত হয় না। এই অ্যাতোক্ষুণ আপনার সঙ্গে কতা বলে কত সময় নষ্ট করলুম। আজকে হাটবার ছিল। আগে আমরা বছরে চারবার পলুপোকা পুষতুম। এখুন একবার পোষা দায়।

আছেরুদ্দি মহাজন, দাড়িপাকা, গোঁফকামানো, বললে, বাঁ পা চেয়ারের হাতলে তুলে, পায়জামা নামিয়ে হাঁটু চুলকোতে-চুলকোতে, সরকার তো পাওয়ারলুম বসাতে দিতে চায় না, যাও বা রেশমসুতো হয়, তার বেশিটা নিয়ে চলে যাচ্ছে ভাগলপুর বেনারস মোবারকপুরের ফড়ে। অঙ্গুলিহেলন জানেন তো? আপনাদের কলকাতার বড়োবাজার সুতোর দাম বেঁধে দিচ্ছে ষড় করে। অঙ্গুলিহেলন-কমরেডদের সঙ্গে ষড় করে। সঅঅঅঅব সমস্যা কলকাতার তৈরি। মুর্শিদাবাদি রেশমশাড়ির দিনকার ফুরুল। জানি না তৃণমূল কিছু করবে কিনা।

১১-১৫

১১.

কী হল অরিন্দমদা, শ্যাওড়াফুলি ইসটিশান থেকে হেঁটে এলে নাকি গো, অমন হাঁপ ছাড়চ? জিভে জড়ানো উত্তর আগে জানিয়ে তার প্রশ্নটা পরে বলে সবচে ছোটো পিসতুতো ভাই পল্টু, থলথলে তাঁমাটে, খালি গায়ে নেয়াপাতি ভুঁড়ির ওপর পৈতে, ডানবাহুতে রুপোর চেনে তাঁমার ডুগডুগি-মাদুলি, মুখের মধ্যে ভেটকি বৃদ্ধের লাশের ঝালঝাল টুকরো। সামনে কাঁচের গেলাসে মদের আদরে বিগলিত-চিত্ত বরফ-টুকরো। বলল, সময় লাগল বলতে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ক্লাস টু ফাইভ এইট, ওঃ, কত যে ধকল গেল, নাঃ, বুঝবে না তুমি ; আগে বিয়ে করো, ছেলেপুলে হোক। মাদুলির চেন বাজিয়ে এক চুমুকে শেষ করে।দাঁতে বরফ ভাঙার কড়মড়।

পল্টুর বউটাই কেবল হাঁটুমুড়ে টিভিতে নাক ঠেকিয়ে হিন্দি মারপিটে উৎকর্ণ। ছাপাশাড়ি, এলোখোঁপা, ছোট্ট কপালে মেরুন টিপ, পায়ের কাছে ফাঁকা গেলাস। বাদবাকি ননদ ভাজ ভাসুর ননদাই মদের পলু থেকে কথার মাকড়সার ঘরকুনো জাল বুনছে। গোল হয়ে সবাই। সামনে একাধিক কাঁসার থালায় আস্ত পারসে ভাজা, আরামবাগি মুরগি-ঠ্যাঙের সুস্বাদু পাহাড়, হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার ভুষিমাল, দুফাঁক ডিমসেদ্ধ, মাছের ডিমের বড়া, শশা পেঁয়াজ গাজর।ভাইরা, জামাইরা, সবাই খালিগা, কারুর চেহারাই ব্যায়াম করা পেশল নয়, মোদো থলথলে। পায়জামার ওপর একটা করে বিশাল তাঁমাটে কুমড়ো। বউরা, বোনরা মোটার ধাতে এগুচ্ছে। বোধহয় মাঝে-মাঝেই হুইস্কির ক্যালরিতে তনু ভেজে।

শতরঞ্চিতে বসে মাছের ডিমের একটা বড়া মুখে পুরে অরিন্দম যখন চিবিয়ে অবাক ওর মধ্যেকার কাজু কিসমিস রসুনকোয়া সাদা-তিলের উপস্থিতিতে, বড়ো বউদি, যার আজকে জন্মদিন, চেঁচিয়ে হুকুম জারি করে, এই অরিকেও একটা গেলাস দাও, দাও,দাও,দাও, কতদিন পরে আমাদের বাড়ি এল, তাও আবার রাত্তিবেলা।

অরিন্দম স্পষ্টত বিচলিত।বলল, আরে না-না, আমি এসব খাই না, ককখুনো খাইনি ; সিগারেট ওব্দি খাই না।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বড়ো বউদি, এমেবিয়েড, হাতে টলমলে গেলাস, ফরসা ভারিক্কি গতরকে একত্রিত করে পাছ-ঘেঁষটে উঠে বসে, আর বাঁহাতে অরিন্দমের গলা আঁকড়ে নিজের কানা-ভরা গেলাস দাঁতেদাঁত অরিন্দমের ঠোঁটের ওপর উল্টে দিলে। খাবিনে মানে? তোর গুষ্টি খাবে, জানিস আজ আমার জন্মের সুবর্ণজয়ন্তী।বিশাল বুকের খাঁজের মাঝে অরিন্দমের মাথা ঠাসা।

তোমার বুকে চেতল মাছের গন্ধ, বলতে, বড়ো বউদি চাপা গলায়, মাছটা কুরে রেখেছিলুম রে, হয়ে উঠল না। অরিন্দমের ফাঁস আলগা হয় না। জামা ভিজে গেছে। ফাঁসের দরুন কষ্ট হচ্ছে। আবার ভালোও লাগছে। নারীর বুকটুকুর এক পৃথক মাতৃত্ব আছে মনে হয়।

অ্যাই, দামি স্কচ বলে ভাবচ ওতে চান করলে নেশা হবে? দুপাটি দাঁত ভিজছে গেলাসের হুইস্কিতে, ওয়ালরাসের হিলহিলে ঠোঁট নেড়ে বলল বড়ো জামাই।অরিন্দম, তার চেয়ে তুই বরং কিছু ভালগার জোক শোনা। গ্রামীণ বিকাশের অনুদান লোটা মাংসল জামাইয়ের কণ্ঠস্বর।

জাপটানো অবস্থাতেই বড়ো বউদির হুকুম, হ্যাঃ, তাই শোনাহ।বুজলি অরি, আমরা হলুমগে শান্ডিল্য গোত্রের মাতাল ; গোত্রের ভেতরেই শুঁড়িখানা।বিয়ের আগে তোর মতন ভারজিন কাশ্যপ গোত্র ছিলুম।নেশার কুয়াশায় ক্রমশ ঝিমোনো বউদির কণ্ঠস্বর। জাপট আলগা হলেও অরিন্দম মাথা সরায় না।পাফ দিয়ে গুঁড়ো দুধ মাখানো বুক হলে ভালো হতো।

আমি একটা বলছি। টিভি থেকে নিজেকে ছিঁড়ে আলাদা করেছে ছোটো বউ। স্বতঃপ্রণোদিত মাতাল।একবার না, অ্যাঁ, হি-হি, একজন না, অ্যাঁ, রাস্তার ধারে নর্দমায় হিসি করছিল, হি-হি।অশ্লীল নয়, অশ্লীল নয়, অ্যাঁ, নালির ধারে তোমরা যেমন হিসি করো। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের বোতাম লাগায়, অ্যাঁ, তখন জিপ ছিল না, বোতাম ছিল, বোতাম লাগিয়ে, অ্যাঁ, টের পেল ওর ঘাড় বেঁকে গেছে, হি-হি, একদম সোজা হচ্ছে না।ডাক্তারের কাছে গেলো, ওষুদ খেলো, মালিশ লাগাল, ইনজেকশান নিলে, অ্যাঁ, হি-হি, কিন্ত কিছুতেই কিছু হল না, ঘাড় সোজা হল না।মহাবিপদ।কী করে বেচারা।বেঁকা ঘাড় নিয়েই কাঁচুমাচু মুখে বাড়ি গেল, বউকে বলল।বউ বললে, তা এই কতা, দাঁড়াও এক সেকেণ্ডে ঘাড় সোজা করে দিচ্চি।বলে, হি-হি, প্যান্টের বোতাম খুলে দিতেই ঘাড় সোজা হয়ে গেল। উউউউফ। লোকটা কোটের বোতাম প্যান্টের বোতামঘরে লাগিয়ে নিয়েছিল।

সবাই, মাতাল ভাজ ননদ ননদাই ভাসুর হাসবে বলে উদগ্রীব করে তুলেছিল নিজেদের, কিন্তু নিরুৎসাহিত হল।অরিন্দমের হাসি পেয়েছিল, ছোটোবউ তার স্বামীকে তির্যক আক্রমণটি করল অনুমান করে।কিন্তু হাসার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে টের পেল, বড়ো বউদি আবার জাপটকে আঁট করে ফেলেছে ; হয়তো নিজের চেয়ে বেশ ছোটো একজন যুবকের গ্রন্থিসুগন্ধের মাদকতা মদের সঙ্গে মিশে জরুরি আহ্লাদ এনে দিচ্ছে।অবহেলিত নারীর মাতৃত্বের গোপন যৌনতা।

নোংরা চুটকি না হলে কেউ হাসবে না রে, সেজো বউদির বিজ্ঞ মন্তব্য।নোংরা মানে সেক্স!

ছোটো জামাই তলানিটা চুমুক মারে।আঁচ্ছা আমারটা শোনো।তেমন নোংরা নয় যদিও। ওই সেক্স-টেক্স নিয়ে নয়।আমাদের রাজনীতিকদের নিয়ে।সো-সো।একজন মাঝারি নেতা, ভাষণ শেষ করে যখুন চেঁচিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল, ওমনি কোঁৎ করে নকল দাঁতের পাটি গিলে ফেলেছে। এক্সরে হল, সোনোগ্রাফি হল, গু পরীক্ষা হল, নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেস্ট হল, দাঁতের পাটি-জোড়ার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।একদোম যেন উবে গেচে।কলকাতায় কিছু হল না বলে ভেলোর, অ্যাপোলো, রামমনোহর লোহিয়া, হিন্দুজা, যশলোক, এ আই এম এস কত জায়গায় দেখালে, ব্রেন স্ক্যান হল, রাজনীতিক তো, হয়তো ব্রেনে চলে গিয়ে থাকবে দাঁত-জোড়া, এই ভেবে।দাঁত পাওয়া

গেল না। শেষে বিদেশে নেতাদের একটা দল যাচ্ছিল মৌমাছির চাষ কী ভাবে করে দেখার জন্যে, তা একে-তাকে, মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতিকে ধরে প্রতিনিধি হয়ে ঢুকে গেল তাতে। উদ্দেশ্য হুসটনে গিয়ে রাষ্ট্রের খরচে ডাক্তার দেখাবে। দলটা আমেরিকায় পৌঁছোল। নানান পরীক্ষার পর যখুন ল্যাংটো উপুড় করে বডি চেক করছে, ডাক্তার অবাক। বললে, ইন্ডিয়ার রোপট্রিক শুনেছি বটে, কিন্তু এরকুম হাসিমুখ গুহ্যদ্বার এর আগে দেখিনি। ইন্ডিয়ার সব পলিটিশিয়ানদেরই কি এরকুম হাসি? কয়েক মুহূর্ত থেমে ছোটো জামাই বললে, হয়েছে কী, দুপাটি দাঁত ওইখানে, পোঁদে গিয়ে আটকে গিয়েছিল।

সমবেত হোঃ হোঃ হয় বটে, তবে অভিপ্রেত অট্টহাস্য হয় না। অরিন্দম হাসতে পারে না। বড়ো বউদির ঢাউস বুকের মাঝে মাথা আটক। হাঁসতে গেলে যদি আটক আলগা হয়ে যায়, তাই। সেজো বউদির মন্তব্য, নিজেকে ছাড়াচ্চিস না যে বড়ো? মজা নিচ্ছিস, বুঝেছি, আমরা কি ফ্যালনা!

অরিন্দম নিশ্চুপ, নিরাবেগ, নিরুত্তেজ।

আঁচ্ছা, আমি একটা আসল অশ্লীল নোংরা অবসিন জোক বলছি। বড়ো জামায়ের প্রস্তাব সমর্থিত হবার মুহূর্তে অরিন্দম আঁৎকায়, জোকের জন্যে নয়, মহিলাদের সামনে অমন জোক শোনার অভিজ্ঞতা ওর নেই। না না না না, আমি তাহলে উঠে পড়ব, ধ্যাৎ।

অরিন্দমের গলা আঁকড়ে রেখেই বড়ো বউদি, কেনওওওরে? এখনও বে-থা করিসনি বলে? কবে আর করবি? আমার কাচে অনেক ছাত্রী-পাত্রী আচে। ফিগার-চটকে ভালো চাস? না পড়াশুনোয়? বলিস তো দেকি কচিমতন। পার্টির মেয়েদের চাস তো আমার কাছে সপিয়েম, কংরেস, বিজেপি, তৃণমূল সব রকমের মেয়ে আছে, তুই একবার রাজি হলেই সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবো তাদের। যতোই রাজনীতি করুক, বাপেরা জানে যে সোমথথ মেয়েকে একদিন পাত্রস্থ করতেই হবে।

মেজো বউদি : তোর সেই মাইকাটা শুদদুর প্রেমিকাটার কী হল রে? আমাদের এদিকেও সব খবরাখবর আসে। খুব ঝুলোঝুলি করেছিলি নাকি বে করার জন্যে। তা কেঁচে গেল কেন?

বড়ো জামাই : অশ্লীল অঙ্গ দুটো নেই বলে।

সমবেত মহিলা আর পুরুষের অট্টহাস্যের দমবন্ধ দমকা বোমাটা এবার ফাটে। হেসেই সামলে নেয় সবাই, ভাই বোন ভাজ ভাসুর ভাদ্দরবউ দেওর জামাই ননদ শালা ননদাই। চোখাচুখিতে ঝটিতি ইশারা বদল হয়। সবাই জানে, পাটনায় থাকতে অরিন্দম ওর চেয়ে বিশি বয়সের বিবাহিতা প্রতিবেশিনীর কিছুটা-খোলা হৃদয়ের গবাক্ষের নরম মাংসে করাঘাতের সাঁঝবিহান সম্পর্ক গড়ে তুলতে-তুলতে পাগল হয়ে চিকিৎসাধীন ছিল। পাড়াতুতো দিদিটার বর টাকা জমাবার ধান্দায় নিত্যিদিন ট্যুরে।

কলকাতায় এসে ক্যানসারে এক-স্তন তুলি জোয়ারদারকে বিয়ে করার প্রস্তাবে, অরিন্দমের মায়ের, কিন্তু-কিন্তু বলতে যা বোঝায়, সে দুশ্চিন্তা ছিল। ছেলেটার আবার মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে আধখ্যাঁচড়া মেয়ের পাল্লায়। তবু, অন্য কাউকে না করলে ওকেই করুক, কাউকে করুক, স্থির হোক জীবন। তুলি এগিয়ে এসে পিছিয়ে গিয়েছে,

কেননা মৃত্যুর আহ্বান বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, উচিত সময়ে লজ্জাবশত চিকিৎসা না করাবার দরুণ। ছোটো ছেলে বিয়ে করে নিয়েছে বলে বড়ো ভায়ের মা এখন যাহোক একটা বউ চায়।এজাত বেজাত কালো ধলা কানা খোঁড়া মুখু বিধবা বর-পালানো বাচ্চাসুদ্দু যাকেই চাস আমি বাড়ির বউ করে আনব, গত দশ বছরে মা ওকে একা পেলেই বলেছে। কয়েকজন ঘটককেও বলে রেখেছে মা, যোটক-ফোটক কিচ্ছু চাই না, এককাপড়ে হলেও চলবে। ঘটকরা প্রতিদিন একজন-দুজন বিবাহযোগ্যাকে এনে ছুতোনাতায় বসিয়ে দিয়েছে ওর চেয়ারের সামনে, অফিসে এনে। ওফ, কী কেলেংকারি। চলকে ওঠার মতন নয়কো তারা কেউ। মেয়েগুলোরও অমন ডেসপারেট অবস্থা? অপমান সহ্য করেও একটি মেয়ের একজন স্বামী চাই। মেজোবউদি এক্ষুনি প্রতিশোধ নিল এগারো বছর আগে ওনার ছোটো বোনকে প্রশ্রয় দেয়নি বলে।

আবার মেজবউদির খচানে উক্তি : মেয়েটা কোন জাতের রে? কুলিকামিন? নাকি?

বড়দা সর্বাধিক চুর।বুড়ো আঙুলে সুতো-ছেঁড়া পৈতে জড়িয়ে তরলীকরণের সরলীকরণ করে। এতঃ ন শুদ্রং ব্রাহ্মণাদি জাতি বিশেষং ভবতি সিদ্ধং, সর্বে লোকা একজাতি নিবদ্ধাশ্চ সহজ মেবিতি ভবঃ।

মোনতোর-টোনতোর নিয়েচেন নাকি বড়দা? আমাকে জানাতেন যদি তো আমিও নিতুম।বড্ডো অশান্ত থাকে মনটা।কার মোনতোর? অনুকুল ঠাকুর না রামঠাকুর? অ্যাঁ? নাকি বাবা লোকনাথ? বালক ব্রহ্মচারীর জপ শুনিচি বেশ কাজে দ্যায়।বড়ো জামায়ের কণ্ঠে অকৃত্রিম আপশোশ।

সেজো বউদি : আরে বামুনরা আবার মোনতোর নেয় নাকি? ওসব কায়েত সুদদুরদের ব্যাপার। বামুনদের তো গায়িৎরি মনতোর আচেই। তাই-ই জপ করুন না দুবেলা মন দিয়ে।

বড়ো জামাই : অঅঅঅঅ।

অরিন্দম ভাবছিল, জোয়ারদার কোনো জাত হয়? কেটলিউলি কোন জাত? জাতিপ্রথার জন্মের সময়ে তো চা খাবার ব্যাপার ছিল না।দেখতে কেমন? নাম কী? কোথায় থাকে? একদিন গেলে হয় মহাকরণে। কিন্তু সেখানে তো অনেক কেটলিউলি আছে। চিনতে পারবে নিশ্চই ও।চলকে ওঠা থেকে ঠিক টের পেয়ে যাবে।

প্রধানশিক্ষিকা নিজের পুরো সুরাসক্ত ওজন ঢেলে রেখেছিল অরিন্দমের ওপর।

বড়দি, তোমার ব্লাউজের বোতাম খুলে অরির ঘাড়টা এবার সোজা হতে দাও। মেজোবউদির কথায় অরিন্দম ছাড়া পায়।

আগে লোকে সমাজের চাপে বাড়ির বাইরে মদ খেত।এখন সমাজের ভয়ে বাড়ির মধ্যে বাড়িসুদ্দু সবাই খায়।তার কারণ আগে সমাজ বলতে যা বোঝাত তা আর নেই।সবাই সবাইকে ভয় পায় আজকাল।অন্যে কী করছে-করবে সবাই আঁচ করে টের পায়।কেউ বিশ্বাস করে না অথচ গালভরা কথা বলে। আমরা সবাই মিথ্যাগ্রস্ত মাতাল। বাঙালি মধ্যবিত্তের এ এক অদ্ভুত যাযাবর হামাগুড়ি।কোনো বিশেষ তীর্থ নেই।কত গোঁড়া ছিল এই বাড়িটা, পিসিমা-পিসেমশায় বেঁচে থাকতে। মুরগির মাংস তো নিষিদ্ধ ছিলই,

মুরগির ডিমেরও বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল না। খেতে বসে গণ্ডুষ না করা অপরাধ ছিল।

পিসেমশায়ের বাস্তুভিটে ছিল হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের ফুলতলা গ্রামে। সেসব ছেড়েছুড়ে বেচেবুচে এখন শ্যাওড়াফুলিতে।এই বাড়িটায় অরিন্দম যখন শেষ এসেছিল, টালির চালের দুটো মাত্র ঘর ছিল, সামনে-পেছনে ফুলের উচ্ছৃঙ্খল জঙ্গল।বলাগড়ের কাঁচাগোল্লা খেয়েছিল, মনে আছে।পিসেমশায় টাকমাথা, মোটা কাঁচের ভারিক্কি চশমা।

ফুলতলার বসতবাড়ি, ভাগচাষ দেওয়া জমিজিরেত, সব ভেঙে-ভেঙে বিস্কুটের টুকরোর মতন তারিয়ে খেয়ে ফেলেছে গঙ্গা। কলকারখানার ফেনানো পাঁক আর পূণ্যার্থীর গু-মুত, গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে, বাঁকবদল ঘটেছিল নদীর।

মাঝরাতে, চাঁদনি আলোর অগোচরে, কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে, গ্রামবাসীদের চোখের সামনে, ডাঙাজমিন, ভরাখেত, কুরেকুরে শেষ করেছে নদীটা। অরিন্দম গিয়েছিল স্কুলে পড়ার সময়। গঙ্গা বয়ে গেছে জিরাট, শ্রীপুর-বলাগড়, চরকৃষ্ণবাটি, গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, খামারগাছি আর ডুমুরদহ-নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর দিয়ে।

সুলতাপুর, গুপ্তিপাড়া, রিফিউজিবাজার, ভরপাড়া, বেনালি, চররামপুর, গোঁসাইডাঙা, রসুলপুর, সুন্দরপুর, চাঁদরা, ভবানীপুর, চরখয়রামারি, রুবেশপুর, রামনগর গ্রামগুলোর অনেক ঘরদালান, রাস্তাঘাট, দেউড়িদেউল, দোকানবাজার, ইশকুল, শিবের থান, মেটে মসজিদ, ফকিরের কবর, রঙেশ্বরীর একচুড়ো গর্ভগৃহ, তিনফসলি জমি, সব সঅঅঅঅব, গিলেছে গঙ্গা।

ইঁট আর শালবল্লা পুঁতে থামানো যায়নি নদীটার বেয়াড়াপনা।সেসব ইঁট-কাঠ নিজেদের বসতকে অহেতুক ঠেকনো দিতে যে যার তুলে নিয়ে গেছে। কারোর চেষ্টাই টেকেনি বেশিদিন। বাঁধাগাছি আর পালপাড়ার বামুনরা শ্যাওড়াফুলিতে চলে যাচ্ছে খবর পেয়ে পিসেমশায়ও কিনেছিল চারকাঠা জমি।ছেলেরা নিজেদের অবস্থামতন খুপরি তুলেছে।

এই ঘরটা সর্বজনীন।

ফুলতলায় থাকতে আলতাপাতার ব্যবসা ছিল পিসেমশায়ের।ওনার বাবার আরম্ভ করা ব্যবসা।অনেক ঘর রংবেনে মণিবণিক ছিল তল্লাটে।লাক্ষা গালা আলতার কাজ করত। রাসায়নিক আলতা বেরোবার পর দুবেলা দুমুঠোর ওপর চোট সামলাতে রংবণিকরা স্যাকরার কাজ ধরে একে-একে চলে গেল সুরাট, মুম্বাই, বাঙ্গালোর, কিংবা ঘড়িকোম্পানির জহুরি হয়ে গেল।

পিসেমশায় রংবেনেদের কুলদেবতা রঙেশ্বরীদেবীর পার্টটাইম সেবাইত হয়ে চালিয়েছিল কিছুদিন। আজকে দেয়ালের খুঁতখুঁতে টিউবলাইটের তলায় ফ্যাকাসে রঙেশ্বরীদেবীর উদাসীন দৃষ্টিবলয়ে বসে নোংরা-নোংরা মোদো চুটকি চলছে।

তোমরা কেউ আলতা পরো না? বলে ফেলেছিল অরিন্দম।

অ্যাই ছুটকি, তোর কাছে আলতা আছে তো? নিয়ায়, নিয়ায়, শিগগিরি আন দিকিনি। ফ্লোর লিডার মেজবউদির গম্ভীর অনুচ্চস্বর আদেশে দ্রুত উঠে দাঁড়ায় ছোটো বউ, এক রাশ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।অত চুল দেখে হঠাৎ ভয় করে ওঠে অরিন্দমের। অবাক হয় নিজেই। আজগে অরি আমাদের সবাইকে আলতা পরাবে। মেজবউদির দ্বিতীয় আদেশে ধাতস্হ হয়।

ছুটকি দেয়াল, দরোজার কপাট, জানলার গ্রিল, বাকসোর থাক ধরে-ধরে নিজেকে সামলে ঘর থেকে বেরোয়, আর ফিরে আসে বাঁ হাতে আলতার শিশি, তুলোকাঠি আর ছোট্ট কাঁসার বাটি নিয়ে। যেভাবে গিয়েছিল সেভাবেই মাতাল দেহবল্লরীকে সামাল দিয়ে।অরিন্দমের পাশে বসে।শাড়ি সামান্য তুলে পা বাড়িয়ে নিভৃত আবদার, আগে আমাকে পরাও।আলতাটা আমার বিয়ের, ক'বছর যাবত পড়ে আছে।সময়ই হয় না। প্রফেসারির ঝকমারি, একটা তো মোটে রোব্বার, শাড়ি কেচে ইসতিরি করতেই সময় চলে যায়।

ছুটকির বাঁ পা কোলের ওপর তুলে নিয়েছে অরিন্দম। প্রায় নিঃশব্দে বউটি বলে, তাড়াহুড়ো কোরো না, রয়ে-সয়ে সময় নিয়ে ভালো করে পরাও।অরিন্দম গলা নাবিয়ে বলল, তাহলে নেলকাটার আনো, নখ অনেক বেড়ে গেছে।নখ পালিশ লাগাও না বুঝি? ছুটকি ঝটিতি উঠে দাঁড়াতে, মদ টলমল করে ওঠে ওর দেহ জুড়ে, বাতাসের ওপর দিয়ে হেঁটে নেলকাটার আর নখপালিশ আনে।কোলের ওপর পা তুলে নিয়ে অরিন্দম টের পায়, পা ধুয়ে মুছে এসেছে, আগের চে ঠাণ্ডা।

মেয়েদের পা অপরিমেয় শ্রদ্ধার। তোমার পায়ে ছন্দ লেগে আছে। নখকাটার কুটকাট শব্দের চে আস্তে বলল অরিন্দম।

ছন্দ? কী ছন্দ?

অরিন্দম বিপাকে পড়ে। উচ্চমাধ্যমিকে বাংলা ভাষাটা মন দিয়ে পড়েনি। দ্রুত মনে করার চেষ্টা করেবলল, মুক্তক।

যাঃ।ও তো বাংলা।

হলেই বা।এই তো গোড়ালিতে তিল হয়ে লেগে রয়েছে অনুষ্টুপ।

আবার সেই।না না।আমার পায়ে আছে আয়ামবাস, এই দ্যাখো, ট্রোকি।

ওওওওওহ।ইংরেজি।ইংরেজি পড়াও।

হ্যাঁ।ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলুম।ব্লেকের ম্যারেজ অব হেভেন অ্যান্ড হেল মুখস্ত।বলো তো এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড শোনাতে পারি, আমাদের লাইফ তো ওয়েস্ট ল্যাণ্ড।

বুঝেছি।অমন বিয়েই করেছ।এখন তো আর কিছু করার নেই।

কে বললে? সাহস থাকলে ভাসুরের কোলে পা তুলে সবায়ের সামনে বসা যায়।সাহস থাকলে, মরনিং আফটার ওষুধের জোরে, অনেক কিছু করা যায়।কটা বউ পারে? তুমি

তৈরি তো? আমি তৈরি, ফেলে পালিও না, আমি কাউকে ভয় পাই না, ছাত্রদের সঙ্গেও প্রেম করি।ছাত্ররা আমার গাড়ির বনেটে লিখে রাখে 'আই লাভ ইউ'।

এখন তুমি মাতাল।মাতাল গৃহবধু।কী বলছ, না বলছ, তার হুঁশ নেই।

মাতাল? ঠিকাছে, আমি না হয় মাতাল।তোমার তো হুঁশ আছে।মুক্তক আর অনুষ্টুপ ছন্দে ঠোঁট রাখতে পারো? ছন্দ তো শুধু চরণেই থাকে না।থাকে সবখানে।ভালো করে চোখ মেলে দ্যাখো।বউটি ঠোঁট এগিয়ে দিলে ভয় করে ওঠে অরিন্দমের।

বড়োবউদি কাৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ওদের দিকে পাশ ফেরে। তোদের গুজগুজ ফিসফিস সঅঅঅব শুনতে পাচ্ছি আমি।অরিকে চেনো না।চুপচাপ জাল বিছিয়ে দেবে, টেরটি পাবে না।ভয়ংকর চিজ।অ্যাগবারে কাপালিক।ছু-মন্তর এড়াতে পারবি না।মাতন লেগে যাবে।

ছুটকি বড়োবউদিকে, তুমি তো ওর জালে ছিলে এতক্ষুণ, মাইতে চেপটে ধরেছিলে ওকে। এবার আমি না হয় থাকি। কাল থেকে তো আবার জাঁতা পেষা। তারপর অরিন্দমকে, কই দেখালে না কী রকম তোমার হুঁশ। আমি একজন স্বঘোষিত আদেখলে, কাওয়ার্ড, চুমু খাবার সাহস পর্যন্ত নেই।

শব্দবধির হওয়া সত্ত্বেও, সাপ যেভাবে তার চোয়ালের মাধ্যমে জমির সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করতে পারে, অনুভব করে শিকারের উষ্ণতার সংবাদ পায়, সেই গোপন অনুভুতি নিয়ে, বেশ যত্নে, নখপালিশ লাগায় আর আলতা পরায় অরিন্দম।এত কাছ থেকে, এভাবে কোনো যুবতীর কেবল পাটুকু এর আগে খুঁটিয়ে দেখেনি অরিন্দম।মুখ নিচু, ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, ছুটকির চোরাস্রোত-চাউনি অরিন্দমের উদ্দেশে।

ফিসফিস কণ্ঠে অরিন্দম বলল, বেশ কয়েক বছর মদ খাচ্ছ তাহলে, অধ্যাপিকা?

মাথা নাড়ে ছুটকি, হ্যাঁ, এট্টুখানি, নমাসে-ছমাসে, ভাললাগে, এটারচে কোকাকোলার সঙ্গে রাম ভাল্লাগে, কিন্তু বড়ো আর সেজোর যে শুগার।স্নায়ুসুখে আপ্যায়িত দেহকে পাশ ফিরিয়ে, বাঁ পা নাবিয়ে, ডান পা অরিন্দমের কোলে তুলে দিলে ছুটকি।

তোমার জামায় মদ, প্যান্টে আলতা, বাড়ি যাবে কী করে?

এমনি করেই।আমার তো পায়ে কবকব নেই, ছন্দ নেই, লোকলজ্জার ভয় নেই।

শুধুই বকবক।পথিক তুমি পথ হারাইতে ভুলিয়া গেছ।যাও, গিয়া দেয়ালে পোস্টার সাঁটো, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করো, কিন্তু প্রেমাপ্রেমি কোরো না।

হুঁ।

রেখেছ বাঙালি করে, পুরুষ করোনি, পথিক তোমার টেসটোসটেরন নাই ।

হুঁ।

আচমকা ওপরতলা থেকে বিলিতি বাজনার তারস্বর আসে।

ওপরেও ঘর আছে বুঝি? জানতে চায় অরিন্দম, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে।আগেরবার যখন এসেছিল তখন ছিল না ওপরতলায় কোনো ঘর। ফাঁকা ছাদ ছিল। আলসেতে গোলাপফুলের টব।

এইটে যেমন আমাদের কমনরুম, ওপরেরটা বাচ্চাদের।ছাদের ওপর ওই একটাই ঘর। একটু থেমে, ছুটকি বলে, অরিভাসুর, প্রেম না থাকলে প্রাণটা বড্ডো খাঁ-খাঁ করে, না গো? তোমার প্রেমের গল্প অনেক শুনেছি।প্রেম ছাড়া তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো, শুনেছি। তোমাকে আমার হিংসে হয়।জানাই হল না প্রেমে পাগল হওয়া কাকে বলে।তোমার মতন আমিও প্রেমে পাগল হয়ে যেতে চাই, বদ্ধ উন্মাদিনী।

ছুটকির পর গরমমশলার গন্ধের মতন স্বাস্থ্যবতী, ভূমিসংস্কার দপ্তরের করণিক সেজো বউদি এগিয়ে আসে পাছা ঘষে।হাঁটুর ওপর ওব্দি সাড়ি উঠিয়ে মেদনরম পা জোড়া তুলে দিলে অরিন্দমের কোলে।নে, সেবাযত্ন কর।শাড়ির পাড়ে আঁকা ফুলের গোছা ধরে পা ওব্দি নামিয়ে এনে অরিন্দম বলল, অমন কোরো না, এখুনও অটুট আছ তুমি ; উলটে মাঝখান থেকে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

শুনে, আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কেঁপে-কেঁপে হাসে সেজো বউদি।বলল, আমার পায়ের ওপর রাজহাঁস এঁকে দে, ছোটোবেলায় ঠাকমা একবার এঁকে দিসলো, আমি তখন পানিশ্যাওলার ইসকুলে পড়তুম।তারপর তো বাবা বদ্যিবাটিতে চলে এলো।

প্রতিদিন সবাই মিলে কলকাতা ঠ্যাঙাও, ওদিকেই ফ্ল্যাট-ট্যাট কিনে নাও না কেন?

কীইইই যে বলিস।এখেনে একসঙ্গে আছি সবাই, বিপদে-আপদে দেখি।এরম তো বসা হবে না আজগের মতন।কলকাতায় সবাইকে আলাদা-আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতে হবে, পুকুর-বাগান থাকবে না, দম বন্ধ হয়ে যাবে।

অ্যাই, অরিকে আমাদের বাড়ির জন্মদিনের ক্যালেন্ডারটা দিয়ে দিস।থালে ফি-মাসে আসতে পারবে।ছুটকির ঠেঙে নিয়ে নিস অরি।

মনে পড়ে গেল, অরি, বাড়ি ফেরার আগে কালকে আমার আয়কর রিটার্নটা ভরে দিস। মদঘুমের জগতে প্রবেশ করার প্রাক্কালে বড়োবউদির আদেশ।শতরঞ্চিতে মেদবহুল গতর এলিয়ে কৃতবিদ্য প্রধানশিক্ষিকা।অজস্র ছাত্রীর প্রণাম সংগ্রহকারী পদযুগল।শোয়া অবস্থাতেই মাতাল চরণে আলতা পরায় অরিন্দম।গোড়ালি ফাটা।নখ বড়ো হয়ে গেছে। বাড়িটার জীবননাট্যে বোধয় পারস্পরিক যত্নের সময় নেই।সবাই মগ্ন জীবিকায় আর ফাঁক পেলেই এক চিলতে যৌথ সীমালঙ্ঘনের মৌতাত।

তর্জনীতে গণ্ডারের শিঙের আংটি, ছোটো জামাই বলল, যেন মদের বুদবুদ ফেটে স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, বলল, সেনসেক্স চারশো পয়েন্ট উঠেছে, বড়দা, তেমন-তেমন স্ক্রিপস থাকলে এই বেলা ঝেড়ে দাও।

একে-একে বউদের, তারপর দুই ধুমড়ি বোনের নখ কাটে অরিন্দম, নখপালিশ লাগায়, আর আলতা পরিয়ে দেয়।

ওদের পরানো শেষ হতে বড়দা আচমকা এগিয়ে দিয়েছে নিত্যযাত্রীর ট্রেনে ওঠায় রপ্ত হাড়প্যাংলা ঠ্যাং, শিরাপাকানো, যেভাবে পুরোনো শ্যাওলাধরা মন্দিরকে দুমড়ে জড়িয়ে থাকে অশ্বত্থ গাছের শেকড়।অরি, আমাকেও লাগিয়ে দে দিকিনি, ভাবিসনে যে মাতাল হয়ে গেচি, আপিসে তো বুট জুতো পরে যাই।অরিন্দম তাকায় বাদামি কুয়াশামোড়া নতোদর প্রৌঢ়ের মুখের পানে। পুরসভার স্বাধিকারপ্রমত্ত অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টর। বাঙালির, পশ্চিমবাংলার বাঙালির, স্বাধীনতা-উত্তর খাঁটি প্রতিনিধি। ছেলে মণিপুরে মোইরাঙে পোস্টেড।মোটা টাকা দিয়ে মণিপুর রেভলিউশানারি পিপলস ফ্রন্টের কাছ থেকে ইমিগ্র্যান্ট পারমিট নিতে হয়েছিল থাকার জন্যে।কালকে বিপ্লবীরা ওকে বাহাত্তর ঘন্টা সময় দিয়েছে মোইরাঙ ছাড়ার জন্যে, উদ্বিগ্ন মুখে বললেন বড়দা। অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভের ভালো সরকারি চাকরি ছেড়ে ফিরে চলে আসছে।

শত্রুতা না বাড়ালে বিপ্লব সফল হয় না।বিপ্লব ছাড়া বিদেশি অস্ত্র কারখানা লাভে চলবে না।

বড়দার একপায়ে কাস্তে-হাতুড়ি, আরেক পায়ে পদ্মফুল আঁকে অরিন্দম।

ছাদের ঘর থেকে আরেকবার ষাঁড়াষাঁড়ি ডেসিবল আচমকা এঘরের মদ সিগারেট মাংস মাছ চানাচুর ডিমসেদ্ধর মাথাভার বাতাসে কুচি-কুচি আছড়ে পড়তে, ছাদে যাবার সিঁড়িতে ওঠে অরিন্দম।এঘরে আর কেউ কথা কইবার অবস্থায় নেই।

প্রশস্ত ছাদ। টবের গাছে ছোটো-ছোটো ফুলকপি ক্যাপসিকাম লংকা। আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে।অরিন্দমের মনে হল, অজানা কোনও কিছুর জন্যে ওর মর্মমূল ধ্বনিত হচ্ছে। ছন্দের বোধহয় নিজস্ব ধর্ম হয়। চৈতন্যের পায়ে ছিল একরকম, রামকৃষ্ণের আরেকরকম।বুদ্ধের ছিল।যিশুখ্রিস্টের ছিল।কেটলিউলির আছে কি? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আছে, থাকতেই হবে।

.

১২.

ছাদের ঘরের দিকে ছাইরঙের দরোজা ঠেলে অরিন্দম দেখল, কুচোকাঁচা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাশেষ ছেলেমেয়ের দল, যে যার মতন নেচে যাচ্ছে, হাত তুলে কোমর বেঁকিয়ে। একজন ফ্রক উড়িয়ে শাস্ত্রীয় নাচের অঙ্গভঙ্গী করছে ইউরোপীয় বাজনার তালেতালে, বোধয় শাস্ত্রীয় ভারতীয় নাচ শেখে, কুচিপুড়ি ভারতনাট্যম কোনো-একটা হবে।

ঘরে ঢুকতেই অরিন্দমকে ঘিরে ধরে সবাই।বড়দা-মেজদার মেয়ে দুটো অরিন্দমের হাত ধরে অরিকাকু অরিকাকু বলে হাঁক পাড়ে।এদের দুজনকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না অরিন্দম।কেউ গিয়ে বাজনা বন্ধ করে। জামায় তীব্র হুইস্কির গন্ধ আর প্যান্টময় খাপচা লাল রং যে এরা কেউই অনুমোদন করছে না, ভুরু কোঁচকানো অনুসন্ধিৎসা দেখে আঁচ করে অরিন্দম।

অরিন্দম বলল, যেন বাবা-মায়ের কাছে মার্জনা চাইছে, খাইনি আমি, বমি পায়, ওদের গেলাস থেকে চলকে পড়েছে। এই কচিকাঁচাদের কাছে নিজের দুর্বলতা মেলে ধরে

কিছুটা ভারমুক্ত বোধ করল অরিন্দম।বয়সের সাহায্যে নিচের তলায় আর ওপর তলায় আনন্দের মুহূর্ত গড়ে নিয়েছে এই বাড়ির সদস্যেরা। ওই বা কেন যে বঞ্চিত হয় আনন্দের পরিসর থেকে! কেন যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না!

বালক-বালিকাদের মাঝে ভালো লাগে ওর, অরিন্দমের।আশ্বস্ত বোধ করে।পাটনায়, অফিসের লাঞ্চটাইমে পাশের নার্সারি স্কুলের ছুটি হত। ছোটো-ছোটো খোকা-খুকুর ছুটির হইচইয়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত অরিন্দম, দাঁড়িয়ে থাকত বেশ কিছুক্ষণ। চারিদিকে অজস্র কচি ছেলেমেয়ের ছোটাছুটি আর কোলাহলের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত ও। পুজো আর গ্রীষ্মে যখন ইশকুলটা বন্ধ থাকত তখন মন খারাপ লাগত অরিন্দমের।

এখানে, কলকাতায় বি-বা-দী বাগে ওর অফিসের কাছে ইশকুল নেই। এই অফিস পাড়াটায় বালক-বালিকাদের প্রবেশাধিকার নেই। আজ পর্যন্ত কোনও ইশকুলের ছাত্রছাত্রীদের এই এলাকায় দেখতে পায়নি ও, অরিন্দম।

ওর সামনে অনুসন্ধিৎসু ছেলেমেয়েদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিল অরিন্দম, ওকে বিশ্বাস করছে না এরা। শিশু কিশোর তরুণদের চোখে এখন আগের প্রজন্ম সন্দেহজনক।জনকেরা সন্দেহজনক।

মেজদার বড়ো মেয়ে এই ফাঁকে বাবার জামা-প্যান্ট এনে দিয়েছে।যাও, নিচে বাথরুমে চান করে পাউডার মেখে পালটে এসো, গিজার আছে।

চান করে, জামা-প্যান্ট পালটে এসে বসলে, কাছে এসে মুখ থেকে গন্ধ শুঁকে আশ্বস্ত করে নিজেদের, শাড়ি-পরা উচ্চ-মাধ্যমিক, চুড়িদার মাধ্যমিক। এদের মধ্যে সবচে ছোটোটা, তুলতুলে বছর তিনেকের, পায়ে রুপোর মল, বিস্ফারিত তাকায়। কোলে চাপতে চাইছে।তুলে নিলে, কাঁধে মাথা রাখে।ঘুমের গন্ধ আসছে শিশুটির মুখ থেকে। কত ভালো লাগে এই গন্ধ।

তোদের খাওয়া হয়েছে তো?

সমস্বরে, হ্যাঁ আ্য আ্য আ্য আ্য আ্য, সন্ধেতেই।আজ তো ভুরিভোজ ছিল।

জানলা দিয়ে দেখা যায়, বাতিস্তম্ভের আলোয়, বাড়ির পেছনের থমথমে পানাপুকুর। একগাল হাসিমুখে ঠায় দাঁড়িয়ে ঝাঁকড়া স্থলপদ্ম।পুকুরের দক্ষিণে বৈদগ্ধ্যে ভারাক্রান্ত আমগাছ, স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে থাকবে, ফলহীন।

পুকুরের এদিকে জানলার তলায়, গোলাপ ঝাড় দুহাত তুলে খরচ করছে মোলায়েম সুগন্ধ।গাছগুলোর পাতাকে ফুঁ দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে অন্ধকার।লাস্যময়ী বাদলাপোকারা ঘরে ঢুকেই, ডানার ওড়না ফেলে দিচ্ছে পার্ক হোটেলের ক্যাটওয়াকে মডেলখুকিদের ঢঙে। অন্ধকারে তিরতির কাঁপা কৃষ্ণপক্ষের কনকনে আকাশে ভিজেভিজে বিদ্যুতের শব্দহীন আলো।কোনও প্রতিবেশির বাড়িতে উদাত্তকণ্ঠ অ্যালসেশিয়ানের রোমশ ডাকের তরঙ্গ।

পাঁচ-সাত বছরের গালে-টোল ফরসা দুঝুঁটি এগিয়ে আসে।তুমি কে গো ও ও ও?

আমি? আমি হ্যামেলিনের কেটলিওলা। অরিন্দম কথাটা বলেই থ। এখনও তো কেটলিউলি অদেখা।তবে?

তুমি বাঁশি বাজাতে জানো?

বাঁশি? উঁহু, জানি না।

তবে কেটলড্রাম বাজাও?

না, তাও জানি না।

লিটলুটা ঘুমিয়ে পড়েছে কেটলিকাকুর কোলে ; টুম্পা ওকে শুইয়ে দিয়ায়।আলো জ্বেলে মশারি টাঙিয়ে দিস।পিগটেল ফ্রকপরার হুকুম মান্য করে ববছাঁট ফ্রকপরা।

কেটলিকাকু, তুমি গান জানো? জানতে চায় ক্লাস নাইনের পরীক্ষামুক্ত কিশোর।

গান? মমমমমমম, ভেবে দেখি।

গানের কিছুই জানে না অরিন্দম।কী করে লোকে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্র নজরুলের গানের সুরের তফাত বোঝে, ঠাহর করতে পারে না ও, পারেনি। গানের আলোচনায় কুণ্ঠিত বোধ করে। ওর সামনের ফ্ল্যাটে লরেটোতে পাঠরতা কিশোরী তিনচারটে গান কতকাল যাবৎ সেধে যাচ্ছে, সকালের আলো ফুটলেই, অবিরাম।শুনে-শুনে সুর আবছা মুখস্হ হয়ে গেছে অরিন্দমের। খোকাখুকু শ্রোতার মাঝে চেষ্টা করা যেতে পারে।শ্রোতাদের সামনে নিজেকে গান শোনানোর ভালই সুযোগ।শ্রোতারা যখুন অত্যুৎসাহী।

কই গাও।

গাইছি।

মা রঙেশ্বরীকে হাত জোড় কল্লে না যে। ঠাকুর পাপ দেবে। গাইবার আগে, নাচবার আগে, পড়তে বসে, মা রঙেশ্বরীকে হাত জোড় কত্তে হয়। বিদেশী বাজনার তালে স্বদেশী নাচছিল যে কিশোরী, তার উপদেশ।

অরিন্দম চোখ বুজে হাতজোড় করেছে। মগজের মধ্যে একাগ্র ভগবদভক্তি কী করে জোটায় কেউ-কেউ? ব্যাপারটা ঠিক কী? কোন উপায়ে অমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘটে! আমি কেন ওই বোধ থেকে বঞ্চিত?

জীবনে প্রথমবার ও, অরিন্দম, সিরিয়াসলি গান ধরে :

II { স..সপা...T পা...পধা...ধপক্ষ-T ক্ষ...ক্ষা...গসাঃ... I সগঃ...সপা... TI

সাঁ....ঝো....রপা....খি....রা০০...০...ফি...রি...ল০....০কু...লা০...য়

I গক্ষ...ক্ষণা...নর্সা...ধনা...পাঃ I পক্ষগঃ...ক্ষপা-T – T গমাগমা...গরসা }I

তু০...মি০...ফি০...রি০...লে০...না ০০০ ঘরে ০ ০ ০০০০ ০০০

I প...পনা—TI না....সর্ণা....র্সর্সনধা I ধনা...পধর্নারা...র্সনধা I ধনা... ধপা–TI

আঁ....ধা০....র...ভ...ব০....০০০ন...জ্ব০...লে০০০...নি০০...প্র০...দী০... প

I সা....রা....রা....I রা...গক্ষপধা....গক্ষ I – T ক্ষপা- TI গমা...গগা... রসা I

ম...ন...যে...কে...ম০০০...০ন....০করে...০....০০...০০...০০

ভুল ভুল ভুল ভুল, জানোওওওওনা, হলোওওওনা। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে শাড়িপরা উচ্চমাধ্যমিক।

অরিন্দম স্তম্ভিত।ঠাহর করতে পারে না গানের হওয়া না হওয়া।অথচ গাইতে-গাইতে বিভোর আৎম্রপ্রীতিতে আক্রান্ত হয়েছিল।কোকিল যেভাবে কাককে ফুসলিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, ও-ও নিজেকে ফুসলিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল অচেনা আনন্দের পরিসরে।

হ্যাঁ, তুই বড়ো কুমার শানুর মা এসচিস।মাধ্যমিক অরিন্দমের পক্ষে।

তুমি তো মিশ্র ইমনে গাইছিলে।গানটা তো নজরুলের, মিশ্র মল্লারে হবে।

তুই গেয়ে শোনা দেখি।মাধ্যমিক চ্যালেঞ্জ জানায়।

উচ্চমাধ্যমিক বসে পড়ে মেঝেতে।চোখ বোজে।কোলে হাত।প্রথমে গুনগুন।তারপর গান ধরে।

II { সামরা মা I পা ধা ণা I ণা ধপা মপধাঃ I পঃ মজ্ঞা রসা I

সাঁ ঝে০ রাপা খিরা ফি রি০ ল০০০ কু লা০ ০য়

I সসরজ্ঞারা I সা ণা ধ পা I পনা নাসা Iসা সা র্সা }

তু মি০০ফি রিলে নাঘ ০ ০ রে ০ ০

I মা মরা মা I মপাপাধ মপাঃ I মঃ পা সর্ণা I ধা পা পা I

আঁ ধা০ রভ ব ন জ্ব লে নি প্র দী প

I পধা পধাপমা I গা মগা রসাণ I না সা গা Iরগা মা মা I

মা০ ০ন যেকে ম০ ০ন ক রে০ ০০ ০ ০

কেটলিকাকু, আমিও গান জানি।নাদুস কিশোরের প্রস্তাব।

গাও তাহলে, শুনি।

আমমি চিন্নিগো চিন্নি তোমাআআড়ে ওগ্গো বিদেশিন্নি, তুমি থাআআআকো শিনধু পাআআআড়ে....

অরিন্দমের হাসি পেয়ে যায়।দূরদর্শনের সংবাদপাঠিকাদের কী সর্বব্যাপী প্রভাব।অত্যন্ত জোরে হেসে ফ্যালে ও, কিশোরটিকে জড়িয়ে ধরে। অট্টহাস্য। দিলখোলা হাসি। হাসতেই থাকে।এভাবে খোলামেলা হাসেনি বহুকাল।হাসতে-হাসতে ভালো লাগে ওর। ওর দেখাদেখি সবাই হাসতে থাকে।সব্বাই।

অতর্কিতে, বাইরে থেকে, বাঁদিকের বন্ধ জানলার ফুলকারি ঘষাকাচের শার্শির ওপর ভারি একটা ঢিল পড়তে, থমকে থেমে যায় হাসি। সবায়ের মুখমণ্ডলে আতঙ্কিত অনুসন্ধিৎসা।শার্শির ঠিক মাঝখানে, যেখানে ইঁটটা পড়ল, সেখানে ঘাপটি-মারা ছোট্টো মাকড়সাটা সেই মুহূর্তে, তক্ষুনি, কাচের বুক জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজের আলোকিত তন্তুজাল, শার্শির ফ্রেমের কোণে-কোণে।

কে রে হারামজাদার বাচ্চা। গালাগালটা অরিন্দমের নিজেরই ভয় কাটাবার উপায় হিসাবে আরেকটু হলেই, এতগুলো কচিকাঁচা কিশোর-কিশোরীর সামনে বেরিয়ে যেত। ঠিক তখনই, খোলা জানলাটা দিয়ে, ওরা দেখতে পেল, হ্যালোজেনের আলোয়, মাছরাঙার ঢঙে ছোঁ মেরে, ছোটো-ছোটো অগুনতি সাদা বরফের ছররা, ঝেঁপে নামছে পানা-পুকুরের দাম সরিয়ে, মটকা-মেরে ঘুমোবার ভানরত কালবোস-কাতলার ওপর। জলতলের ওপরে লাফিয়ে উঠল কয়েকটা সোমথথ রুই।

সাদা বরফ টুকরোর টিমটিমে প্রভায় উদ্ভাসিত হয় খোকাখুকুদের কচি-তুলতুলে মুখগুলো। পৃথিবীর মাটিতে নামার আহ্লাদ-মাখানো শিলাবৃষ্টির খই খাবার নেমন্তন্নে, ছাদের দরোজা দিয়ে ঘরের মধ্যে আগত টুকরো মুখে পোরে মিনি টিঙ্কু টুম্পা তাতাই বুবুন খোকন বাবাই টুঙ্কা হাবলু গাবলু।

অরিন্দম জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ফুঁ-এর মতন মুখময় বিচরণকারী আরামপ্রদ হাওয়ার আদর। গাছের পাতাদের গা শিরশির করছে ঠাণ্ডায়। বরফ-পাথরের টুকরো মেরে-মেরে ভ্যাপসা গরমকে তাড়িয়েছে বৃষ্টি। শিলাদের নাচের তাল ক্রমশ বিলম্বিত হয়ে থেমে যায়।বিদ্যুচ্চমকে, পুকুরের জলকে সর্পিল করল হেলে সাপ।

দুকানে দুহাত চাপা দিয়ে তাতাই বলে ওঠে, যাআআআআআ।

কেন? কী হল?

এবার আর হিমসাগর খাওয়া হবে না।সঅঅঅঅঅব ঝরে গেল।

.

১৩.

পেঁকো জলজমা তপসিয়া সেকেন্ড লেন, নানান মাপের আধোডোবা ইঁটের ওপর দিয়ে যিশুর পেছন-পেছন বস্তির একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল অপ্রস্তুত অরিন্দম, এ জায়গায় অন্য জুতো পরে আসা উচিত ছিল।ফুলপ্যান্টের গোড়া ভিজেছে নর্দমা-ওপচানো এঁদো গলির বিষাক্ত দুর্গন্ধ জলে।

ম্যানহোলের ঢাকনা তুলে খালি-গা লেংটি-লুঙ্গি পরা কয়েকজন প্যাংলা মানুষ জমা জল খোঁচালেও, ঘূর্ণি খেয়ে নালির গু-গোলা জল উগরে উঠে গলির ভেতর সেঁদোচ্ছে।

সামলে-সামলে যেতে হবে, গোলাম জিলানি রোডে মসজিদে জল ঢোকা নিয়ে হ্যাঙ্গাম হয়েছে।আসার সময়ে হুঁশিয়ার করেছিল যিশু।খেয়াল করেনি তখন।হতদরিদ্র মুসলমান পাড়া।গলির বেহালে, অপুষ্টিতে লালিত লোকগুলোকে, আগত মহরমের পতাকা দেখে, ভয় করছিল অরিন্দমের।নাকে রুমাল চাপা দিলে হাসবে এরা।টিটকিরি মারবে।পেটের ভেতর ওব্দি ঢুকে পড়ছে দুর্গন্ধ।এমনকী রি-রি করছে, নোংরা জলের ওপর চলকে-পড়া রোদের গা।নর্দমাটা ডাকাবুকো।

বাসার সামনে টাঙানো বাঁশে ছাপা-শাড়ি, কালো শায়া, লাল ব্লাউজ, হাতাঅলা গেঞ্জি, সিড়িঙে ফুলপ্যান্ট শুকোচ্ছে।ডিজেল ড্রামের ঢাকনার ওপর হলদেটে রবারের পাকানো ক্লান্ত পাইপ।আলকাতরা-রাঙানো করুগেটেড টিনের দরোজার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে ঝুলমাখা টিউবলাইট। শালের কালো খুঁটিতে পেরেকে ঝোলানো আংটায় গাঁথা কাগজপত্র ; শিকেতে চালকুমড়ো।দেয়াল দেখা যাচ্ছে যেটুকু, কালচে কাঠের তাকে শিশি-বোতল-কৌটো-ডিবে। মেঝের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের বিশাল গামলা আর কয়েকটা তেল-চটচটে কালচে ট্রে।

খাইয়াঁ-খাইয়াঁ পেট ভরাবার মতলব রহেছেঁ, আঁ।গলা জড়াই ধরি মুহে চুম খালেক। তাঁয় উড়াই ফেল্লেক তামাম।মজাদারি পাহিছেঁক।আঁচতা ধাকালি দিবঁ একটা।মেয়েলি কণ্ঠে বকুনি ঘরের মধ্যে।

সাদা কেঁদো বেড়াল বেরিয়ে, আধডোবা ইঁটের ওপর লাফিয়ে-লাফিয়ে ওদের পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়োতে, অরিন্দমের ডান পা জলের মধ্যে পড়ে, নোংরা জল ঢুকে যায় জুতোয়।

এই কেটলি।হাঁক পাড়ার পর, অরিন্দমের দিকে ফিরে যিশুর আবেগহীন কণ্ঠ, গতবছর জলের মধ্যে খোলা ম্যানহোলে একটা আড়াই বছরের মেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। দমকলের লোক এসে, শেষকালে হুক নামিয়ে, বডি তুললে।ময়না তদন্ত হয়েছিল।তা এরা গরিব লোক, বুঝতেই পারছ, রিপোর্ট-ফিপোর্ট নিয়ে কীই বা করবে।হুক দিয়ে না তুলে কেউ নিচে নেমে চেষ্টা করলে বেঁচে যেত বোধহয়।কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে এতো বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে মানুষ যে সুযোগ পেলেই খপ করে ধরে নেবে পৃথিবী।

অরিন্দম ভয় পাচ্ছে দেখে যিশু কথাগুলো বলে গেল চিউইংগাম খাবার ঢঙে।তারপর অভ্যস্ত কাঁধ নাচিয়ে হাসে।

আড়হল্যা লাগ্যে নেঁও ; জলটো অধন হল্যে মেরায়েঁ দে। কথ্যভাষার মধ্যেকার জলতরঙ্গে অরিন্দম মুগ্ধ।বাঙালির জিভ থেকে এই সমস্ত স্থানিক বুলি ক্রমশ মুছে যাবে।হারিয়ে যাবে বাংলার মাটি থেকে।শহর গিলে খেয়ে নেবে বাংলা বুলিগুলোকেও।

আসছি কাকুদা, মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও।খুকুস্বর তরুণী-কণ্ঠের ভেতর থেকে আসা আশ্বাসে ভারমুক্ত হয়েছে অরিন্দম।কাকা আর দাদা মিলিয়ে নতুনতম এক সম্পর্ক পাতিয়েছে বটে মেয়েটা।

কাকুদা! বেশ লাগল শুনতে।কলকাতায় বেগুনউলিকে লোকে বলে মাসি, অথচ নিজের মাসিকে পাত্তা দেয় না। বাসযাত্রী বা পথচারীকে যুবকেরা বলে দাদু, কিন্তু নিজের দাদুকে দুমুঠো খেতে দেয় না।কলকাতায় শব্দের মধ্যে সম্পর্কগুলো আর নেই।

অতর্কিতে এক ঝলক ভ্যানিলা গন্ধের ঝাপটা। এই নোংরা পেঁকো দুর্গন্ধের সমুদ্রে কোত্থেকে এই সুগন্ধ! যিশু বলল, কেটলির বাপ দিশি বিস্কুট আর কাপ-কেক বানায়, তারই গন্ধ। কেটলির পা-দুখানার দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি, সদ্য ধানচারা রোয়া হাতের চেটোর মতন পরিষ্কার।ওই অ্যালুমিনিয়াম গামলাটা দেখলে তো? ওর মধ্যে পা দিয়ে কেক-বিস্কুট বানাবার ময়দা-টয়দা মাখে। পুজো করার যুগ্যি। ভারজিন মেরির মতন।সত্যি, কলকাতার রাস্তায় হাঁটাচলার পরও যে অমন পা থাকতে পারে কারোর, ধারণা ছিল না আগে।রাইটার্সে ভালোই বিক্রি হয় ওর কেক-বিস্কুট।

বাপরে! কলকাতায় এরকম গা-সওয়া জায়গা আছে জানতুম না। কী করে থাকে লোকে? প্রশ্ন তোলে অরিন্দম, উত্তর নেই জেনেও।ফেরার পথে টের পায় জমা জল বাড়ছে। প্রায় পুরো ডুবে গেছে ইঁটগুলো। অন্য জুতোটাও চপচপে জলে ঢুকে মোজা ভেজাচ্ছে।

গলি থেকে জলটা বেরোচ্ছে না-ই বা কেন? আবার প্রশ্ন তোলে অরিন্দম।

এখন তো অবস্থা তবু ভালো। বর্ষাকালে এলে দেখবে যতরকম প্রজাতি আর ভাষার মানুষ কলকাতায় আছে, এই গলিটা তাদের সব্বায়ের গুয়ের মিলনমেলা। এখানে আন্ত্রিকের টিশু কালচার হয়।কড়াইডাঙার চামড়া টাউনশিপের জন্যে এগারোশো একর নিচু জমি ভরাটের কাজ চলছে ডি ডাবলু খালের বুকে বাঁধ বেঁধে মাটি কাটার জন্যে। তুমি ওদিকটায় যাওনি বোধয়। এখন বেশ কিছুদিন বেরোবার উপায় নেই। জল বেরোচ্ছে না বলে বানতলার ভেড়িগুলো চোতমাসের গরমে ভেপসে উঠে মাছ মরছে। ভেড়িগুলো এখানকার নোংরা জল খাল থেকে টানে। এখন তো চারাপোনা ছাড়ার মরশুম।

ওফ, যিশু বিশ্বাস তো মগজের মধ্যে খবরের ব্যাংক বানিয়ে ফেলেছে। এর জন্যেও কনসালটেনসি পাবার তালে আছেন নাকি? প্রশংসা জানায় অরিন্দম।

নিজের যোগাড়-করা তথ্য ঝালাবার কাজ চালিয়ে যায় যিশু।বালিগঞ্জে, পামার বাজার, চৌবাগায় পাম্পং স্টেশানগুনো কলকাতার মাটির তলাকার নর্দমার জল ওই খালটায় পাঠায়। তিলজলার ট্যানারির চামড়াধোয়া জলও মেশে। অতএব বুঝতেই পাচ্ছ, এই গলির কলকাতা বহুকাল এই গলিতেই থাকবে। গুয়ের ভেনিস। সিগারেটের প্যাকেট সামান্য খুলে অরিন্দমের দিকে বাঁহাত বাড়িয়ে, ও তুমি তো খাও না।

তোমরাদের বললুম না মোড়ে গিয়া দাঁড়াও। একটু আগেই শ্রুত কণ্ঠস্বর শুনে পেছন ফেরে অরিন্দম। কালচে টেরাকোটা রঙের মেদুর-ত্বক স্বাস্থ্যবতী। কৈশোর আর যৌবনের সেই নিদারুণ সংযোগ-মুহূর্তে, যখন আজেবাজে চেহারাও হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। ভ্যানিলা-সুগন্ধের জেল্লা। নিজেকে হতবাক করার জন্য আরেকবার ফিরে চাইতে হয়।

অরিন্দমের এভাবে তাকাবার বাধ্যবাধকতাকে উপভোগ করছিল যিশু। এখানে আসার আগেই সতর্ক করেছিল যিশু, এ তোমার বিশুদ্ধ বাঙালি পাড়ার কলকেতিয়া লাফড়াউলি নয় যে দশবছর বয়েসেই দুলুর-দুলুর বুক নাচিয়ে ঘুরবে।

নর্দমার নোংরা জল-জমা গলিটার ঢোকার মুখেই, বিতৃষ্ণা, কুণ্ঠা ও সার্বিক ভয় যখন ওকে পেড়ে ফেলতে চাইছিল, মনে-মনে মনে হয়েছিল অরিন্দমের, এই পেঁকো ছমছমে ঘুঁজির বাসায় ভালো কি সত্যিই থাকা সম্ভব, সৎ থাকা? অত্যন্ত ধনী আর ভীষণ গরিবের পক্ষে সৎ থাকা বেশ কঠিন। সেরকম সৎ-টাকাকড়ি রোজগার করে বাঁচা যায় কি এখানে, এই এঁদো এলাকায়? পরিচ্ছন্ন কোনো পাড়ায় চলে গেলেই তো হয়। মহাকরণে চা আর সস্তা বাটি-কেক বেচে দু-তিনজন লোকের কুলিয়ে যায় হয়তো।

এরকম একটা পাড়ায় থেকেও কেটলিউলির স্বাস্থ্য নিখুঁত, সূর্যকরোজ্জ্বল। হাত দুটো শ্রম-সুডোল। চকচকে ত্বকের স্নেহপরবশ মসৃণতায় পিছলে যায় অরিন্দমের মুগ্ধ দৃষ্টি। দ্রুত বেঁধে ফেলেছে ঘনকালো কমনীয়-উজ্জ্বল কোঁকড়াচুল হাতখোঁপা। প্রিন্টেড শাড়ির বেগনে-নীল-হলুদ কল্পরাজ্যের ফুলগুলো শাড়িটাকে সহজে নোংরা হতে দিতে চায় না বলে বেশ কিছুদিন সযত্নে না-কেচে চলে যায়।

মেয়েটা লম্বায় কত? পাঁচ ফিট? তাই হবে। যিশুর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেঁটে। প্লাসটিকের স্ট্র্যাপবাঁধা বর্ষাকালের কালো জুতো, নোংরা জলে উঠছে-নামছে। জুতোর গোড়ালিটা নরম নিশ্চই, নইলে মহাকরণে হরেক ধরণের হাওয়ায় চেপে-থাকা রাজনীতিবিদ, আমলা, কেরানি, আর কৃপাপ্রার্থী নাগরিকদের সামনে দিয়ে কাঁচের গেলাস আর কেটলি হাতে গটগটিয়ে হাঁটলে তো বারান্দা থেকে ঠেলে বিনয়-বাদল-দীনেশের কাছে পাঠিয়ে দেবে আদিত্য বারিকের ভুঁড়ি-ভোম্বোল সহকর্মীরা, যারা বারান্দায় বসে সারাদিন হাই তোলে আর মুখের কাছে টুসকি বাজায়।

পা দুখানা সত্যই প্রতিভাদীপ্ত। সকাল-দুপুর সংগৃহীত প্রতিদিনের সূক্ষ্ম নোংরা সন্ধ্যাকালে চালান হয়ে যায় কেকগুলোয়। অরিন্দমের মগজে নির্বাক হইচই। প্রাকগ্রীষ্মেও মেয়েটা ঠান্ডা হাওয়ায় মোড়া। মেদহীন নারীত্ব বোধহয় হয় না। মোড়ে পৌঁছে, কলের মুখহীন সতত বহমান জলে, জুতোসুদ্দু পা এগিয়ে প্রথমে ডান তারপর বাঁ হাঁটু ওব্দি শাড়ি তুলে ধুয়ে নিল মেয়েটি নির্দ্বিধায়। বোঝা যায়, রোজকার, যেদিন মহাকরণ খোলা থাকে, অভ্যাস।

যিশু চাপা গলায়, কীইইইইরে, তোর এই একটাই শাড়ি, বলতে ততোধিক নামানো গলায় মেয়েটি জানায়, অন্য দুটা কাচার সময় হয়নি, পরে কেচে নিবো।

কেটলিউলির গিঁটপড়া ভুরুর তলায় ঝলমলে চাউনিতে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন ছিল, এই লোকটা আবার কে, কাকুদার সঙ্গে জুটেছে সাতসকালে।

ওর নাম অরি, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। খুব ভালো লোক। তোকে রেস খেলা দেখতে নিয়ে যাবে। প্রস্তাব আর আদেশ একসঙ্গে মিশিয়ে, মাথা পেছনে হেলিয়ে, থুতনি দিয়ে অরিন্দমের দিকে নির্দেশ করে যিশু কেটলিউলি ঝটিতি জরিপ করে ওকে, যেন এই

কচি বয়সেও, মানুষের দিকে স্রেফ একটি বার তাকিয়ে, তার চরিত্রের ভালোমন্দ বুঝে ফেলবে।

ভুরুর গিঁট বজায় থাকে।মাঝখান থেকে এই লোকটা আবার কেন? কাকুদা তো নিজেই নিয়ে যাবে বলেছিল ঘুড়ার দৌড়ানো দেখতে।তা নয়, একজন অচেনা উটকো লোকের ঘাড়ে চাপাচ্ছে।এ কি ঘুড়ার পিঠে বসে?

যিশু নিজের সাফাইকে সাফসুতরো করে।আমি যেতুম, কিন্তু আমার দুদুটো রিপোর্ট ফাইনাল করা হয়নি এখনও।একটা তো আজকে স্পাইরাল বাইন্ডিং করতে পাঠাব, যাতে রাত্তিরে কুরিয়ার করতে পারি। তার ওপর আবার কমপিউটারের প্রিন্টারটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে।ফ্লপিতে তুলে দেখতে হবে কাছেপিঠে কোথাও যদি প্রিন্টআউট নেয়া যায়।লাইটও থাকছে না সন্ধের দিকে।হাতের কাজ দু-এক দিনের মধ্যে শেষ করতেই হবে, নইলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে।অরিন্দম অনেক ভালো লোক।বাড়িয়ে বলছি না।সত্যি।আলাপ করলেই টের পাবি।তোর অফিসের পাশেই ওর অফিস।ওই ডানদিকে যে তেরোতলা বাড়িটা।অফিসে এসকালেটার আছে, মেট্রোরেলের মতন। তোর অফিসে তো শ্রমিকদের সরকার তোকে চাপতেই দেয় না লিফ্টে, দিনে পঁচিশবার একতলা, তিনতলা করিস।ওর অফিসে ও অনেক বড়ো অফিসার।ওর গাড়িও আছে নিজের, তোকে চাপাবে।ওই তো, ওই যে, ওই ঘিয়ে রঙের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস, ওইটে।

কেটলিউলিকে কমপিউটারের বিশদ কেন? ও কি কমপিউটার শিখছে? কিন্তু অরিন্দম সম্পর্কে কথা বলার বদলে ওর অফিস, অফিসারি, তেরোতলা, এসকালেটর, গাড়ি এসমস্ত ওর সচ্চরিত্র হবার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মেয়েটির এজলাসে পেশ হল। কেটলিউলির চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যিশুর প্রয়াস দিব্বি সফল।মসৃণ তেলালো ত্বকে আভা দেখা যায়।ভুরুর গিঁট খোলে।

তুইতোকারি করা বা তুমি বলা উচিত হবে কিনা নিশ্চিত হতে না পারায়, বিব্রত অরিন্দম বলল, আমাকে কাকুদা-অরিদা গোছের কিছু বলবেন না।স্রেফ অরি কিংবা অরিন্দম বলে ডাকবেন।

যিশু কাঁধ নাচায়।ওহ হাসালে বটে।তুমিই বোধহয় প্রথম আপনি-আজ্ঞে করছ ওর জীবনে।মহাকরণে সবাই তুইতোকারি করে।অত তোল্লাই না দিয়ে ওকে তুমি বলেই ডেকো।ঠিক, না রে কেটলি?

কেটলি বেশ বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে, মাসখানেক আগে একবার বলে ফেলেছিল যিশু।ওর দাদু, মানে ওর মায়ের বাবা, নামকরা লোক ছিল, খাঁটি ডাকসাইটে।কুচকুচ করছে চুল।থমথম করছে মুখ।কুতকুত করছে চোখ।টনটন করছে জ্ঞান।খসখস করছে কণ্ঠস্বর।তিরতির করছে চাউনি।গটগট করছে চলন।কনকন করছে আঙুল।দশাসই। পিস্তল রাখত।ভালো জামা-কাপড় পরার শখ ছিল।দু-দুটো বডিগার্ড থাকত সব সময়। স্বাধীনতার আগের বছর তো জান লড়িয়ে দিয়েছিল।আদিত্যকে জিগেস কোরো।যিশু আদিত্যর কথা পাড়ায় নিজের ক্ষুন্নতায় আশ্চর্য হয়েছিল অরিন্দম।আদিত্য তো বোধহয় ওরচেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোটো।যিশু আদিত্যর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো।

আদিত্যর দেওয়া তথ্যে বিস্মিত আর আকৃষ্ট হয়েছিল অরিন্দম। সত্যি। অফিসের মহাফেজখানা থেকে ধুলোপড়া পুরোনো খড়খড়ে ফাইল এনে দিয়েছিল আদিত্য। ফাইল খুঁটিয়ে পড়ে, অবিচল অস্থিরতায় আক্রান্ত, ভেবেছিল অরিন্দম, বিকেলের বর্ষীয়ান আলোয় নিজের বিছানায় শুয়ে, টেবিলে রাখা চায়ে কখন সর পড়ে গেছে খেয়াল নেই, ভেবেছিল ও, কলকাতার বিখ্যাত পরিবার বলতে ঠাকুর পরিবার মল্লিক পরিবারের মতন কয়েকটা উচ্চবিত্ত পরিবার বোঝায় কেন! কত বাঙালি আছে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ পুরুষ ওব্দি বংশলতিকা জানে বলে গৌরব বোধ করে। তারপর একদিন তারা মরে হাওয়া হয়ে যায়। সেই গৌরববোধটা কি তখন হাওয়ায় ঈথারে ভেসে বেড়ায়? বিখ্যাত গরিব বাঙালি পরিবারও আছে তো কতো!

আরও গোটাকতক ফাইল লুকিয়ে এনে দিয়েছিল আদিত্য।বর্ণময় সব চরিত্র।

কেটলিউলির দাদুর নাম কেষ্টবাহাদুর জহোর্বাদি।দার্জিলিঙের বাঙালি।মা-বাপ অজানা। একজন চিনে মুটিয়া লালন-পালন করেছিল।তাকেই বাপ বলে জানত।দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় পৌঁছে, বছর ফুরোবার আগেই, পটল তুলল চিনে বাপ।কারা যে ওর মা-বাপ, চিনে বাপ সাঙ্গ হতে, জানা হল না আর। সব বাবারাই তখন ওর চিনে বাপ। ফেকলু ছেলেটাকে শুয়োর মাংসের এক কসাই পুষ্যি নিলে। পাড়ার বজ্জাতগুলোর সাকরেদিতে শিখে ফেলল চুরি-বাটপাড়ি, চাকুবাজি, হার ছিনতাই, ব্লেডমারা, পার্স তুলে চিতাবাঘ দৌড়। চোদ্দ বছর বয়সে রেফরমেটরি-জেলখানায়। কলকাতার আর আশেপাশের জেলখানায় যা হয়, গাঁজা, চরস, হেরোইন, আফিম, কোকেন, সমকাম, ঝাড়পিট, অসুখ, অখাদ্য, অপুষ্টি।সেখান থেকে বেরিয়ে এলো পোড়-খাওয়া ঘ্যাঁচড়া। তারপর অবিরাম ভেতরে-বাইরে, ভেতরে-বাইরে, ভেতরে-বাইরে, ভেতরে-বাইরে...।

ছেচল্লিশের প্রাকস্বাধীনতা আর মানুষ-জবাই উৎসবে, মুসলমানদের পাড়া টেরিটিবাজার ছেড়ে পালাল মলঙ্গা লেন, আর সেখানে গিয়ে গোপাল মুকুজ্জের হিন্দু বাঁচাও দলের ঠ্যাঙাড়ে সদস্যে পদোন্নতি পাওয়া কেষ্টকে তখন দ্যাখে কে! যত খুন করে ততো প্রতিষ্ঠা বাড়ে।শার্টের কলার, গোপাল মুকুজ্জের দেওয়া হলেও, গাধার কানের মতন উঁচু।ও দার্জিলিঙের লোক ছিল বলে ওর নাম সেই থেকে হয়ে গেছে ন্যাপলা।অন্তত শ'খানেক মুসলমানকে নুলো খোঁড়া কানা করেছিল, পাঞ্জাবি পুলিশের নজর এড়িয়ে। কচুকাটা কন্দকাটা হেঁটেকাটাও করেছিল দাদু।

ওই ফাঁকেই, দেশ স্বাধীন হব-হব, একজন তাগড়া হেলে কৈবর্তের মেয়ের সঙ্গে থাকতে লাগল। ফাইলের মার্জিনে লেখা, ইংরেজিতে, বিয়ে হয়নি।বাচ্চা হতেই জিনহা আর জহোরলাল যে যার আঁতুড়ে যখন স্বাধীনতার বিগুল বাজাচ্ছে, বউটা কাঁখে বাচ্চা নিয়ে এক গাঁট্টাগোঁট্টা তেঁতুলে বাগদির সঙ্গে পালাল পুরুলিয়ার আরসা ব্লকের হেঁসলা গ্রামে।

দেশ স্বাধীন হতে, হাত-পা ছড়াবার অনেকটা জায়গা দিয়ে অনেক মুসলমান তো ডানদিকের আর বাঁদিকের পাকিস্তানে পালাল। গোপাল মুকুজ্জেরা আর তাই কেষ্টটেষ্টদের পুষতে চাইল না।তখন সংবিধান লেখালিখি হবে, দিশি বুড়ো-হাবড়ারা চেয়ার-কুর্সি পাইক-পেয়াদা পাবে, ফলে কেষ্ট গিয়ে সমাজের বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে চিৎপটং। তারপর কখনও পটুয়াটোলার সত্যেন বিশ্বাস, ভূবন সরকার লেনের ব্রজেন

সরকারের কাজে, কিংবা ফ্রিল্যান্স ঠ্যাঙাড়ে।সাতচল্লিশে টালিগঞ্জ থানার বন্দুক-কার্তুজ লুট, আটচল্লিশের নভেম্বরে মহরমে মারপিট। পঞ্চাশের ফেবরারি-মার্চের দাঙ্গায় গোপালবাবু-সুধাংশুবাবুদের স্যাঙাত হয়ে আবার দেশপ্রেমিকে উন্নীত।

কেষ্টোবাহাদুর জহোর্বাদি বাঙালি-সমাজের প্রথম মস্তান। তারপর থেকে মস্তান ছাড়া সরকারি দল অচল। পশ্চিমবাংলার রাজনীতি অচল। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতে তার অবদানের আলোচনা কেন যে হয় না, আশ্চর্য!

কেষ্ট তারপর আরম্ভ করে দিল ডাকাতি। খুল্লমখুল্লা ঘুরে বেড়াত স্টেনগান নিয়ে। গড়িয়াহাটের গিনি ম্যানসনের ডাকাতিটা ওই করেছিল। তখনকার দিনে মুখোশ পরে মুখ লুকিয়ে ডাকাতির চল হয়নি।তবুও প্রমাণ করা যায়নি।কে আর সাক্ষী হয়।মানুষের ভয়ডরের শরীর। তার ওপর দেশ স্বাধীন হতেই পুলিশকেও একই রকম ভয় পেতে আরম্ভ করেছে লোকে। ছাড়া পেয়ে কেষ্ট দিনকতকের জন্যে পালাল মুম্বাই। ফিরে আসতে, একদিন রাস্তায় হঠাৎ, ছেচল্লিশের প্রতিরোধ সমিতির পাণ্ডা শিবপ্রসাদ সাহার সঙ্গে কেষ্টবাহাদুরের দেখা।বউবাজারে সাহার চালডালের দোকান।চলছিল না।একদিন বউবাজারের বড়ো ব্যাপারি শ্যামলাল গুপ্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।ব্যবসার টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল শ্যামলাল।কেষ্ট তো ওকে গুলি মেরে খুন করে বোমার ধোঁয়া উড়িয়ে ব্যাগ হাতিয়ে পালাল। কিন্তু পাবলিকের তাড়া খেয়ে সেঁদিয়েছে গিয়ে রূপম সিনেমাহলে।ধরা পড়তে রাগি জনগণের হাতে দেম্মার, পেড়ে ফেলে আড়ং ধোলাই।

স্বাধীনতার পর সেই প্রথম বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ আর রাজনীতি-নিরপেক্ষ গণপ্রহার, কেননা মাত্র ক'বছরেই পুলিশের ওপর থেকে ভরসা উবে গিয়েছে নাগরিকদের। বলেছিল যিশু।

মাউনব্যাটোন যাবার সময়ে জহোরর্লালকে বলে গিসলো, এই স্বজন-ঠ্যাঙাড়েদের ভার তোমার হাতে সঁপে যাচ্ছি, এরা অনেক কাজে দেবে, তোমার মেয়ে যখন বড়ো হবে তখন, এমনকী তোমার নাতি আর তাদের ছেলেমেয়েদেরও কাজে দেবে। তুমি আবার বাহাদুরি মেরে মানবতাবাদ ফলাতে গিয়ে খোলনলচে পালটে ফেলো না যেন। জিনহাকেও একই কথা বলিচি।তা কথাটা অমান্য করেনি দুজনে।বলেছিল যিশু।

জহোর্লালের মেয়ে জহোর্লালের চেয়ে এককাঠি বাড়া।কেরলের কমিউনিস্ট সরকারকে পছন্দ হয়নি বলে, কথা নেই বার্তা নেই, বরখাস্ত করে দিলে। কংরেসের তাথই নাচ দ্যাখে কে!

অনেকদিন চলেছিল কেষ্টর মকদ্দমা।জেল হাজতে তো ওর দাড়ির চুল সাদা হয়ে গেল। স্বাধীনতার পর বছরের পর বছর মামলা ঝুলিয়ে রাখার সেই শুরু, ফউজদারি হোক বা দেওয়ানি। সাতান্ন সনের কলমের নিব ভেঙে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল কেষ্টর। সে নিব পালটে নতুন নিব লাগালে, রাষ্ট্রপতির দয়ায় যাবজ্জীবনের পর কেষ্ট বেরিয়ে এল একেবারে লোলচাম বুড়ঢা, ভুরু আর কানের চুল পেকে দঙ্কাদড়ি। মেয়ের কাছে তপসিয়ায় বেঁচেছিল, অথর্ব। নাতনির টেরাকোটা হামাগুড়ি শেষ হবার আগেই, বাটিকেকের সদ্য নামানো গরম ডালার মধ্যে পড়ে ঝলসে মরে গিয়েছিল।

চিতায় ক্রিমিনালের লাশ থেকে ভ্যানিলার ভুরভুরে সুগন্ধ নিমতলার ঘাটকে শোকমুক্ত করে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে।বলেছিল যিশু।

কেটলি ওর মায়ের কাছ থেকেই শিখেছে পা দিয়ে ময়দা চটকানো।ডালহাউসিতে ওর বাপ ফিরি করত সেসব কেক।উদবাস্তুরা তখন সবে বড়োদিন, নিউ ইয়ার, হ্যাপি বার্থডে, পিকনিক করতে শিখছে।

নিয়মিত বিক্রিবাটা তো কেটলি মহাকরণে ঢোকার পর আরম্ভ হয়েছে।ঢোকার জন্যেও পুরুলিয়ায় গিয়ে ঝাড়খন্ড দলের বিরুদ্ধে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে হয়েছিল ওর বাপকে, নির্বাচনের সময়।বলেছিল যিশু।

তাহলে মেনকা, আই মিন ম্যানকা পাইক, ওর বুইন নয়? জিগেস করেছিল অরিন্দম।

না-না।ও-ও তিলজলা বা বাইপাসের দিকে জবরদখল বস্তিতে থাকে কোথায় যেন। মস্তান ট্যাক্স আর পার্টি ট্যাক্স দিতে হয়।

ওর নাম কী? কেটলির?

নাম? নাম দিয়ে কী করবে?

নিজের কাছে রাখব।

ফাইলটার মার্জিনে একগাদা বানান ভুল সম্পর্কে মন্তব্য ছিল, পেনসিলে। মন্তব্যগুলোতেও বানান ভুল ছিল উদবাস্তুরা এসে কমিউনিস্ট পার্টিটাকে দখল করে নিয়ে প্রাইমারি স্তরে ইংরিজি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, যাতে বাঙালিদের একঘরে করে রাখা যায়।ফল ভুগছে।আন্দামানকে বাঙালিদের উপনিবেশ করতে দেয়নি জ্যোতি বসুর দল, এখন পাঞ্জাবি আর মালায়ালিরা দখল করে ফেলেছে।বাঙালি লেখকদের সেসব কথা বললে পোঁদ কুটকুট করে।

মন্দ বলোনি।

আরেকটা ফাইল থেকে তো জেরক্স তুলে নিয়েছে অরিন্দম, আদিত্যকে খ্যাপাবে বলে। খেপছেও আদিত্য।প্রসঙ্গ তুললেই, এমনকী ওর ভুঁড়িদাস খাকি সহবেতনভূকরাও। একজন কন্সটেবল, ব্যাটা কেবলমাত্র কন্সটেবল, মেদিনীপুরের পাণ্ডে, অ্যাঁ, সে তো রেগে কাঁই।আসলে, মেছুয়াপট্টির ফলবাজারে ব্যাটার একটা ম্যাটাডর ভ্যান খাটতো ; পুরসভা সেটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।সতেরোটা হাতে-টানা রিকশা খাটে ওর।সবকটা রিকশা একটা লাইসেন্সেই চলে।

কলকাতা থেকে হাতেটানা রিকশা কেন তুলে দেয়া হচ্ছে না জানো তো? সব রিকশাই হয় পুলিশের নয়তো পলিটিকাল মাফিয়ার।

ওই ফাইলটা, যেটার জেরক্স রেখেছে অরিন্দম, গৌরীবাড়ি লেনের হেমন্তকুমার মণ্ডল ওরফে হেমেন মণ্ডল ওরফে হেমা এজেন্টের।লুম্পেন কলকাতার জনকরাজা।ফাইলে, নামের আগায় 'শ্রী' জুড়ে দিয়েছিল কেউ সবুজ কালিতে।মহাশ্বেতা দেবীর লেখায়

পড়েছিল অরিন্দম, মনে আছে, হেমেন মণ্ডলটা ছিল রুণু গুহনিয়োগীর স্যাঙাত ঠ্যাঙাড়ে।বোঝো তাহলে।শেষে এই রুণু কিনা আদিত্যর রোল মডেল!

স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস নাইন ওব্দি পড়েছিল হেমেন মণ্ডল। ক্লাস টেনে যাবার মুখে চলে গেল অন্যলোকের মালকড়ি-টানার ইশকুলে। গড়ে ফেলল হাড়-বজ্জাতদের হাড়হাভাতে হাড়গিলে দল। ভাড়াটে তুলতে হেমেন। চটকলে ভর্তি করাতে হেমেন।বানতলার ইঁট-বালি-লোহা কিনতে হেমেন।অবরোধকারীদের প্যাঁদাতে হেমেন। পুজোর চাঁদা তুলতে হেমেন। হেমেন রক্তদান ক্যাম্প করলে রোগাপটকা বুড়ো বাচ্চা সব্বাইকে দিতে হত ওর পাতা ফোলডিং খাটে কাঠ হয়ে শুয়ে। নইলে নয়ছয় লণ্ডভণ্ড খিস্তিখেউড় আড়ংধোলাই।লাশ লোপাট।নকশাল খুনের রেকর্ড করেছিল ও।

রাষ্ট্র তখন মহাকরণে কাগজ-কলম নিয়ে নাজেহাল।গৌরীবাড়িকে ভারতীয় সংবিধানের বাইরে নিয়ে যেতে সফল হয়েছিল হেমেন মণ্ডল। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার প্রথম মুক্তাঞ্চল। পঞ্চান্ন হাজার লোকের ঘাড়ের ওপর সন্ত্রাসের ছত্রপতি হেমেনজি। ফি হপ্তায় কে কত তোলা দেবে তা বেঁধে দিয়েছিল হেমেন। খেরোর খাতায় হিসেব রাখত। চাইলেই গাড়ি টিভি ফ্রিজ চেয়ার টেবিল বাসন-কোসন বিছানা-মশারি তক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে হেমেনজিকে।তক্ষুনি।বাড়ি বা ফ্ল্যাট চাইলে, তাও।তক্ষুনি।

অনিতা দত্তর ভায়ের ফ্ল্যাট দখল করে থাকতে লাগল হেমেন আর ওর ল্যাংবোট সেনা। অনিতার কাজ ওদের জন্যে রান্না করা, বাসন মাজা, জলতোলা, কাপড় কাচা, ঘরমোছা, জামাপ্যান্ট ইস্তিরি। অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরটা অনিতার ভায়ের জন্য বরাদ্দ। পাড়ার লোকেরা তো ভয়ে লেংটু গুটিয়ে কেঁচো। রাষ্ট্র তখন মহাকরণে বৈপ্লবিক ফাইলবাজি শিখছে। দুনিয়ার মজদুর এক হও, কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ, কাঁধে কাঁধ ভাইসব।

হেমেন কি আর ধরা পড়ে না? পড়ে বইকি।ধরে রাখা যেত না।উকিলরা ছাড়িয়ে এনে আবার ছেড়ে দিত সমাজে। হেমেন সমাজের ভেতর। পুলিশ সমাজের বাইরে হাই তুলছে। হেমেন যতবার ছাড়া পায় ততবার ওর ইজ্জত বাড়ে। এরকম হতে-হতে আলটপকা একদিন খেলাচ্ছলে শ্যামপুকুর থানার পরশুরাম রায়কে খুন করে ফেলেছিল। যাবজ্জীবন হল।

কিন্তু হেমেন মণ্ডল বলে কথা।দিব্বি ছাড়া পেয়ে গিসলো হাইকোর্টে।বুকের পাটা ফুলে হিমালয়।বড়োতলার গুণ্ডা হারু আদককে গিয়ে খুন করে দিলে, তারই পাড়ায়, হিন্দি সিনেমার সংলাপ বলতে-বলতে। হিন্দি ফিলমে তখন সবে ক্রিমিনালরা নায়কের পিঁড়িতে বসছে। অমিতাভ বচ্চনের দিওয়ার। শোলের গব্বর সিং। কিতনে আদমি থে? শুয়রকে বচ্চে, ওয়হ দো আউর তুম তিন।আরে ও সাম্ভা।

বাড়ির ছেলে-ছোকরা আর বউঝিরা বাংলা ফিল্ম ছেড়ে হিন্দির দিকে ভিড়ছে তখন। পাড়ার কচি কিশোররা হিন্দি সিনেমার ঢঙে কথা বলে আহ্লাদে আটখানা হতে শিখছে।

কংরেসের সিদ্ধার্থ রায় বিদেয় নিলে কী হবে, জনদরদী বামপন্থী সরকার সেশন আদালত থেকে হারু আদকের খুনের মামলা চুপিচুপি তুলে নিলে। ইনকেলাব

জিন্দাবাদ।কমরেড মাও যুগ যুগ জিও, কমরেড ফিদেল যুগ যুগ জিও।

এদিকে হেয়ার স্ট্রিটে, মানিকতলায়, উল্টোডাঙায়, শ্যামপুকুরে, পার্ক স্ট্রিট, বড়োতলা আর চব্বিশ পরগণার থানায়-থানায় হেমেনের নামে শ'খানেক কেস ঝোলানো। ঝোলানো মকদ্দমার দড়ি আপনা থেকেই পচে যায়।হেমেনের খাতিরে বিশেষ আদালত হল। হতেই, নাকচ করে দিলে হাইকোর্ট। জনদরদী সরকার জানতো যে হাইকোর্ট নাকচ করে দেবে।আইন বলে কথা।তা-ও আবার ইংরেজদের বানানো।

শুধুমাত্র তিনটে কেসের তল্লাশিতেই হেমেনের বৈভবে পাওয়া গিসলো লাখের বেশি কাঁচা টাকা, বিলিতি মটোরগাড়ি, অনেকগুলো ব্যাংকের মোটা ফিক্সড ডিপোজিট, লকার, গয়নাগাটি, ট্রাক, এমনকী ওর পাঁচ-পাঁচটা লাইফ ইন্সিয়োরেন্স। বিদেশি ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিরা এসে যাতে না ব্যবসায় ভাগ বসায় তাই অনেক কাল আগে থাকতেই খুনি-ডাকাত-মস্তানদের জীবনবীমা আরম্ভ হয়ে গিসলো।পরে তো খুনি ধর্ষক আর ডাকাতরা বিধায়ক আর সাংসদ হয়ে যেতে লাগলো, খাদি-খদ্দরে ধবধবে।

হেমেনকে শেষে শায়েস্তা করলে গৌরীবাড়ি পাড়ার মেয়েরা। পাড়ায় বিনে পয়সায় কোচিং চালাত লাবু স্যার, একটু খোঁড়া।সবাইকে নানা রকমের কাজে সাহায্য করত লাবুবাবু। সবচে শ্রদ্ধেয় লোক ছিল পাড়ায়। লোকে লাবুকে এতো ভালোবাসছে শ্রদ্ধা করছে দেখে হেমেন আর ওর কেল্টে-খ্যাংরাটে সাঙ্গো-পাঙ্গোরা একদিন লাবুবাবুর ছেঁড়া কলার ধরে হুমকি দিলে, কোচিং-ফোচিং বন্দ করো, যথেষ্ট ল্যাখাপড়া শিখিয়েচো পাবলিককে। লাবুবাবু তাতে কান দিলে না। না শোনার ফলে একদিন ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের সামনেই ফাইট-মাস্টার হাফ-কমরেড হেমেন মণ্ডলের হাতে কোচিং ভাঙচুর আর লাবুস্যারকে লাথি ঘুষি চেন সোঁটা মেরে-মেরে বেধড়ক হল। থ্যাঁতা লাবুবাবুকে দেখতে গলায় স্টেথোঝোলানো ডাক্তার এলে তারও হল রামপ্যাঁদানি আড়ংধোলাই।শেষে থাকতে না পেরে একজন গেরস্ত বউ জোর করে ডেকে নিয়ে এল আরেক ডাক্তারকে।হেমেনরা আবার ট্যাঁ-ফোঁ করতেই পাড়ার সমস্ত বউ মেয়ে বুড়িরা হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে গাছকোমরে নামল রাস্তায়। জনদরদী সরকারের বরকন্দাজরা হেমেনকে বাঁচাতে গেলে তাদেরও জুটল চটিপেটা আর গুঁড়োলংকা। কমরেডরা পোঁদে গু নিয়ে দেদ্দৌড়।হেমেন-রাজ ফুরোলো।

পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের বোধ আর সংবেদনকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়ে গেছে রুণু গুহনিয়োগী-হেমেন মণ্ডলের দলবল।মর্গের আর ভাগাড়ের বেওয়ারিশ লাশের কংকাল বিদেশে চলে যাচ্ছে বিক্কিরির জন্যে।গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে দিয়ারায় নিয়ে গেলেই হল। ওই তো, নিজের চোখেই দেখেছে অরিন্দম, মুর্শিদাবাদের ট্যুরে গিয়ে।হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে জমির খেয়োখেয়ির ছোরাছুরিতে কাঙালি শেখের বারো বছরের ছেলে হাবল শেখের হাত কেটে দিলে কংরেসিরা।সেই কাটা হাতটা বাজারের থলেতে পুরে জেলা আর মহকুমা আধিকারিকদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল এসিউসির ছেলেরা।ওই কাটা হাতটা দিয়েই একজন অনুসন্ধিৎসুর গালে চড় কষিয়ে দিলে।

.

অভিনয়ের অ আ ক খ শিখছে এমন এক নিরক্ষর নোংরা আজীবন চান করেনি নাকে পোঁটা খয়েরি-চুল বালিকা ওদের দিকে নখপালিশ-ওঠা হাত বাড়িয়ে আনুনাসিক প্রার্থনা জানাতে আরম্ভ করলে, অরিন্দমের হুঁশ হয়, আবোল-তাবোল ভাবছিল ও, ছি-ছি!

আমরা কি তাহলে মাঝপথে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব পাতানোর অনুষ্ঠান করব? যিশুর কথায় অরিন্দম বিব্রত। কেটলিউলি নিজের থুতনি একবার বাঁ-কাঁধে আরেকবার ডান-কাঁধে ঠেকায়।

পাশ দিয়ে চটাং-চটাং কথা বলতে-বলতে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল চলে যায়।সামনের দোকানটায় ন্যাতানো জিলিপির ওপর হাওয়ায় দোল খাচ্ছে ভিমরুল পরিবারের বালক-বালিকা।শালপাতার ওপর মাছি-সমাজের ভনভন গ্রাম পঞ্চায়েতের বখরা নিয়ে ঝগড়া। একটা সাদা-বাদামি কুকুর আস্তাকুঁড়ে চর্বিত চর্বনে একাগ্র।সাদা লংক্লথে জড়ানো শিশু আর গোটানো শীতলপাটিসহ গোটা তিরিশেক উদাসীন টুপি-লুঙ্গি দল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে অরিন্দমের কোমরে ডান বেড় আর কেটলির হাত বাঁ-হাতে নিয়ে পার্ক-করা গাড়ির দিকে এগোয় যিশু।

মুলমানদের নীরব শবযাত্রার শোক বড্ড ছোঁয়াচে।আর শবযাত্রায় নেতৃত্ব সব সময়ে এক মৃতদেহের।মৃত্যুর কি যাত্রা সম্ভব? আমাদের এই কালখণ্ডটা শবযাত্রার।দাদু-ঠাকুমার কাল ছিল তীর্থযাত্রার।আমরা মডার্ন হবার যোগ্য নই।ওদের দুজনকে নিয়ে যেতে-যেতে ভাবছিল যিশু।

ধুৎ, ভাললাগেনা।কেটলিউলির কথাগুলো কাঁপে থরথর।ঝটকায় হাত ছাড়ায়।

পায়ের কাছ থেকে জিলিপি-ভেজা ঠোঙা তুলে নিয়ে যায় কাগজ-কুড়ানিয়া বাতাস। মেয়েটির উক্তিতে অরিন্দম একশা, হকচকায়।বাচনভঙ্গীর সঙ্গে মানানসই পুরু তাঁমাটে ঠোঁট।ওপরের ঠোঁটের ওপর, নাকের তলায়, কয়েক ফোঁটা ঘাম।হয়তো কেকের ময়দা ঠাসার পরিশ্রম।

ভ্যানিলার ভারাতুর গন্ধের আদর কাটিয়ে, গাড়ির ডিকি তুলে জুতো-মোজা খুলে ঢোকায় অরিন্দম, আর কোলহাপুরি বের করে পরে।

রাস্তার কলে ও, অরিন্দম, হাত-পা ধুতে গেলে, কেটলিকে যিশুর ফিসফিস।কী ভাবছে, বলতো, অরিন্দমটা।নির্ঘাত চটবে আমার ওপর।তোর কথা শুনেই এসেছে ও।বলছি তো, ওর মতন লোক আজকাল দেখা যায় না।তুই-ও অনেক লক্ষ্মী মেয়ে, বলেছি ওকে।

ভালো লোক বললে চরিত্রের ওপর অসহ্য চাপ পড়ে।অরিন্দম নীল বর্ডার দেয়া ধবধবে রুমালে হাত মুছতে-মুছতে এসে, ওদের কাছ-ঘেঁসে দাঁড়াতে, কেটলিউলি অরিন্দমের মুখে কনকনে চাউনি ফেলে জানতে চায়, কেনই বা যাব তোমার সঙ্গে?

কথাগুলো একযোগে অরিন্দমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরে ফেলতে চায় ওর সযত্নলালিত সততাকে।দৃষ্টি স্থির রাখে অরিন্দম।সরাসরি তাকায়। একবারও পড়তে দেয় না চোখের পাতা। ওদের দুজনকে তো বটেই, নিজেকেও স্তম্ভিত করে ওর অনুচ্চস্বর ঘোষণা: তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।

কেটলিউলি ভাবার সময় নেয় না। যেন প্রস্তাবের উত্তর আগে থাকতে নির্ণীত। কিংবা চিন্তার দ্বারা কলুষিত হবার আগেই প্রশ্ন তোলে।কুতো দিনের জন্য?

অরিন্দমের কানে কালো, মসৃণ-ডানা, ঝিঁঝির অদৃশ্য কলতান আটকে যায়।ওকে চাপা না দিয়ে একটা বেসরকারি বাস চলে গেল পাশ কাটিয়ে। টের পায় মগজের মঞ্চে অস্থিরতার ঝিঁকা নাচ। ফুসফুসের মধ্যে কোথাও নিজের ডাকের পুনরুক্তি দিয়ে আবহকে উত্তেজিত করছে কোকিল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ও, অরিন্দম, বাতাসের অদৃশ্য মৃগশিশুরা দুধ খেতে নামছে কেটলিউলির সদ্যোদ্ভিন্ন হৃদ্যতায়। ওর মনে হল, কেটলিউলির মেরুতে বার্তা পৌঁছে দেবার ভাষা ওর আয়ত্বে নেই।হিন্দি আর বাংলা সিনেমা-ও কেটলিউলির কাছে প্রেম-ভালোবাসাকে হাস্যকর আর ফালতু করে দিয়ে থাকবে।

প্রেমের সমস্ত অভিব্যক্তিকে ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে আধুনিকতা।

ওই অশথথ গাছটা যতদিন বাঁচবে, বলল ও, অরিন্দম, মেরুন-সবুজ স্বচ্ছ নৃত্যপটিয়সী অশথথপাতায় খেলতে-থাকা নিরুচ্চার রোদ্দুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে, বলল ও, আমি আজকে, এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই, বলল ও, বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই, বলল ও, আমি যে-কোনো প্রথায় বিয়ে করতে রাজি, বলল ও, আমি ঠান্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তেই এসব কথা বলছি, বলল ও, আমি সব রকম ঝড়ঝাপটা পোয়াতে তৈরি, বলল ও, আমাদের বাড়িতে কেউই আপত্তি করবে না, বলল ও, মায়ের বরং আনন্দই হবে, বলল ও, তুমি তোমার মহাকরণের কাজ ইচ্ছে করলে বজায় রাখতে পারো, বলল অরিন্দম।

যিশু থ, বোধহয় মুগ্ধ। যৌন সম্পর্কের শ্রেণিবিভাজন কি সত্যিই মুছে ফেলা যায়? আবেগকে এতকাল বারংবার অবজ্ঞা করার দরুন ওর নিজের গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয়গুলো মুলতুবি থেকে গেছে, তামাদি হয়ে গেছে। অরিন্দমের এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই আর কেটলিউলির 'কুতো দিনের জন্য', আত্মসমর্পনের এই আঘাত-প্রত্যাঘাত ওকে তীব্র চোট দিয়েছে।কপালে বরফের থান ইঁটের মতন।প্রতিভা তো সকলেরই থাকে, কিন্তু যে নির্বোধ অজানার আহ্লাদে টেনে নিয়ে গিয়ে মানুষের টুঁটি চেপে ধরতে চায় তার প্রতিভা, সেখানে একা ঢোকার সাহস, সবায়ের হয় না।

গটগটিয়ে গাড়িতে বসতে গিয়ে দরোজা বন্ধ পায় কেটলিউলি। বিড়ম্বিত মুখশ্রী দেখে অরিন্দম দ্রুত তালা খুলে সামনের সিটে বসতে আহ্বান জানায় দুজনকে।

কেটলিউলি বসেছে চালক অরিন্দমের পাশে।

যিশু বলল, আমি পেছনে বসছি।অরিন্দম গাড়ি ঘোরায়।

বাবুরা দিনদুপুরে চললেন পিগনিগ কত্তে, শালা মটোরগাড়ির রোয়াব দেকাচ্চে।মন্তব্য ঝাড়ে রোগাটে কালচে ধুতি-পাঞ্জাবি, কটমট।যিশু বলল, ইনিও গরিব হওয়া ভালো, সর্বহারা হওয়া ভালো, ইংরেজি না শেখা ভালো ইত্যাদি ইশকুলের সদস্য।

অরিন্দম পালটা মন্তব্য করে, কলকাতায় বাঙালির গাড়ি থাকাটা গণশত্রুতা।

যিশু: আমরা কি তাহলে এখন বিয়ে কত্তে যাবো?

কেটলি : হ্যাঁঅ্যাঅ্যঅ্যা।কুথায় যাবো?

যিশু : খ্রিস্টান হলে আমি আজই চার্চে ব্যবস্থা করে ফেলতুম।ব্যাপটাইজ করতেও সময় দরকার।রেজেস্ট্রি করতে চাইলেও তো নোটিশ দিতে হবে।যাবার পথে না হয় নোটিশটা দিয়ে যাওয়া যাক, কী বলো? তোমার হিন্দু মতে তো পাঁজি-পুরুতের ঝক্কি। মহারাষ্ট্র মণ্ডল কিংবা তামিল সমাজমকে খর্চা-খরচ দিলে ওরা ইন্সট্যান্ট ব্যবস্থা করে শুনেছি। তোমার মুসলমান বা বৌদ্ধ বন্ধুবান্ধবদের নক করে দেখা যেতে পারে। তার চেয়ে আমিই না হয় পুরুত হয়ে যাই, এক সঙ্গে বাঁচা নিয়ে তো কথা।ও, না, আজকে অনেক কাজ আছে আমার; পরশু আমার কার্ডামম রিপোর্টের প্রেজেন্টেশান। গিয়ে ইকুইপমেন্টগুলো চেক করে রাখতে হবে।

যিশুর ফ্ল্যাটে ছোটো ঘরটায় টেবিলে আর দেয়ালে বসানো আছে নানা যন্ত্রপাতি, দেখেছে অরিন্দম। বাঙালি কর্মীদের চেয়ে যন্ত্রপাতিকে বেশি বিশ্বাস করে ও। ঘরটায় একা বসে নিজের রিপোর্টের বিশ্লেষণ করে শোনায় জাপান বা আমেরিকার কোনো কোম্পানির বোর্ড সদস্যদের, যারা কাজটার ঠিকে দিয়েছে।তারা প্রশ্ন তোলে।যিশু উত্তর দেয়। প্রকল্প বা প্রস্তাব তক্ষুনি অনুমোদিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়, কিংবা আবার বাড়তি তথ্য যোগাড়ে বেরোতে হয়, নতুনভাবে অনুমোদনের জন্যে। হলে ওর মোটা লাভ। না হলে মন খারাপ। প্রচণ্ড খাটে।নিয়ন্ত্রণ না করলে কাজ সবসময় দক্ষের দিকে, মানুষের দক্ষযজ্ঞের সক্ষমতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে মানুষকে ঘিরে রাখে। যারা নিকৃষ্ট আর ফাঁকিবাজ তারা তাদের অক্ষমতার কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে আর ক্রমশ রূপান্তরিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠে।

অ॥আমি তো ধর্মহীন আস্তিক।

যি॥কেটলি তুই কী বলিস?

কে॥ঘুড়ার দৌড় দেখতে যাবো।

যি॥তুই দৌড় দেখতে চাস, না রেস খেলতে চাস? মাঠে না গিয়েই রেস খেলা যায় রাসেল স্ট্রিটে টার্ফ ক্লাবের কাউন্টারে।

কে॥ঘুড়াও দেখে নিবো, রেসও খেলে নিবো।

যি॥আমাকে তাহলে পার্কস্ট্রিটে নামিয়ে দাও অরিন্দম।পার্ক সার্কাস বা ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে ঢোকার সময় আছে এখনও। টাইমে পৌঁছোতে পারলে কাজ হয়। নইলে সেই আবার ঘুরপথে চৌরঙ্গি দিয়ে ঢুকতে হবে।

কে॥ চলো না কাকুদা, আমরাদের সঙ্গে। খেলা জিতে নিবো আর চলে যাবো শশুরবাড়ি।হি-হি।

যি॥আগে তো জিতগে যা। আজকে আমার সত্যিই অনেক কাজ আছে। তার ওপর আমার ম্যান ফ্রাইডেটা বাড়ি যাচ্ছে। ওদের গ্রামে টেনশান শুরু হয়েছে আবার। বেচারা কীর্তনিয়া।

অ॥সেই বাঙাল ছেলেটা? কী হল ওর? এইজন্যেই আপনার পুরোদস্তুর অফিস খোলা উচিত ছিল।ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টেন্ট, ডাটা এনট্রি অপারেটর এসব রেখে।অঢেল টাকা তো রোজগার করেন।

কিছুক্ষণ থম মেরে যায় যিশু। তারপর আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতাউত্তর পল্লিসমাজের অকথ্য রূপকথা।শোনার জন্যে গাড়ির গতি কমায় অরিন্দম।

উত্তর দিনাজপুরের অন্ত্যজ উদবাস্তু গ্রাম ভাঙাপাড়ায় ওর বাড়ি।উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোর নামও স্ট্রেঞ্জ। ভাঙাপাড়া, মাথাভাঙা, ফাটাপুকুর, রাজাভাতখাওয়া। ওদের গ্রাম থেকে আমিই এনেছিলুম ছেলেটাকে। একদম রঅঅঅ। এখন তো ও আর থাকতে পারে না গ্রামে গিয়ে। গ্রামটা একেবারে অজ পাড়াগাঁ, অলমোস্ট এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে। পার্টির দলাদলি ছাড়া অন্য কোনও রকম আধুনিকতা নেই।

গত বছর ওদের গ্রামের চালকলটায় আর সেখানকার শদেড়েক কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে আটজনকে পিটিয়ে গলাকেটে খুন করেছিল পাশের টুনিভিটা গ্রামের মাহাতোরা। পাঁচশো মাহাতো, হাতে মশাল নিয়ে দৌড়ে আসছে, কী ভয়াবহ।তোমাদের বিহারের খুনোখুনি তো এর কাছে নস্যি। পাঁআআআচ শোওওও লোক হাতে মশাল নিয়ে চ্যাঁচ্যাতে-চ্যাঁচাতে এগোচ্ছে একটা গ্রামের দিকে, ভাবতে পারো? শরৎ চাটুজ্জে তো এই সিনারিও নিয়ে এপিক লিখে ফেলতেন, একশট আফিম মেরে।বিগ বাজেট হিন্দি ফিল্মও হতে পারে; পাঁচশো গব্বর সিং দাঁত বের করে ছুটে আসছে।

বুঝলে? একটা কোলের বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আগুনে। পড়পড় করে পুড়ে ঝামসে কালো হয়ে গেল জলজ্যান্ত তুলতুলে বাচ্চাটা। বুঝলে? টুনিভিটার মহাজন সুরেন মাহাতোর লাশ আগের দিন পাওয়া গিয়েছিলো ভাঙাপাড়া গ্রামে।গ্রামে-গ্রামে ব্যাংক খুলে মহাজনদের খুব সুবিধে হয়েছে। কী বলছিলুম? হ্যাঁ। অজিত বালা নামে একজন চালকল মালিকের কাছে মোটা টাকা পাওনা ছিল সুরেনের।

আমার কাজের ছেলেটার বাবা-মা আর বোন এসে ছিল আমার ফ্ল্যাটে। বিহারের বলরামপুর থেকে লাঠিয়াল এনেছিল মাহাতোরা। তাদের হাতে লাঠি, বল্লম, সড়কি, টাঙি, বাঁশ, শাবল, জেরিক্যানে পেটরল। ওই সমস্ত অস্ত্র নিয়ে পাঁচশো লোক, ছুটে আসছে, হই-হই করতে-করতে, বুঝলে? জাস্ট ভিজুয়ালাইজ। ভাঙাপাড়ার জোতদার বুধন মাহাতোর হাজার খানেক বিঘে জমির বেশিটাই খাস হয়ে গিয়েছিলো।ভাঙাপাড়ার রিফিউজিরা কেউ-কেউ পাট্টা পেয়েছিল। গোলমালের পাণ্ডা ওই বুধনটাই। ওর ছেলে ব্রহ্মদেবকে ধরেছিল পুলিশ।আরে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তো সব আদিত্যর কার্বন কপি।

ভাঙাপাড়ার পরিবারগুকো ধান থেকে চাল বানিয়ে বিক্কিরি করে।ধান কোটে বলে ওদের বলে কুটনি। মহাজনদের কাছ থেকে দাদন ছাড়া ওদের চলে না। কবে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই সাতচল্লিশ সালে। অনেক কুটনির অবস্থা সামান্য ফিরেছে। অনেকে আবার রয়ে গেছে উদবাস্তু, অলমোস্ট কাঙালি।এদিকে জমির দামও বেড়েছে তরতর করে। মাহাতোরা তো ব্রিটিশ আমলের জোতদার। ধার দিয়ে, লোভে ফেলে, ভয় দেখিয়ে, আবার হাতাবার তালে ছিল জমিজমা। মাহাতোদের দলে ভিড়েছিল পলিয়া জাতের লোকেরা, ওরাও ল্যান্ডেড ক্লাস। এরা ঝাড়খণ্ডিদের মতন উপজাতি নয়।

ভাঙাপাড়ার নমঃশুদ্র উদবাস্তুদের চেয়ে উঁচু জাতের লোক এই চাষাগুলো, আমার মনে হয় বিহারের কুর্মি।

জমিদারি আমলের মতন ধার-দাদনের কাগজে টিপছাপ আজও চলছে। পঞ্চায়েতেও তো জোতদার, মহাজন, মাহাতোদের দখলে। খুনোখুনির পর ব্রহ্মদেবটা তো হাওয়া হয়ে গিয়েছিলো।আর ধরাটরা পড়েনি বোধহয়।ওদিকে সমবায়-টমবায় বলে কিছু নেই। মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়ার মতন সমবায় ব্যাপারটা মাটি পায়নি উত্তরবঙ্গে।এনজিও নেই বলেই মনে হয়, জেলা সদরে যা জেনেছি।এনজিও গঠন করতে গেলেই খুন হবে, আসামে মাজুলি দ্বীপে সঞ্জয় ঘোষের মতন।বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাবুদের কথা তোমায় আর কী বলব।তোমরা তো ওদের মালিক।লাইসেন্স দাও, ইন্সপেক্ট করো।

দেশভাগের পর বামুন, কায়েত, বদ্যি যারা এসছিল, কেউ আর পড়ে নেই। সব্বাই দিব্বি গুছিয়ে নিয়েছে।উদবাস্তুদের নেতা হয়েছে।রাজনীতিরও দখল নিয়েছে।কিন্তু মার খেয়ে গেল অন্ত্যজরা। উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তো ওদের জমিজমা সব শিখ সরদাররা হাতিয়ে নিয়েছে ; আন্দামানে গিয়েও উপনিবেশ গড়তে দেয়া হয়নি।

আচমকা ওদের সঙ্গিনী জিগ্যেস করে ফ্যালে, কুন দেশ গো?

এই নিষ্পাপ অজ্ঞানতা বজায় থাকুক।আধুনিকতার কলুষমুক্ত থাকুক, ভেবে, অরিন্দম বলল, কোন দেশ আবার, তোমার দেশ।

না-না, আমরাদের দেশ নয়। আমরা ঝগড়া করি না। মেয়েটির দুচোখে ড্যাবড্যাবে গরিমা।

তাই জন্যে তোর বিয়ে দিচ্ছি অরিন্দমের সঙ্গে, ও-ও মহাক্যাবলা, ঝগড়া-ফগড়া করতে পারে না, বলল যিশু, প্যাকেটে সিগারেট ঠুকতে-ঠুকতে।

তুমি সিগ্রেট খাও না? অরিন্দমের কাছে জানতে চায় বাগদত্তা।

না, আমি পান সিগারেট মদ গাঁজা কিচ্ছু খাই না।

ঠিক, তুমি বোকা।অরিন্দম সম্পর্কে বাগদত্তার মূল্যায়ন।

যিশু ওর পল্লিকথার পরবর্তী পর্ব শুরু করে।

গ্রামটায় থেকেছি আমি। প্রাইমারি ডাটাবেসের লোভ আমি সামলাতে পারি না, জানোই। কুটনিদের পুরো তথ্য আছে আমার কাছে। আনবিলিভেবলি গরিব এই লোকগুলো।একচালা, হোগলা, চ্যাঁচারি, ডিগডিগে, ক্যাঁতরা-কানি, লালচাল, জলেতে তেলের গন্ধ, পানাপুকুরে চান, নোংরা ছোটোছোটো মাছ আর শাকশেকড়।আমার তো পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।বুঝলে! তাও আবার পায়খানা নেই।মাঠে হাগতে যাও।

হি-হি।

এই, হাসিসনি।

লোকাল রাজনীতিকরা মাথা গলায়নি? জানতে চেয়েছিল অরিন্দম।

আরে তা আর বলতে।প্রান্তিকের সংঘর্ষ মানেই রাজনীতি, আই মিন পার্টি-পলিটিক্স। সিটুর কুটনি ইউনিয়ানের বিবেকানন্দ কীর্তনিয়া বলেছিল, গণহত্যার পুরো ছকটা সিপিয়েম নেতা হরেরাম মাহাতোর। সিপিয়ের সাংসদ সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছিল, হরেরাম নির্দোষ, আসলে জোতদাররা জমি কাড়তে চাইছে। জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বীরেশ্বর লাহিড়ি বলেছিল, জোতদার-মহাজনদের কথায় ওঠবোস করি না আমরা।বিজেপির শ্রীধর মল্লিক বলেছিল, পেটরল এসেছে মাহাতোদের চালকল থেকে। কলকাতায় তখনকার কংরেসের মানস ভুঁইয়া বলেছিল, যারা খুন হয়েছে তারা সবাই কংরেসের। আরেসপির জেলা সম্পাদক জ্যোতিষ সরকার বলেছিল, আরেসপির প্রভাবশালী নেতা ছিল টুনিভিটা গ্রামের সুরেন মাহাতো। কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ভাঙাপাড়ায় গণশ্রাদ্ধের দিন বলেছিল, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।ব্লক আধিকারিক অশোক সাহা বলেছিল, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্যে তেরপল আর কাপড় কেনা হচ্ছে। দিনাজপুর-মালদা রেঞ্জের ডি আই জি অশোক সেন বলেছিল, হত্যাকারীদের খোঁজ চলছে।জেলার পুলিশ সুপার দেবেন্দ্র সুকুল বলেছিল, অবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। জেলাশাসক পবন আগরওয়াল বলেছিল, গ্রামবাসীদের মাথাপিছু ষাট টাকা নগদ, শুকনো খাবার আর জামাকাপড় দেয়া হবে।প্রতিমন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিল, শোকমিছিল বার করলে অশান্তি হবে। আরেসপির স্থানীয় নেতা রমণীচন্দ্র ঘোষ বলেছিল, বুধনের ছেলে ব্রহ্মদেব তো কংরেসের লোক....

তুমি কী বলেছিলে? সঙ্গিনীর রাগি প্রশ্নে দুজনেই স্তম্ভিত।

যাক বাবা, আমার বাড়ি এসে গেল।জবাব এড়াবার সুযোগ পেয়ে সত্যিই প্রীত হয় যিশু।দোর খুলে, বাঁ পা বাড়িয়ে, চুলের টেরি বাঁচিয়ে নামে।নেমে, সামনের জানালায় ঝুঁকে, মেয়েটি ওর কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারবে না জেনেও বলে, বুঝলি, আমরা সাধারণ লোকেরা মহলায় প্রক্সি দিই, কিন্তু আসল নাটকটা করে অন্য লোকেরা। আমাদের এই পাড়ায়, পার্ক স্ট্রিটে, বুঝলি, সক্কালবেলা একজন লোক কাক আর কুকুরদের আও আও আও আও, কানি আও, লেংড়ি আও, ডাক পেড়ে-পেড়ে রুটির গোছা খাওয়ায়।

হি-হি।

একদঙ্গল মেট্রোপলিটান কিশোরী রাস্তা দিয়ে ঢলঢলে বুক ফুলিয়ে যেতে-যেতে, হাই আংকল, চেঁচিয়ে হাত নাড়ায় যিশুকে।নজর ওদের কেটলিউলির দিকে।

অরিন্দম : আমিও কাল থেকে আপনাকে কাকুদা বলে ডাকব।

যিশু : কালকে কেন? এখন থেকেই বলো।

অরিন্দম : আগে বিয়েটা করি।

যিশু : সত্যি? না খাঁটি সত্যি? কোনটা? আচ্ছা চলি।

গাড়ি থেকে নেমে, শনিবারে প্রাক-দুপুরে, সওদাগরি পাড়ায়, হঠাৎই দরাজ হয় যিশুর গলা।মোন মোর উড়াং বইরং করে রেএএএএ....।উত্তর দিনাজপুরে শোনা।

ইশ রে, আবার গান!

.

১৫.

তপসিয়া সাউথ রোড, বাইপাস, তিলজলা রোড, দিলখুশা স্ট্রিট, পার্কসার্কাসের মোড়ে পাক খেয়ে পার্ক স্ট্রিটে যিশুকে নামাবার পর আউটরাম রোডে বাঁক নিয়ে ক্যাসুরিনা অ্যাভেনিউতে পড়ে গাড়ি।

সদ্য-পরিচিতির আগল ভাঙার আগের নিশ্চুপ মুহূর্ত। কে কী কথা বলবে। আবার অভিব্যক্তির সমস্যা হয় অরিন্দমের।

দু'পাশ জুড়ে পান্নাসবুজ। পিঠের ওপর থেকে রোদ্দুরকে ঘাসে ফেলে দিয়ে ছায়ায় দাঁড়ায় অরিন্দমের অ্যামবাসাডর গাড়ি। টুলবক্স খুলে একটা ছোট্ট হলুদ বই কেটলিউলির দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার স্টার্ট দেয় গাড়িতে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ি বেগবান।

পাতা উলটিয়ে ঘুড়ার ছবিগুনো দ্যাখে মেয়েটি। দেখে, রেসের বইটা রেখে দ্যায় টুলবক্সে।শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে নিঃশব্দে।উপভোগ করে নিজের হাসি।

অরিন্দমের মনে হল, শরীর থিরকিয়ে এই যে হাসি, এভাবে দেহময় প্রতিভাদীপ্ত হয়ে ওঠা হাসি, দেহকে দেহাতীত করে দিচ্ছে, যেন ভরসন্ধ্যারআহামরি জোনাকিরা অন্ধকারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছে। ও, অরিন্দম, বলল, কী হল? ঘোড়া পছন্দ করো।

পড়তে জানি না।

কেন? ইশকুলে ইংরেজি শেখায়নি?

বাংলাও পড়তে পারি না।কুনো ইশকুলে পড়ি নাই গো।আমি লিখাপড়া জানি না।

অরিন্দম টের পায় ও সজোরে গাড়িতে ব্রেক মেরেছে। কিঁইইইচ। হসপিটাল রোডে ঘাসের কিনারে থামে গাড়ি।ভীত শঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, অ আ হসসোই দিরঘোই কিচ্ছু জানো না?

মেয়েটি আলতো মাথা নাড়ায়।

দিকে-দিকে সাক্ষরতার এতো গল্প, গ্রাম-শহরের দেয়ালে-দেয়ালে সাক্ষরতা সফল হবার ছড়া, অথচ কলকাতা শহরে একজন তরতাজা তরুণীর সঙ্গে বাংলা অক্ষরের পরিচয় হয়নি। শিলেট-পেনসিল নিয়ে কেউ সঙ্গে বসেনি কোনওদিন। হাতেখড়ি হয়নি। হাজার -হাজার বাংলা শব্দের মানেই জানে না। অবিশ্বাস্য। টেরাকোটা রঙের ওই পুরু ঠোঁট উচ্চারণ করেনি আজ ওব্দি কোনো লিখিত অক্ষর। অবহেলা অনাদর অভাবে স্ফূরিত অজ্ঞান নিরক্ষর ঠোঁট।

কী দেখছ গো?

তোমার কানের লতি পাটিসাপটার মতন তুলতুলে।

লিখাপড়া শিখে নিবো।

আমার মাও লেখাপড়া জানত না।পরে শিখেছে।

আজকা একটা সিনেমা দেকবো, কেমন? বালকুনিতে?

আমাদের বাড়িতে টিভি-ভিসিআর আছে। বাড়িতে বসে যত ইচ্ছে সিনেমা দেখতে পারবে।

অরন্দম দেখল, ওর সামনের দুটো চোখের জলাশয়ের ওপর জোনাকি উড়ছে।গাড়ির কাচে সানফিল্ম লাগানো ; পিছনের দরোজাদুটোর কাচ তোলা ছিল।ড্রাইভারের দিকের কাচ দ্রুত তুলে দিয়ে অনুসন্ধিৎসু মেয়েটির দিকে নিষ্পলক তাকায় অরিন্দম।সামনের দিক থেকে যে গাড়িটা আসছে, সেটা এখনও অনেক দূরে।ছোট্ট পুরু ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট একবার আলতো ছুঁইয়ে নিয়েছে অরিন্দম।

মেয়েটি চোখ বুজে জড়িয়ে ধরেছে ওকে, আর বলে উঠেছে, আমার আচকা লজ্জা হয়।

অরিন্দমের কনুই লেগে হর্ন বেজে ওঠে। বাতাসের পরতে লুকিয়ে-থাকা অদৃশ্য প্রতিধ্বনিরা হর্নের শব্দে কেঁপে ওঠে আচমকা।মেয়েটির হাঁ-মুখ থেকে বিকিরিত খুদের জাউয়ের পান্তার অচেনা সোঁদা গন্ধে অরিন্দম মুগ্ধ, সন্মোহিত। শিহরণ চাউর হয় রোঁয়ায়-রোঁয়ায়।

স্টার্ট দেয় গাড়ি।গাছের ফাঁকে-ফাঁকে দৃশ্যমান আকাশে সপারিষদ উড়ছে চিলপুরুষ।

রেসকোর্সে পৌঁছে, গাড়ি থেকে নামার আগে, রেসের গাইডবইটা আবার বের করে টুকিটাকি পরিচয় করায় অরিন্দম।ফিলি, জকি, ঘোড়ার মালিক, দূরত্ব, চাম্পয়ান কাপ, ট্রেবল, টানালা, জ্যাকপট, আউটার সাউন্ড।মাদি ঘোড়াগুলোকে ট্রেনিং দিয়েছে কারা। ঘোড়ার জাত।ঘোড়ার বংশতালিকা।

কেটলিউলি হতবাক।

দিল্লি আর ব্যাঙ্গালোরে বারোশো মিটার জিতেছে, এই ঘোড়াটার নাম জ্বলন্ত চুমু।

হি-হি।

এর নাম তোপের গোলা, ঘোড়সওয়ার রুবেন, ওজন ষাট কেজি, কলকাতায় চোদ্দোশো মিটার জিতেছে।সব নামই রেজিস্ট্রি-করা, অন্য কেউ দৌড়ের ঘোড়াকে এই নাম দিতে পারবে না। অনেক ঘোড়া আছে, নাম শোনো। ক্লাসিক অ্যাফেয়ার, অ্যাপোলোনিও, হার্ডিলা, ডানসিং কুইন, ইয়েনা, ফ্ল্যাশ গর্ডন, সান শ্যাক, অলস্টার, জেরিজ ফ্লেম, ওকহিল, সানফ্ল্যাগ, কিং র‍্যাট, টলারেন্স, কোপাকাবানা, কার্নিশ প্রিন্স।কোন ঘোড়াটার টিকিট কিনব?

আমি কী জানি! বাংলা ঘুড়া নাই?

ওদের পাশে একটা ঠাসাঠাসি ট্যাক্সি এসে থামে।তর্করত পাঁচজন জুয়াড়ির কথা শোনা যায়। মফসসল থেকে বোধয়। শ্যালদায় নেমেই ট্যাক্সি ধরেছে। হয়তো ফি-হপ্তা ট্রিপ মারে।মোটা লোকটার হাতে রেসের বই।রেসুড়েদের চেহারাটা তেলচোয়াড়ে হয় কেন কে জানে! নিজেকে এদের সমগোত্রীয় ভেবে বিসদৃশ লাগল অরিন্দমের।

প্রথম জুয়াড়ি: অ্যাপোলোনিয়ারের মা ব্রিটিশ।ডার্বি জিতেছিল, জানেন তো গোরাদা।

দ্বিতীয় জুয়াড়ি: তোদের বাঞ্চোৎ মা-বাপের সদবংশে না হলে চলে না, না রে শশী? জুয়া হল একটা জীবনদর্শন, বুজলি।জেতার ঘোড়ার শ্রেণিই আলাদা, খুব উঁচু জাতের হয়।এ তোর পার্টিবাজির শ্রেণি নয়, বুজলি।আমি শালা হেরো হতে চাই না।জিদবো, তবে ছাড়বো।

তৃতীয় জুয়াড়ি : আসার সময়ে প্রতাপবাবু এই অ্যাপোলোনিয়ারের টিপস দিয়েছে সুখেনকে।গৌরাঙ্গ, অমরনাথ, কুমুদবাবু, বিরেন সিংহি সবাই একটা কতা বারবার করে বলে দিয়েচে।ঘোড়াটার আঁত্তা একেবারে ঝড় দিয়ে গড়া।সালা যেন জেলাধিপতি।মাথা বাঁয়ে কিন্তু দেকচে সামনেদিকে।

চতুর্থ জুয়াড়ি : অমর প্রেম জকির সিক্স টু ওয়ান যাচ্চে, জানিস তো ব্রহ্মানন্দ।

পঞ্চম জুয়াড়ি : সবাই আলাদা-আলাদা ঘোড়ায় লাগাই, সেইটেই ভালো, যারটা লাগে লাগবে।কে যে জিদবে বলা যায় না।

লোকগুলো চলে গেলে, গাইডবই খুলে অরিন্দম বলল, হ্যাঁ, জকি অমর প্রেমের ঘোড়াটার নাম অ্যাপোলোনিয়ো।আরও সব জকি আছে।ব্রিজশা, কুমার, আলি, কামিল, প্রসাদ, রাবানি, যাদব, সুনীল সিং, খান, শ্রফ, প্যাটেল, রাজ্জাক, আলফ্রেড।তোমার কোন ঘোড়সওয়ার পছন্দ?

কে জেতে গো? ঘুড়া, না ঘুড়ার পিঠে যে বসে?

জিতি আমরা, যারা খেলতে এসেছি।

আমরাদের কুন ঘুড়া?

তুমি তো বললে না।তুমি গাড়িতে বোসথাকো, আমি বুকির ঠেঙে টিকিট আনছি।

না না না না।একলা-একলা থাকবো না।

কাচ তুলে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিচ্ছি, ভয়ের কী!

রেসুড়েদের নমুনা দেখে কেটলিউলির এখানে আসা সম্পর্কে যে দ্বিধা জেগেছে তা উপভোগ করতে-করতে অরিন্দম প্রথম রেসের সবকটা ঘোড়ার টিকিট কাটে।

ঘোড়েল প্রৌঢ় বুকিক্লার্ক ওর দিকে অভিসন্ধির হাসি হাসে।প্রেমিকার সঙ্গে প্রথমবার? নাকি হনিমুন লাক-ট্রাই?

ফিরে এসে, গাড়ি খুলে, বন্ধ করে, কেটলিউলির ঘর্মাক্ত হাত ধরে ও, অরিন্দম।বন্ধ গাড়িতে ঘেমেছে।দিনভর কেটলি বয়ে-বয়ে কড়া পড়ে গেছে হাতে।বলে, আমার হাত

ছেড়ো না, ঠেলাঠেলিতে হারিয়ে যাবে। অরিন্দমের মনে হল, হাত ধরে না থাকলে কোনও মহাকরণবাসী বিরক্ত করতে পারে। ভাববে আস্পদ্দা তো কম নয়। স্রেফ হাত ধরে থেকেও তো শ্রেণিবদল ঘটানো যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে চাপা স্বরে বলল ও, অরিন্দম, আমিও খেলিনি কখনো, আজ প্রথমবার, প্রথম জুয়ায় সবাই জেতে।

জুয়া?

জুয়াই তো।

ভিড়ের মধ্যে ওর অফিসের প্রোটোকল আধিকারিক রাঘব সান্যালকে দেখতে পেল অরিন্দম। শুনল, ওর বউ রমাকে বলছে, অরিটা ঝি-চাকরানিদেরও ছাড়চে না আজগাল, শালা বিয়ে কল্লে না কেন আজ ওব্দি কে জানে। রমার কষ্টার্জিত মুখাবয়বে প্রত্যুত্তর ফোটে না। পাটনায় থাকতে, রাঘব যখন অফিসে কেয়ারটেকার আর অরিন্দম মামুলি কেরানি, টেলিফোন অপারেটর রমার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকটা এগিয়েছিল অভিসন্ধির অনুপযুক্ত অরিন্দম। জিতে-জিততে দান ছেড়ে দিয়েছিল, কেননা পাশের ফ্ল্যাটের অতসি বউঠানের মধ্যদুপুর বুকের সুরভিত স্নিগ্ধতা তখন অফিস পালাতে উৎসাহিত করছে অনভিজ্ঞ অরিন্দমকে। সমাজের আজ্ঞায় অসফল প্রেমিকের গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক।

প্রথম খেলার ঘোষণা হয়। ভ্যানিলার গন্ধ হারিয়ে গেছে এখানকার নারীদের দামি আর বিদেশি সুগন্ধে। কেটলিউলি দৃশ্যত কুণ্ঠিত। ঘোষিত হয় ঘোড়াগুলোর পরিচয়, জকিদের পরিচয়, ঘোড়া-মালিকের পরিচয়। জেতবার চাপা উত্তেজনা সবায়ের চোখে-মুখে।

আমরাদের কুন ঘুড়া?

যে ঘোড়া ওড়ে কিন্তু ডানা নেই।

পুলরুম থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ঘোড়ারা। হালকানীল জিনস-পরা নাশপাতি-নিতম্ব একজন মহিলা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিলবিলে আনন্দে স্পন্দমান তার গেঞ্জিঢাকা বুক। পাকাচুল সঙ্গীর মুখে অনুমোদনের হাসি। রেসুড়ে ধনীদুহিতারা তাদের যৌবন ধরে রাখে বহুকাল।

কেটলিউলির পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ভ্যানিলা। এতকালের সংস্পর্শে শরীরের গ্রন্থি থেকেই হয়তো নির্গত হয় ভ্যানিলা, ইচ্ছামতন।

ভ্যানিলা কী করে হয় জানো। মাথা নামিয়ে উড়ন্ত চূর্ণকুন্তলকে জিগ্যেস করে অরিন্দম।

কী করে? অপলক জানতে চায় মেয়েটি।

আলকাতরা থেকে।

ইশ রে। তোমায় বলেছে।

হ্যাঁ সত্যি। আলকাতরা থেকে পাওয়া যায় এথিল ভ্যানিলিন নামে একটা রস। তাকে স্টোক মেশিনে পরিষ্কার করে ভ্যানিলা হয়।সে ভ্যানিলা আমরা খাই।

কেটলিউলির চোখে অবিশ্বাস আর শ্রদ্ধা।

অরিন্দম শুনতে পায় চরাচর জুড়ে ধামসা, মাদল, ঝাঁঝ, শিঙা, চ্যাড়াপেটি, মদনভেরি, বাঁশি বাজছে। কলরোল তুলেছে হেঁতাল, গবান, গর্জন, গেঁওয়া, গোলপাতা, রাইন, পশুল, খলসি গাছের দল।

ছাড়া পেয়েই ছুটতে আরম্ভ করেছে ঘোড়াগুলো, ছোটাচ্ছে ঘোড়সওয়ার, রঠিন টুপি, চকরা-বকরা পোশাক। দাঁড়িয়ে পড়েছে দর্শকরা, কয়েকজনের চোখে দূরবিন, নিজের ঘোড়াকে ইংরেজি ভাষায় উৎসাহিত করতে থাকে।

বাতাসের ছোটো-ছোটো বাদামি টুকরোর ওপর লাগাম হাতে অর্ধেক উবু হয়ে বসে আছে ঘোড়সওয়ার।দর্শকরা নিজের গ্রীবাকে দীর্ঘ, দীর্ঘতর করছে, চ্যাঁচাচ্ছে।

সবুজ ঘাসের ওপর ছুটছে ঘোড়াগুলো।হাওয়ার দুর্গপ্রাকার ডিঙোবে বলে ছুটছে।খুরের ডুগডুগি বাজিয়ে ছিৎরে দিচ্ছে আধভেজা ঘাস। ছুটছে গা ঘেঁষাঘেঁষি। রোদ্দুরের চিলতেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বসতে দিচ্ছে না চামড়ায়।স্বমহিমায় উজ্জ্বল একের পর এক বাদামি ঢেউ উঠছে আর নামছে। ঢেউগুলোর ওপর রঙিন পলকা ঘোড়সওয়ার। সাংগীতিক মূর্ছনায় খুরধ্বনির শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর। ছুটছে ঘোড়াগুলো। ছুটছে ঘোড়াগুলো।ঝুরো ঝুরো হয়ে ভেঙে পড়ছে অদৃশ্য বাতাসের গমগমে প্রতিরোধ।

ছুটছে ঘোড়াগুলো। অজস্র মানুষের দ্রুতশ্বাস চিৎকারের অনধিগম্য প্রতিধ্বনি চিরে কালোবরণ বিদ্যুৎ। পৃথিবীতে যেন অর্গল বলে কিছু নেই। ওরা ছুটছে। ভাসমান বেতারকণার সঙ্গে সংঘর্ষে দেদীপ্যমান সূর্যলোক চলকে পড়ছে ওদের ঝকমকে বেগবান পেশি থেকে। চারটে পায়ের কোনোটা মাটিতে পড়ার আগেই বাতাস ওদের টেনে নিচ্ছে সামনে। গ্রীবা প্রসারিত। ছুটছে রূপসীরা। রঙিন পালকে গড়া ওজনহীন ঘোড়সওয়ার, লাল-নীল, চৌখুপি জামা, হলুদ ডেনিম-টুপি, বাঁধভাঙা ঝরনার ধাক্কায় ছিটকে এগোচ্ছে, কালচে-বাদামি নদীতে রূপান্তরিত ঘোড়াগুলো বাঁক নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না ওদের দ্রুত ধাবমান পা।ছুটচে ঘোড়াগুলো।কবকব কবকব কবকব

দোমড়ানো-পিঠ লাল নীল সবুজ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার একটিমাত্র ঝড়ের টুকরো।এগিয়ে আসছে।এগিয়ে আসছে।

পুরুষ আর মহিলা জুয়াড়িদের উন্মত্ত বাহবায় দৌড়ে এগিয়ে আসছে একের পর আরেক ঘোড়া। যত জোরে চ্যাঁচাতে পারে উত্তেজিত অগুন্তি মানুষ-মানুষি, উৎসাহিত করছে বাজিধরা ঘোড়াকে।শেষতম ঘোড়া আর তার ঘোড়সওয়ারের নাম করেও লোকে চিৎকার করছে, বাকাপ, বাকাপ,বাকাআআআপ। অরবিটিনো, বাকাপ, শলিশ গোল্ড, বাকাপ, বাকাআআপ, লরেনজো, চাং ফা, অ্যাকোয়া মেরিন, কানসাই, স্যান্ড ডান্সার, বাকাপ, বাকাপ, মডেস্টি ব্লেজ, শিনজুকু, টিকোরিয়া, গোল্ড লাইট, বাকাপ, বাকাপ, বাকাপ, বাকাআআপ, অ্যাপোলোনিয়ো, জোরে, আরও জোরে, অ্যাপোলোনিও, অ্যাপোলোনিও...ও...ওওওও....

চিৎকারের ঢেউ স্তিমিত হয়ে ফোঁপানি আর অট্টহাসিতে পালটে যেতে থাকে।ডবকাবুক কালো গগলস খুলে টিশ্যু দিয়ে চোখ মোছে হাততালি ক্ষীণবল।

বিজয়ী ঘোড়ার নাম ঘোষিত হচ্ছে।অরিন্দম অ্যাপোলোনোয়োর টিকিটটা গোছা থেকে আলাদা করেছে। দ্বিতীয় সলিড গোল্ড।সেটাও আলাদা করে।জ্যাকপট ঘোষিত হয় আর প্রথমটিকিটটার নম্বর মিলিয়ে অরিন্দম স্তম্ভিত, তলপেট থেকে জলোচ্ছ্বাস উঠে কণ্ঠরুদ্ধ করে।

কুন ঘুড়া? অরিন্দমের কবজি-খেমচানো তরুণী-আঙুল আলগা হয়।

যেটা জিতল।

সত্যি?

সত্যি।

সত্যি বলছ?

সত্যি।

বলো না, সত্যি কিনা।কেটলিউলির কণ্ঠস্বরে কিশোরী।

সত্যি।ড্যাবড্যাবে অবিশ্বাস আর উতলা বিশ্বাসে আক্রান্ত দ্বিধাগ্রস্ত মেয়েটির তাকলাগা ঘোরের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের আশ্বাস। কবজি ধরে থাকা আলগা আঙুলগুলো সজোড়ে আঁকড়ে ধরে আবার।মেয়েটির কোমরে হাতের বেড় দেবার আবেগ সামলাল অরিন্দম।এই মেয়েটা ওর থেকে বয়সে অনেক ছোটো।যত তাড়াতাড়ি হোক বিয়ে করে নিতে হবে। আজ হলে আজই। এর আগে অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অথচ ব্যাখ্যাহীন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ছোটোভাই আর ওর বউটা বিয়ের আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে রেখেছে, কনে আর কনের বাবার নাম ফাঁকা রেখে। অরিন্দম জুয়াড়িদের ওই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে মেয়েটির উদ্দেশে বলল, আজই আমরা বিয়ে করব।

বাড়ি গিয়া বাবাকে খবর দিব আর জামাকাপড় গুছিয়ে নিবো।

না-না।আর বাড়ি যাবার দরকার নেই।সোজা আমার বাড়ি যাব।

সিনেমার মতন?

খুব সিনেমা দ্যাখো? ম্যানকার সঙ্গে?

হ্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা।

চলো, টাকাটা নিয়ে নিই।ভিড় হবে কাউন্টারে।

দামি বিদেশি সুগন্ধ একেবারে মিইয়ে গেছে উত্তেজিত সুন্দরীদের দেহগ্রন্থির বিলোড়িত গন্ধে। পার্স থেকে ছোটো স্প্রে বের করে সুগন্ধের নবীকরণ করে নিচ্ছে কেউ-কেউ, পরবর্তী ঘোড়দৌড়ের আগে।

কাউন্টার থেকে টাকাগুলো সংগ্রহে সময় লাগে। নতুন নোটের প্যাকেটগুলোর রোদে প্রতিফলিত আলোয় উদ্ভাসিত ওদের মুখমন্ডল। এটাই ব্যাধি, এটাই ওষুধ। বিব্রত হলে হাসে মানুষ।আগাম আশঙ্কায় হাসে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেসকর্মী বকশিশ প্রার্থনা করলে, কয়েকটা নোট দিয়ে দিলে অরিন্দম, নিজের উদ্বেগ উপশমের জন্যে।

অ্যাতো টাকা দিয়ে দিলে? কথা না বলে বলল মেয়েটি। ক্ষতের কষ্টের মতন গোপন আনন্দ পায় আরিন্দম।

গাড়ি স্টার্ট করে অরিন্দম বলল, এবার জুতো খুলে পা তুলে বোসো।কেটলিউলি তা-ই করে। আয়নিত বিকিরণ-মাখানো পায়ের তলা থেকে আভাসিত হচ্ছে ধানচারা রোয়ার হিমেল গরিমা।নিঃশঙ্কচিত্ত তকতকে গোড়ালি।

প্রতিদিন, কেকের ময়দামাখার সময়ে, ভ্যানিলা-সুগন্ধের অভিনন্দন পায় এই পা জোড়া। আমলা, কেরানি, পিয়োনরা, হয়তো মন্ত্রীও, সেই অভিনন্দনের স্বাদ পায়। দিনের বেলাতেও নৈশভোজের আলো লেগে আছে আঙুলগুলোয়।শাড়ির ফলের সেলাই খুলে গেছে।ধুলো-ময়লার কালচে কিনার শুকোয়নি এখনও।

ল্যাজধরা মরা ইঁদুরের মতন দু আঙুলে প্লাস্টিকের কালো জুতো জোড়া তুলে গাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল অরিন্দম।ওই পায়ের জন্যে এই জুতো নয়, অন্য জুতো কিনব চৌরঙ্গি থেকে। তরুণী অবাক হয় না। অধিকারে শিকড় অস্তিত্বের অতল ওব্দি চারিয়ে দিচ্ছে অরিন্দম।শিরশির করে ওঠে আর্জি।মুখের ওপর এসে পড়েছে সোমথথ দুপুরের হিমসিম রোদ।

অ॥কেটলি।

কে॥অ্যাঁ।

অ॥এই নামে সাড়া দিতে তোমার ভাল্লাগে, তাই না?

কে॥আমার কাজই তো তাই।এই দ্যাখো, কড়া পড়ে গেছে হাতে।

অ॥জানি।এখন আমরা পিয়ারলেস ইন-এ যাব।

কে ॥তুমিও পিয়ারলেস করো?

অ ॥না-না। ওটা একটা হোটেল। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের বিয়ের আইবুড়ো-ভাত খাব।কলাপাতায়।

কে ॥আইবুড়া কেমুন ভাত গো? সিদ্ধ না আতপ?

অ ॥আইবুড়ো চালের নাম নয়।বিয়ের আগে আমার আর তোমার নাম।

কে ॥হি-হি...আমি আই আর তুমি বুড়া।

অ ॥আমরা খাব আতপচালের ভাত, শুক্তো, পটলের ঝালসাজ, হিঞ্চেশাকের বড়া, ভাজামুগের ডাল, রুই মাছের কালিয়া, দইতে রাঁধা মুরগি, পাঁপড়, শশা-আঙুরের চাটনি, মিষ্টি দই, ছানার পায়েস, কালাকাঁদ।হাতপাখার বাতাস।চাবিবাঁধা আঁচল কাঁধে ফেলে পানের খিলি এগিয়ে দেবে হোটেলের ওয়েটার বউদি।কেমন?

কে ॥অত খাবার? সব একই দিনে খেয়ে নিবো কেন? আমরাদের জন্য রেখে দিবো। আজ ডাল খাবো, কাল শুক্তো খাবো, পরশু মাছ খাবো, তাপপরদিন মাংস খাবো। ছানার পায়েস কেমুন হয়গো? বড়ো খিদা পেয়েছে আমার। নিমবেগুন হয় না? নিমবেগুন খাওয়া ভালো। আমি সঅঅঅঅব শাগ ভাজতে জানি। কলমি, কুলাখাড়া, সেপুন্না, নিসিন্দা, পুঁই, নটে, কুমড়া, বাথুয়া, লাউ সব সব সব সব পারি।

অ ॥মাংস?

কে ॥জানি। কলকাতায় পাখির মাংস নাই। ময়ূরের মাংস নাই। বয়লার আর বয়লার। তারচে বাবা ডালভাত ভালো।

মেয়েটার শরীর জুড়ে প্রাচীন নিষাদকুলের নাচ লুকিয়ে আছে যেন, মনে হচ্ছিল অরিন্দমের। এর চাউনি রৌদ্রোজ্জ্বল। চিরপ্রদোষ-মাখা শ্যামলিনী। অত্যন্ত সাদামাঠা। কালো মেয়েদের সুশ্রী বলতে যা বোঝায়, এর তেমন কিছুই নেই। এর প্রাণশক্তির জোরের বখরাটুকু আজীবন চায়, আজীবন চায় অরিন্দম। হঠাৎ-ই, এই ভেবে যে মেয়েটা নাবালিকা নয়তো, ধ্বক করে ওঠে হৃৎপিন্ড। সব চুরমার হয়ে যেতে পারে তাহলে।

তুমি এবার ভোট দিয়েছিলে? কেটলিউলির অন্তস্থালের দখল নিতে জিগেস করে অরিন্দম।

হ্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা। এবার আবার একটা সাদা আর একটা গোলাপি দুটা-দুটা ভোট ছিল। ম্যানকা বলছিল লোকগুলার মাথা খারাপ। অন্যবার তো একটাই কাগজ হয়। আমি বলেছি, এবার আমি ভোট দিলুম কিনা, তাই আমার জন্য দুটা-দুটা।হি-হি।

কেন্দ্র সরকারের নির্বাচন, রাজ্যসরকারের নির্বাচন, এসমস্ত আলোচনা অবান্তর।সাদা আর গোলাপি কাগজ থেকে পাওয়া রাজনীতিহীন আহ্লাদটুকুই যথেষ্ট। মেয়েটির দুচোখে ধানখেতের সবুজ অতিশয়োক্তি অরিন্দমকে আশ্বস্ত করে।হৃৎপিণ্ডে, বর্ষারাতের ঝিলমিলে মেরুণ অন্ধকার, কানে আসে আনন্দের অঙ্কুরোদ্গমের রিনরিন।

আরেকটা জিনিস রাঁধতে জানি।বলব? কাসুন্দির সুন্দি ছাড়া, পাঁঠার পা, লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া, কিনে আনগে তা।বলো তো কী?

মহোল্লাস ছেঁকে ধরে অরিন্দমকে কাঁটা দ্যায় গায়ে। বলবার ছিল কাঁঠাল, বলল এঁচোড়।

হ্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা।হ্যাঁ শব্দের রণন হতে থাকে অরিন্দমের মস্তিষ্কে।বলবার মতন ধাঁধা বা ছড়া মনে করার চেষ্টা করে।মাথায় আসে না।বোধহয় জানেই না আদপে কোনও।

হসপিটাল রোড থেকে ক্যাসুরিনা অ্যাভেনিউতে গাড়ি বাঁক নিলে কেটলিউলি সজোরে বলে ওঠে, আবার ওই রাস্তায়, ইদিকে কাকুদা বলছিল তুমি ভালোলোক।আর মটোর থামাবে না কিন্তু।মেয়েটির মুখাবয়াবে অপ্রতিভ শঙ্কা।

পথের দুধারে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে রোদ্দুরের সবুজ ঠাঠা।ব্রিটিশ আমল থেকে নিজের গায়ে রোদ বসতে দিচ্ছে না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। কিন্তু স্বাধীনতারপর সরকারি বাসের ভেজাল-দেয়া পোড়া ডিজেলের ভাসমান গুঁড়োর দাঁত জোরজবরদস্তি বসে যাচ্ছে ওর মার্বেলে।

কলকাতার এই ডিজেলগুঁড়োর আতঙ্ক ছাদে আলসেতে বারান্দায় বড়ি শুকোবার রেওয়াজ উঠে গেছে।তুলি জোয়ারদার শনিবার অফিস ছুটির মধ্যাহ্নে অরিন্দমের সঙ্গে এখানে এসে এখানের ঘাসে বসে থাকতে ভালোবাসত। এই মেয়েটি, কেটলিউলি সম্পর্কে আরও জানতে ইচ্ছে করে অরিন্দমের।

প্রশ্ন ॥অত দূর থেকে রোজ কেমন করে যাও?

উত্তর ॥কুথায়? আমার আপিসে?

প্রশ্ন ॥হ্যাঁ, কী ভাবে মহাকরণে পৌঁছোও?

উত্তর ॥বাইপাস গিয়া এসপালানেড যাই।তাপপর ওইটুকু হাঁটা দেই।আর ডালাউসির বাস পেলে তাতে যাই।বড়ো আঁইশটানি গন্ধ ওই ঠিন, আমরাদের পাড়ায়।

প্রশ্ন ॥সারাদিন বড়ো বেশি কাজ, না? দুতলা-তিনতলা?

উত্তর ॥লোকগুলা বড়ো আগলটাপড়া।

মেয়েটার কথাগুলো চিনচিন করে।

অন্যান্য বছর চৈত্রাকাশে রাগ পুষে রাখে সূর্য। এবছর রোদ্দুরের হাবভাব নিরুত্তাপ। জহোর্লাল নেহেরু রোডে লাল রঙের শতছিন্ন বাস ধুঁকছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। হয়তো জহোর্লালের প্রথম কি দ্বিতীয় পাঁচসালা ফেবিয়ানি আমলে হাসিমুখে চশমা পরে কিনেছিলেন বিধান রায়।

দুপুরের রাজপথে বাতাসের বুকে থেকে-থেকে হাঁপানির টান। ফুটপাতের কিনারে কয়েকটা দেশোয়ালি দাঁড়কাক, দেশোয়ালি পথ-হোটেলের ফেলে-দায়া হলদেটে ভাত খুঁটছে তিড়িক-তিড়িক। এ-অঞ্চলে, চৌরঙ্গিতে, জীবনের অবলম্বন বলতে বোঝায়

জীবিকা। কেজো চোয়ালের হন্তদন্ত যুবকেরা বেতনভূক ভিড়ের স্বাধীনতা-উত্তর তেলচিটে আলস্যকে বাঁ-হাতে একপাশে ঠেলে-ঠেলে এগোচ্ছে।

পার্কিঙের জায়গা খুঁজছিল অরিন্দম। শাড়ি আর একজোড়া জুতো কিনতে হবে। বাটা, উডল্যান্ডস, মেসকো রয়েছে ওফুটে। দামি জুতো কেনা দরকার। জুতো দেখে লোকে চরিত্র নির্ণয় করে। গোড়তোলা ডার্কট্যান ব্যালেরিনা? স্ট্র্যাপ-দেয়া গ্রিক স্যানডাল? শাড়ি কোনটা? তাঁতের।হালকা নীল বা ফিকে বেগুনি জমি।বেগমবাহার বা কটকি হলে কেমন মানাবে।সিল্ক বোধহয় এই গরমে অচল।নয়তো কাতান বা তাঞ্চোই।নাঃ, সুতির ফিকে সবুজ ভয়েল কেমন? দোকানের কাউন্টারে যে মেয়েগুলো থাকে, তারাই বলতে পারবে, কেননা ম্যাচিং ব্লাউজ, শায়া চাই ; ওরাই সাহায্য করবে নিশ্চই।

পাপহীনতার আঁচে-মোড়া মেয়েটির বাঁ পায়ের তলায় একটা তিল নজরে পড়ে। অরিন্দমের আছে ডানপায়ে। বার্ধক্যে বেড়াতে যাবে অনেক জায়গায়। চতুর্দিক জুড়ে নিঃশব্দ রাগসঙ্গীত লাউডগার সবুজ ঘুঙুরালি শুঁড়ের মতন গজিয়ে উঠতে থাকে অরিন্দমের চারিপাশে। সিন্ধু ভৈরবী, আহিরললিত, গান্ধারি-টোড়ি, শুক্লবিলাওল, মধুমাধবী সারং, বারোয়াঁ, পলাশকাফি, তিলকশ্যাম, পটকঞ্জরি, চাঁদনিকেদার, শিবরঞ্জনী, হংসকিংকিনি, জয়ন্তীমল্লার, দুর্গাবাহার, মধুমাধবী। ভালোলাগার এই মনস্থিতির বর্ণনা নেই।

ওই দ্যাখো।তেলেঙ্গি, না?

মোটাসোটা বউ আর ব্লাউজ-শায়া পরা মেয়ের সঙ্গে, বোধহয় কেরালার, সাদা লুঙ্গি শার্ট-পরা লোকটা হকারের সাথে দরদস্তুরে ব্যস্ত। তেলেগু নয়, বলল অরিন্দম। এখন তো অন্ধ্রের উগাদি উৎসব হয়। হতেও পারে। চৈত্রমাসেই তো হয় উগাদি। অন্ধ্রের একজন মুসলমান অফিসার কাজ করত পাটনায় আমার সঙ্গে।ওর মা আর দিদি ঘাগরা আর ফতুয়া-ব্লাউজ পরত বলে, লজ্জা পেত ওর বাড়ি গেলে। সজনেপাতা দিয়ে মাংস রাঁধত।

আমিও সজিনাপাতা রাঁধতে পারি।তোমার ডিপার্টে তেলেঙ্গি আছে? কুন আপিস?

ওই যে, তোমার অফিসের পাশে, এসকালেটার আছে।

কাটা ট্যাকার ব্যবসা?

হ্যাঁ, নোটের আর পয়সার ব্যবসা আমাদের।নোট ছাপি, করকরে নোট বাজারে ছাড়ি, নোংরা পচা নোট গুঁড়ো করে কাগজ বানাই। পাঁচ কিলো দশ কিলো ওজন করে ব্যাগভর্তি পয়সা বেচি।

ইশ-রে।অনেক-অনেক পাওনা পাও।আমার আপিসে লরির কাগজ বের করতে পাওনা লাগে, ওই ঠিনে বাইরের লোকজন চাপাচাপি আসে সারাদিন, কাগজ বের করার জন্য বোসথাকে, দাঁড়িয়ে থাকে একঠায়, গেলাস গেলাস চা খায়।

জানে অরিন্দম।পায়ে-মাখা ময়দার কেক খায়।বহুদূর শহর-গঞ্জ থেকে এসে খেয়ে যায় চরণামৃত।কিছুদিন আগে বেশ হইচই হয়েছিল দশ কোটি টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট আর এক

কোটি টাকার পোস্টাল অর্ডার ওই বিভাগের আলমারিতে গুঁজড়ে রাখা ছিল বলে। সরকারি তহবিলে জমা করার জন্যে পাঠানো হয়নি। বছরের পর বছর পড়ে-পড়ে খড়খড়ে, রং-ওঠা, দোমড়ানো, ওগুলোর কথা মনে ছিল না কারোর, আশ্চর্য। কাজই করতে চায় না কেউ।অলস শুক্রকীটের ফসল বলে কিছু হয় কি? ওই নির্মম হৃদয়হীন পরিবেশে মেয়েটা কাপ আর কেটলি ঝুলিয়ে কতবার এঘর-ওঘর পাক খায় কে জানে!

অরিন্দম দেখতে পেল, ওফুটের কিনারে, বাটার দোকানের সামনে কেরালার নাম্বারপ্লেট লাগানো হলুদ মারুতি জেন গাড়িকে টো করে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে পুলিশের লালরঙা রেকারট্রাক থেকে কয়েকজন নামল।গাড়িটার তলায় ঢুকল একজন। গিয়ারকে নিউট্রাল করে ক্রেনে ঝোলাবে।

ওরেব্বাপ।এখানে পার্ক করলে ওই গাড়িটার দশা হবে।আগেই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে অরিন্দমের। সেটুকুই যথেষ্ট। প্রথম পনেরো মিনিটে ব্যাটারি আর ওয়াইপার লোপাট। তারপর এক-এক করে স্টেপনি, কার্বুরেটার, রেডিয়েটার, ফিউজ বক্স, স্টিয়ারিং বক্স, প্রপেলার শ্যাফ্ট আর তার কদিন পরে তো মেশিনটাই হাপিস।ব্যাস।শ্যাশিটাকে ঠ্যালায় চাপিয়ে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাও।আদিত্য তো বলেই দিয়েছে, এসব ব্যাপারে ও নাচার।

রেকার-লরির পেছনে নিজের প্রিয় গাড়ির উর্ধ্বমুখী দুরবস্থা দেখে কেরালীয় লোকটা, ওর থপথপে বউ আর শায়া-ব্লাউজ পরা ঢ্যাঙা মেয়ে, তিনজনই দুহাত ওপরে তুলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে দৌড় লাগায় ধাবমান রেকারের দিকে।

কেটলিউলির কি হাসি কি হাসি। মেয়েটির দিকে নয়, অরিন্দম তাকিয়ে থাকে ওর হাসির দিকে।অপার্থিব, অপার্থিব,অপার্থিব।দ্রুতগামী যানের মাঝে পড়ে রাস্তা পেরোতে পারছে না মালায়ালি পরিবারটা, আর তা দেখে হাসছে তো হাসছেই মেয়েটা। বিদ্যুৎবাহী হাসির অদৃশ্য প্রজাপতিরা উড়ছে গাড়ির মধ্যে। অরিন্দমের মাথা থেকে পায়ের আঙুল ওব্দি বইতে থাকে মহাজাগতিক রশ্মিতরঙ্গ।

রাস্তা পেরোতে থাকা পরিবারটিকে বাঁচিয়ে, পাশ কাটিয়ে বেরোতে গিয়ে, দ্রুতবেগে ছুটে-আসা আলুর বস্তা বোঝাই হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার মিনি ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারল অরিন্দমের গাড়ির পেছনে।প্রচণ্ড অট্টহাস্য করে ওঠে ধাতব সংঘর্ষ। আলুর চটের বস্তা ছিঁড়ে রাস্তাময় গড়ায় এলা-মাটি মাখা আলু।আরম্ভ হয় জনগণের আলু কুড়োবার উৎসব। হকার-ভিকিরি-কেরানি-দোকানি-গৃহবধু-দারোয়ান-পকেটমার-ট্যাক্সিচালক সবাই মেতে ওঠে আধ-পচা আলু সংগ্রহে।

তীব্র ধাক্কা খেয়ে অরিন্দমের গাড়ি ওদের দুজনকে সুদ্দু কিছুটা ছুটে গিয়ে রাস্তায় পড়ে-থাকা পাথরে তুলে দিয়েছে বাঁ দিকের চাকা, আর তারপরেই কাৎ হয়ে উলটে গেল। আকাশের দিকে চারটে ঘুরন্ত চাকা।গুবরে পোকার মতন দুবার পাক খেয়ে আগুন ধরে গেল গাড়িটায়।সশব্দে বিদীর্ণ হয় ডিজেল ট্যাঙ্ক আর গাড়িটা আগাপাশতলা ঢাকা পড়ে যায় তরল দগদগে আগুনে।আগুনের টোপর পরে ওলটানো গাড়ির ওপর নাচতে থাকে শিখা।

১৬-২০

১৬.

ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে হেঁটেই ফিরছিল যিশু।সেকসপিয়ার সরণি থেকে ক্যামাক স্ট্রিট ধরে মনে পড়ল টাকা তুলতে হবে।পরশু বৈশাখী পূর্ণিমা, জেনে রেখেছে।কাল সকালে বেরিয়ে পড়বে।ক্যাশ টাকা দরকার।পার্স খুলে ইন্দুসিন্ধ ব্যাক আর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের এটিএম কার্ড দেখে আশ্বস্ত হল।

ক্যামাক স্ট্রিট ভিড়াক্কার।রাস্তার দুপাশে পুলিশের জিপ।লরি, খাকি, লাঠি, রেব্যান, খইনি, এলাহি।আদিত্যকে দেখতে পেল।

আদিত্য যিশুকে আসতে দেখে, যিশুর সেরকমই মনে হল, রে ব্যান চশমা পরে নিল। হাতে বেটন।বুকে নামের তকমা।গটগটীয়ে রোয়াব।প্রোমোশান পেয়ে গেল নাকি, ওপরঅলাদের মোটা টাকা খাইয়ে।ওঃ, তুই তো একদম উত্তমকুমারের পাইরেটেড ভার্সান হয়ে গেলি রে।

আদিত্যর মনে হল, আরেকটু হলেই ওর মুখাবয়াবে ধরা পড়ে যেত অরিন্দমদার বীভৎস মৃত্যুর মর্মান্তিক খবর।সামলে নিয়েছে।যিশুদার কথা বলার ঢঙ থেকে পরিষ্কার যে অরিন্দমদার দুর্ঘটনার খবর জানে না।ভালোই।গাড়িতে সম্পূর্ণ দগ্ধ নারীর লাশ পাওয়া গেছে।পোড়া নোটের তাড়া।অরিন্দমদার বাড়িতে কেউ বলতে পারেনি, কার লাশ, মেয়েটি কে! শনাক্ত করা অসম্ভব, এমন পুড়েছে।কত লাশ যে এভাবে পুলিশের জিম্মায় এসে নামহীন পড়ে থাকে ; তারপর একদিন নামহীন ধোঁয়া হয়ে উবে যায়। যিশুদার কাছে চেপে যাওয়াই ভালো।নইলে কী মনে করবে অরিন্দমদা সম্পর্কে। কমবয়সী যুবতী, হয়তো, গুচ্ছের টাকা, গল্পের খেই আপাতত নেই।আর খেই না থাকলেই গল্প খুঁজতে থাকবে অন্ধকার চোরা রাস্তাগুলো।কত দেখলো তো পুলিশে ঢুকে।তুলি জোয়ারদার নয়, অন্য কেউ ছিল।

যিশু বলল, কীরে, এখানেও তোলা তুলছিস? এটা তো সম্ভ্রান্ত অফিসপাড়া।তোদের সত্যি, বলিহারি।তোদের সেই লিয়াকত আলি না কি নাম যেন, তিনটে গাড়ি খাটায় বেনামে, কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ড জাল করে হাওড়া আর ডায়মন্ড হারবারে ছেলেছোকরাদের চাকরির লোভ দেখিয়ে লাখ-লাখ কামিয়েছিল, সে ধরা পড়েছে? না কি লুকিয়ে রেখেছিস তোদের পুলিশ কলোনির কোয়ার্টারে? সে তো আবার ওসি।তোর চেয়ে উঁচুতে, মালদার পার্টি?

আদিত্য বলল, আঙুল করা স্বভাব আপনার গেল না।

যিশু বলল, তা এখানে কী?

আদিত্য বলল, আর-রে আর বলবেন না।বাঙালিগুলো তলে-তলে কলকাতাকে দিয়ে দিচ্ছে।এক-একখানা ভাম বসে আছে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগে।

যিশু বলল, যা বলেছিস। ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের ওপর পুরোবাবুদের খুব রাগ। ওরা কলকাতার ঐতিহ্যকে টিকতেই দেবে না।দেখছিস না, টাউনহলের বাগানে বেঢপ বাড়ি তুলেছে।

আদিত্য বলল, এসব হল বাঙালদের কুকিত্তি।

যিশু বলল, বাঙাল, মুসলমান আর ব্রাহ্মণদের ওপর তোর দেখি যখন-তখন গোঁসা। তা পুরসভার বাবুরা ক্যামাক স্ট্রিটটাই বেচে দিয়েছে নাকি? বলা যায় না ; ভাঙা টেবিল-চেয়ার জুড়ে যা সব মাল বসে আছে ওদের অফিসটায়।

আদিত্য বলল, ওই মার্কেটটা সিল করে দেয়া হচ্ছে, ওই যে, ওইটা।বেআইনিভাবে একটা আংশ বাড়িয়েছিল, শালা ধসে পড়েছে। ভাগ্যি যে কেউ ট্যাঁসেনি। ভেতরে-ভেতরে একটা মেজানাইন ফ্লোর খাড়া করে ফেলেছিল, বুঝলেন।এ যেন পারমাণবিক অস্ত্র।কেউ টেরটি পায়নি।নকশা অনুমোদন হয়েছিল বসতবাড়ির, আর ওনাদের বিল্ডিং বিভাগের গ্যাঁড়াকলে রূপ পালটে হয়ে গেল মার্কেট।পার্কিঙের জায়গাতেও দোকানঘর। হ্যাহ হ্যাহ।

যিশু বলল, একেবারে সুপার কেলো দেখছি।তা ওটা দেখছি ভাঙা হচ্ছে আলপিন দিয়ে, আর বাঙালি হকার তোলার বেলায় পে-লোডার বুলডোজার।তা বেশ, তা বেশ।

আদিত্য বলল, কেলো বলে কেলো! আলিপুর রোডে একটা বহুতল বাড়ির একতলা দোতলা আর বেসমেন্ট নেই।

যিশু বলল, বলিস কী রে।দাঁড়িয়ে আছে কী করে? কেতাবি তত্ত্বের ওপর?

আদিত্য বলল, ম্যাজিক, ম্যাজিক, কমরেডদের ম্যাজিক, এখন অবশ্য অনেক কমরেড রাতারাতি জার্সি পালটে ফেলেছে। অ্যাসেসর কালেক্টর আর ইন্সপেক্টর ষড় করে নথি থেকে তিনটে ফ্লোর বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে।পার্টির লোক, কারোর মুরোদ নেই মুখ খোলে। আপনি আর কী লুইফিলিপে আর পিয়ের কার্ডিন পরেন। অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টারটাকে দেখলে ভিরমি খাবেন। সুট, সাফারি, সেলুলার, আই পড, বেনসন হেজেস।হিংসে হয়।রিঅ্যালি।কাসপারভের ডবল আই কিউ লোকটার।ভ্যালুয়েশানের আগেই মিউটেশান ফি জমা নিয়ে নিয়েছিল। ওফ শালা কী চিজ একখানা, যেন স্তালিনের বিচি থেকে একেবারে যুবক হয়ে বেরিয়েছে।ইন্সপেকশান বুক লেখা হবার আগেই হিয়ারিং নোটিসখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো আর ফ্ল্যাট মালিকদের না পাঠিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছে বিল্ডারকে। বিল্ডিংটা দেখেছেন? কী নেই! পার্কিং লট, মার্কেট, এসকালেটর, হেল্থ ক্লাব, বিলিয়ার্ড রুম, রকেট লিফ্ট, পেল্লাই কম্যুনিটি হল, ছাতে খেলার মাঠ, আরেক ছাতে বাগান, কত কী! সোনার লিকুইড দুইছে পার্টির পাকাচুল-দাদারা।ইন্সপেক্টরটা বদ্দি বামুন, বরিশালের ফেকলু, শালা তিলে খচ্চর।খাল কেটে মারোয়াড়ি কুমির ঢোকাচ্ছে।দেবে একদিন দাদাদের পোঁদে কামড়, তখন টেরটি পাবে মজা।

যিশু বলল, আস্তে বল, আস্তে বল, শুনতে পেলে অবরোধ করিয়ে দেবে। তুই অবশ্য কম যাস না।লাইন তো ধরেই ফেলেছিস।শাসকবর্গের বশংবদ রোগপোকা।

আদিত্য বলল, কীইইই যে বলেন।

যিশু বলল, মেড়োগুলো এককাপড়ে এসে কোটিপতি হয়ে গেল। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, আলিপুর, সল্টলেক সব দখল করে নিয়েছে। আর শ্যালদায় একপাল লোক নাকে কাঁদছে, দেঁশ ভাঁগ চাঁইনি বলে। লাথি খেয়েও বাংলাদেশে কেড়ে-নেয়া ভিটে দেখতে যায় আর ফিরে এসে কাব্যি করে।

আদিত্য বলল, ম্যানহোলের লোহার ঢাকনি চুরির ব্যাবসা করছে।

যিশু বলল, তোরই তো মাসতুতো ভাই সব। দামি-দামি ট্যাংরা পারসে ইলিশ খাওয়া সর্বহারা।

আদিত্য বলল, আমরা তো নস্যি। খুচরোর জন্যে পুলিশের লোকে প্যান্টের পকেটে চামড়ার লাইনিং লাগায়।সত্যি।জোক করছি না।

যিশু বলল, যার যেমন মূল্যবোধ। কারোর খুচরো, কারোর করকরে। আমার ফ্ল্যাটটা মিউটেশানের সময়ে, এখনও পরিষ্কার মনে আছে আমার, অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টারটা বাবার কাছে অশৌচের শোকপোশাকে এসে হাজির। একটু আগেই বোধহয় বাপকে পুড়িয়ে এসছে শ্মশানে। ভুঁসকো ভুঁড়িতে মোটা পৈতে ঝুলিয়ে, বুঝলি, পায়ে রবারের জুতো, হাতে ন্যাকড়াসন, এসেছে ঘুষ খেতে। আবার দাঁত বের করে হাসছিল, খ্যাক-খ্যাক খ্যাক-খ্যাক।

আদিত্য বলল, জিভ যৎসামান্য মুচড়ে, আজগাল লোকে নিজের বাপকেও খুন করে দিচ্ছে বাপের চাগরিটা পাবার জন্যে, দেখছেন।

যিশু বলল, সেটা বাঙালির চাকরি ওরিয়েন্টেশানের জন্যে। বাঙালির শালা জীবিকা মানেই চাকরি। কাজ দাও, মানেই চাকরি দাও। চাকরি ছাড়া আর ভাবতেই পারে না কিছু।বাপকে খুনের রিস্ক নেবে, কিন্তু নিজে কিছু করার রিস্ক নেবে না।বাঙালিরা এতো আড্ডা দ্যায় কেন বল তো? আড্ডাটা হল মায়ের কোল। চাকরিটাও মায়ের কোল। মায়ের কোলের আরাম চাই বাঁধা টাকার মাই খেয়ে।অন্য সব কাজকম্ম তো চলে যাচ্ছে অবাঙালিদের কবজায়। ওই তো, দ্যাখ, ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলো সবকটা বিহারি, নয় ইউ পি সাইডার। ট্যাক্সি আর বাসের মালিকগুলো বেশিরভাগ পাঞ্জাবি। ধোপা, ছুতোর, নাপতে, মুচি, কামার, বাড়ি বানাবার মিসতিরি, পুরসভার ডোম, বড়োবাজারের মুটে, তুই দেখগিযা, হয় বিহারি, নয় ইউ পি সাইডার কিংবা ওড়িষার। হাওড়া-শ্যালদা স্টেশানের, ব্যাংকশাল আর শ্যালদা কোর্টের, রোড ট্রান্সপোর্ট অফিসের, সব দালালগুলো, সবকটা ক্রিমিনাল, তুই তো ভালো জানবি, সব ওদিকের।কলের জলের কাজ করছে উড়েরা। বাঙালিদের ব্যাবসার কথা তো ছেড়েই দে। কেউ দাঁড়াতে চেষ্টা করলেই দাদারা লাল ডাণ্ডা ঢোকাবে।বড়োবাজার থেকে ডাণ্ডার ফাইনানসিং হয়।

আদিত্য বলল, এতেও গবেষণা করছেন নাকি? কিচ্ছু ছাড়বেন না দেখচি।

যিশু বলল, আরও বলছি, শোন তাহলে।আমাদের বিলডিঙের লিফ্টটা রিনিউ হচ্ছে না দুবছর ধরে। ওদের অফিসে গিয়ে পাওয়াই যায় না কাউকে। একই বাড়ির জন্যে পুরসভাকে ট্যাক্স দাও, অট্টালিকা কর দাও, আবার বহুতল কর দাও। অথচ কোনও

অফিসে পাবি না বাবুদের কাউকে।কোনও না কোনও রকম মায়ের কোলে ঢুকে বসে আছে।পঞ্চাশ বছরে স্বাধীনতা আমাদের খাঁটি জোচ্চোর করে দিয়েছে।পশ্চিমবাংলার বাঙালির বাকতালা আসলে মাইখাবার আরেকরকম ফর্ম।

আদিত্য বলল, তা এখন কোথায় চললেন? বাড়ি?

যিশু বলল, যাচ্ছি কাঁচা আম কিনতে। বিয়ারে দুচার টুকরো ফেলে খাবো। আমার অ্যাসিট্যান্টটা গ্রামে গেছে, এখনও ফেরেনি। চিন্তায় ফেললে। তুই জানিস তো? ভাঙাপাড়া?

আদিত্য বলল, আপনি বিদেশে কোন একটা কাজে যাবেন বলছিলেন, তার কী হল?

যিশু বলল, হ্যাঁ, সিয়েরা লিয়োন। নিত্যিদিন শালা সরকার পালটায়, মিলিটারিতে ঝগড়া বাধে।পয়সা-কড়ি পাওনা আছে অনেক।

আদিত্য বলল, ওব-বাবা, আফরিকা! আর জায়গা পেলেন না? আফরিকায় যা কনডোমের সাইজ! ইনডিয়ানরা গিয়ে পায়ে মোজা করে পরে শুনেছি।হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

যিশু বলল, তোর তো ওই একটাই চিন্তা।না, একটা বলি কী করে।দুটো, রূপ আর রুপিয়া।

আদিত্য বলল, আরে আপনার তুলনায় আমি তো এখনও কচি। তা আপনি সেটল হচ্ছেন না কেন।ইন্সট্রুমেন্টটা লিগালাইজ করুন এবার।

যিশু বলল, একবার কোনও রোববার সেইন্ট পলস ক্যাথিড্রালে গেলে টের পাবি।যত দিন যাচ্ছে তত অবাঙালি আর কুচ্ছিত হয়ে যাচ্ছে বাঙালি খ্রিস্টানরা। কবর দেবার জায়গার অভাব তো মা-বাবার ফিউনারালের সময়ে দেখেছিলি।আমি হলুমগে বাঙালির রেনেসঁসের রেলিকস।বিশুদ্ধ বাঙালি খ্রিস্টান আর নেই।আমিই শেষ প্রতিভূ।মাইকেল মধুসূদনের নাতি-নাতনিরা শুনেছি অস্ট্রেলিয়ায় থাকে।অন্তত কুচ্ছিত হওয়া থেকে তো বেঁচেছে।

আদিত্য বলল, আপনার সেই কেটলিউলির কী হল? তিলজলার কেটলি কুইন? সে তো আছে।

যিশু বলল, ধুৎ কীইইই যে বলিস বোকার মতন। অরিন্দমকে নিয়ে গিসলুম তো কেটলির বাসায়। গাড়ি নিয়ে অ্যাগবারে তৈরি হয়েই গিয়েছিলো ; মেয়েটাকে সেদিনকেই বিয়ে করবে বলে। প্রেম ছাড়া তো ও সাফোকেটেড ফিল করে। করে ফেলেছে বোধহয়, বিয়ে, দেখগি যা।

আদিত্য স্তম্ভিত।দ্রুত ছুটে গিয়ে মোটর সাইকেলে বসে।কিকস্টার্ট করে।নীলাভ ধোঁয়া তুলে মিডলটন স্ট্রিটে ঢুকে যায় মোটর সাইকেল।

আদিত্যর ব্যাখ্যাহীন আচরণে যিশু অবাক। কাজ ফেলে ছুটল নাকি অরিন্দমের বউ দেখতে! কিংবা কেটলির পরিবারের ফ্যাঁকড়া খুঁজতে পুলিশি ফলাতে ছুটল?

হাসপাতালে পরিচয়ের পর কেটলি আর ওর বন্ধু মেনকার বাড়ি তিলজলা-তপসিয়ায় বারকয়েক গেছে যিশু। প্রশংসনীয় ওদের স্বনির্ভর হবার উদ্যম। কেটলির সৎ ভাইটা মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারে ঢুকেছিল। ওদিকে কোথায় বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার জঙ্গলে মরেছে পুলিশের গুলিতে। ওর বাপ বারকয়েক বিয়ে করেছে ছেড়েছে। গ্রাম ছেড়ে এসে ওরা সরকারি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রান্নাঘরে ঠিকেমজুর ছিল। তারপর ট্যাংরায় পাঁউরুটি কারখানায়। এখন দিনে একশোটা কেক বানাচ্ছে নিজেই। বিক্রিবাটাও মন্দ নয়।

ছেলেটা মাওবাদী হবার আগেই, বহু আগে, কলকাতায় চলে এসেছিল। গত নির্বাচনে মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার কিছু এলাকায় ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল। পাতলা গোবর দিয়ে সাঁটা, হাতে লেখা পোস্টার পড়েছিল গাছের গুঁড়িতে, চালাবাড়ির মেটে দেয়ালে, হোগলায়। আমলাশোল, শিয়াড়বিনধা, চাকাডোবা, বাঁশপাহাড়ি, কেঁউদিশোল গ্রামে হ্যান্ডবিল বিলি হয়েছিল।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের ধাদকা আর কুমড়া পঞ্চায়েতে, বাঁকুড়া জেলার রাইপুর ব্লকের ছেঁদাপাথর এলাকায় ওদের প্রভাব যে সিপিয়েম আর ঝাড়খন্ডদলের তুলনায় যথেষ্ট তা যিশু টের পেয়েছিল খাদিবোর্ডের প্রকল্পের অ্যাসাইনমেন্টে। ঘনশ্যাম সিং সর্দার, যে পরে বন্দুক-কার্তুজসুদ্দু ধরা পড়েছিল, সেই মাওবাদী নেতার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যিশুর।

ওই এলাকার সংগঠক, মাওবাদীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ লোক, অতনু চক্রবর্তীর সঙ্গেও যিশুর আলাপ হয়েছিল গালুডিতে। তেড়ে সাঁওতালি, ভোজপুরি, হিন্দুস্থানি বলতে পারে। পাইকা আর স্মল-পাইকা গুলে খেয়েছে। চাকরি-বাকরি ছেড়ে-ছুড়ে ঢুকেছে এইসবে। সবাই আছে ওর খোঁজে ; বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন, জোতদার, জঙ্গলের ইজারাদার, সবাই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামবাসীরা খবরাখবর দিয়ে যেমন ডাকাতদের বাঁচায়, ওইসব অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বাঁচায় মাওবাদীদের। শত্রুপক্ষ-মিত্রপক্ষের তত্ত্বে ফারাক নেই। আছে কাজে।

এই অতনুর খোঁজেই অরিন্দমকে ভোটবাগানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আদিত্য।

যিশু দেখেছে, কুড়ি কিলোমিটার জুড়ে দুর্গম জংলি সবুজ। সাঁওতাল, মুন্ডা, ভুমিজ, খেড়ে, শবর, কৈবর্ত, তেঁতুলে বাগদির বাস। উঁচু জাতের বাঙালির ধাক্কায় শহরের প্রান্ত থেকে ঠেলে-ঠেলে পৌঁছে গেছে জঙ্গলের কিনারে, জঙ্গলে। এখন জঙ্গলের দেয়ালে পিঠ। কেন্দুপাতা, সাবাইঘাস, মহুয়াফুল, মহুয়াবীজ, শালবীজ, শালপাতা, কুসুম, নিম, বেল, কালমেঘ, কুড়চি, আমলকি, জ্বালানিকাঠ কুড়িয়ে আর বেচে যতটুকু চলে।

ময়ূর মেরে টাউনে মাংস নিয়ে গেলে ভালো দাম পাওয়া যায়। যা কিছু দেখতে ভালো, মেয়েমানুষ হলে তো কথাই নেই, তাকেই সাবড়ে ভুষ্টিনাশ করতে চায় শহরের মানুষ। জিনিসটার বা প্রাণীটার নয়, মানুষ আহ্লাদিত হয় ভুষ্টিনাশের স্বাদে। প্রতিটি সৌন্দর্যবস্তুর চর্বণপদ্ধতি আলাদা। চেবাবার, খাবার, গেলার, চাটার আওয়াজ আলাদা-আলাদা।

বাঁশপাহাড়ি এলাকার নিতাই মুড়া আর ভরত মুড়ার নামডাক আজ পঁচিশ বছর। বলছিল, তৃণমূল কংরেস বল্যেন, সিপিয়েম বল্যেন, ঝাড়খন্ড বল্যেন, বিজেপি বল্যেন, সঅঅব গর্মাগরম বইকবকম। ওই খাদি বোর্ডের প্রকল্পের কাজের সময়ে তো ঝিলিমিলির কাছে বারোঘাটির জঙ্গলে বন্দুক-পিস্তল ভাঁজার শিবির দেখেছিল যিশু। বোড়ো, উলফা, আল উমমা, আনন্দমার্গীদের চিন নানা অস্ত্রশস্ত্র দিলেও, মাওবাদি কমিউনিস্ট সেন্টারকে কেন দেয় না, ব্যাপারটা বুঝে ওঠা মুশকিল! অবাক লেগেছিল যিশুর যে অল্প সময়ের মধ্যে ওরা ওর সম্পর্কে অনেক-কিছু জানে। কেন্দুপাতার ব্যাবসা বন্ধ করতে ওরা ট্রাক লুঠ করেছিল। প্রশাসন তো ব্যবসাদারদের। ওদের মালকড়ি ছাড়া ভোটাভুটি অচল।

যাঃ, কী আবোল-তাবোল ভাবছিল হাঁটতে-হাঁটতে।ইন্দুসিন্ধ ব্যাংকটা পেরিয়ে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড় ছাড়িয়ে, রাসেল স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল যিশু।ভাবল, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড থেকেই তুলে নেওয়া যাক টাকাটা।

কাজের ছেলেটা ফ্ল্যাটে ফিরল কিনা জানার জন্যে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে বাড়ির নাম্বার প্রেস করে কানে ধরেছিল। ধুতি-পাঞ্জাবি চশমাচোখে হাফটেকো মধ্যবয়স্ক জিগ্যেস করল, দাদা, সোচিন কত করেচে?

.

১৭.

পুকুরের জলে টলটলে রোদের গুঁড়ো মাখতে-মাখতে জলের মধ্যে মাথা গুঁজে পাক খেয়ে কুচোপোনা তুলে আনছে পানকৌড়ি।মাথা ডুবিয়ে পাক খায় আর রুপোলি মাছ তোলে।উড়ে গিয়ে ঘনসবুজ চিকচিকে নারকোল পাতার ওপর বসে সূর্যের দিকে পিঠ করে।স্নানশেষে যুবতীদের মাথা ঝাঁকিয়ে এলোচুল ঝাড়ার মতন গা কাঁপায়। কালো-কালো পালকের নিখুঁত ছুরি শুকোবার জন্যে জাপানি হাতপাখার মতন ডানা খোলে।

পুকুরের এদিকটায় অপলক শালুকের আবরুর মধ্যে মাথা গুঁজে মিষ্টিমদ গিলছে তিরতিরে কাঠফড়িং। বাঁদিকের নারকোল গাছটার পাতার ওপর ভজনালয় খুলেছে দাঁড়কাকের দল।সমগ্র পুকুরটা উঠে এসেছে রাত্তিরের অবগাহন থেকে।তোলা উনুনের ধোঁয়াপাকানো তঞ্জেবকাশিদা মসলিনের মতন কুয়াশায় ঢাকা কলাগাছের ডানার পিছনে খোড়ো একচালা।গোলাপি পায়ে পুকুরের জলতলকে চিরে ধবধবে পাতিহাঁস কুলবধুরা গ্রীবা উঁচু করে বেরিয়েছে পাড়া বেড়াতে। ওই বড়ো গাছটায়, কী গাছ কে জানে, পনেরো-কুড়িটা ওড়নশেয়াল জাতের বাদুড় ঝুলছে।

কলকাতা থেকে টানা ভাড়াগাড়িতে, চাঁপাডাঙা-বলরামপুর রোডে, মুণ্ডেশ্বরী নদীর পোলটার মুখে, রাস্তার ওপর পুকুরের ধারের ছাপ্পর-ছাওয়া ভেটেরাখানায় দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল যিশু আর ড্রাইভার। ট্র্যাভেল এজেন্সির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় যিশু ঘুরেছে ওদের গাড়িতে। চেনা। শেষপুকুর যাবার জন্যে যেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় বাঁক নিতে হয়, সেই গোপের হাট জায়গাটা দেখিয়ে দেবে ড্রাইভারকে।

গাড়ি তো আর নজর বাঁচিয়ে দেড় দিন পার্ক করে রাখা যাবে না।অলসের অনুসন্ধিৎসা সর্বাধিক।কাল সন্ধ্যায় আবার আনবে গাড়িটা ড্রাইভার।মোচ্ছবতলা আর তালটিকুরির মদ্যিখান দিয়ে গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখে বাবলাডাঙার ঢিপির গোড়ায় থাকবে গাড়িটা। আলের ওপর দিয়ে এলে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায় বাবলাডাঙায়। ওই গাড়িতেই ফিরবে যিশু। যিশু আর খুশিদি। বৈশাখী পূর্ণিমার মেলার জন্যে প্রচণ্ড ভিড় থাকবে সেদিন, চেঁচামেচি, নাগরদোলা, যাত্রাদল, হট্টগোল, চোঙার বাজনা, গুড়-বেসনের মেঠাই। হুকিং-করা জগমগে ঝিকিমিকি আলোর রোশনাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছেলের মতন হারিয়ে যাবে দুজনে কোথাও।এত বিশাল পৃথিবী।

ধুলোয় পড়া ভাঙা ভাঁড়ে সকালবেলাকার ভোমরালি মাছি। পচা আলুতে প্রতিপালিত স্বাস্থ্যবান মাছির রাজত্ব এই শুরু হল। বেলে মাছি, নীল মাছি, দিশি মাছি আর ডোরোসেফিলা মেলানোগ্যাসটার, যে মাছিগুনো আলুর পচাই খেয়ে দেবদাসের মতন মাতলামো করে।

চায়ের দোকানের হোগলা-বেড়ার পেছনে তেতো-নাজনের পাতাহীন গাছে শুকিয়ে আমসি তিন-গতরি ডাঁটা। কয়েকটা নাজে-খাড়া তিনফলা নোঙরের মতন তিন পাশ থেকে ওপরমুখো ঝুলছে। ধূসর ডালে তিড়িকনাচন খেলছে নালবুলবুলি আর ছাতারে পাখি।পিচপথ থেকে নেমে যাওয়া দুপাশের ঢালে কালবৈশাখীর বৃষ্টির প্রশ্রয়ে উৎফুল্ল মুজঘাস, চোরকাঁটকি, কাঁটাকারির হাঁটু-ঝোপ। তারপর কালচে-সবুজ হোগলাবন, একটা ঘোড়া নিমের গাছ। কোঁড়া-বেরোনো বাঁশঝাড়ের তলায় বাঁধা সৌম্যকান্তি রামছাগলটার বোটকা গন্ধ এতটা দূরে এসেও ভলক মারছে।তালকি তাড়ির হাঁড়ি আর মাটির ভাঁড় নিয়ে রাস্তার ধারে ধুলোয় উবু বসে খদ্দের সামলাচ্ছে, এই সক্কালবেলায়, শুঁড়িবাড়ির বুড়ি। আর কহপ্তা পরেই তো তালশাঁস। ঢাল থেকে নেমেই খেতের সবুজ প্রগলভতা।তিল, তিসি, পেঁয়াজ, রসুন।শ্যালো ঘিরে বোরো।ঠিকুলকাঠির টঙে চোখমুখ আঁকা রাজনীতিক-ঋষিতুল্য কালো হাঁড়ি।

টাট্টুটানা একটা ছক্করগাড়ি চলে গেল আলুর বস্তা নিয়ে। শিল পড়ে রয়ে-রয়ে মার খায়েচে গো, হিমঘরে জায়গা নেই, মহাজনও নেবেনে।যিশু জানতে না চাইলেও ওকে উদ্দেশ্য করে বলল বস্তার ওপর বসে-থাকা চাষি। তারপর লোকটার নিশপিশে স্বগতোক্তি, দেকি, চাঁপাডাঙায়, নইলে ফেলদোবো, উপায় নেই উপায় নেই, পচতে নেগেচে।

শিলাবৃষ্টি? আরে! ছাঁৎ করে ওঠে। লক্ষ করেনি এতক্ষণ। খেতের ফসল কি মাথা নত করে আছে? তার মানে পেঁয়াজ আর রসুনের গোড়ায় তো জল জমে গেছে।কী ভয়াবহ। একে আলু পচছে, তার ওপর এই।বিঘে প্রতি দেড় কুইন্টাল সুস্বাদু সুখসাগর পেঁয়াজ হয় এই জেলায়। আগেরবারেই তো হামজানপুর, বড়াল, জ্যামোর, ব্যাপসাগড়, চণ্ডীগাছা, দুয়ারপাড়া মৌজায় গিয়েছিল যিশু। পেঁয়াজ সংরক্ষণের সরকারি চাড়ও তথৈবচ।

সিজকামালপুরে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগারের কথা চলছে তো আজ কয়েক বছর হয়ে গেল স্যার, পেঁয়াজের আড়তদার তীর্থ পৈতাণ্ডি বলেছিল।

শিলাবৃষ্টি হয়েছে পর পর গত তিন দিন।তাইজন্যেই আসার সময়ে কাঁচা বাড়িগুলোর গোলটালির ছাউনি আর মেটেঘরের দেয়াল অমন মনমরা লাগছিল।গোলপাতার আর শনের ঝুপড়ি ফর্দাফাঁই। সকালের নবোঢ়া বাতাসের শীতল আদরে খেয়াল করেনি কিছুই।ভালোলাগায় অতর্কিতে বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ ধরে।

শেষপুকুরেও চাষিরা অসহায় স্নায়ুচাপে আর দুঃখে আক্রান্ত হয়েছে নিশ্চই, ভবেশকার রাজনৈতিক ওল উৎপাদন সত্ত্বেও।

দিন-খাওয়া চাষিবাড়ির ভেতরে পরিবেশটা কেমন? আগের বছর হিমঘরের আলু পচেছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। চাষিরা ক্ষতিপূরণ পায়নি। পাবেও না। এবছর আলু রাখার জায়গা নেই হিমঘরে, গুদামে, আড়তে।বৈশাখী পূর্ণিমার মেলাও তাহলে হবে নির্জীব। চোদ্দ কাঠার বেশি খাস বিলি হয় না। বর্গাদার খাবে কী? কর্জ চোকাবে কোত্থেকে? আর গাঁয়ে গাঁয়ে তেভাগা ফসল হয়ে এখন ফসলের এক ভাগ জমির মালিকের, দ্বিতীয়ভাগ নথিকরা বর্গাদারের, তৃতীয়ভাগ যে কামলাটা আসলে চাষ করে, তার।

পাঁচ সাক্ষ্যে মানুষ বর্গাদার হয়।কালীদাস গরাই বলেছিল, কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কই।

পুকুর-পাড়ের কলাগাছের আড়াল থেকে একটা ভিকিরিকে আসতে দেখে গাড়িতে গিয়ে বসল যিশু।কাছে এলে সানফিল্ম লাগানো কাচ তুলে দেবে।নিশ্চিন্দি।ভিকিরিরা হাত বাড়ালে বেশ বিব্রত বোধ করে ও।পার্স খুলে হয়তো দেখবে খুচরো নেই।নোট দেওয়া যায়, কিন্তু অন্য লোকেদের তাতে গোঁসা হয়। অ, বড়োলোকমি। ড্রাইভারের দ্বিতীয় ভাঁড় শেষ হয়নি।নয়তো ভিকিরিটা এসে পৌঁছোবার আগেই কেটে পড়া যেত।

লোকটা কাছে এলে, দেখল যিশু, বাউল আর ভিকিরি মেশানো এক তৃতীয় সম্প্রদায়। আধুনিকতা এদের এখনও নামকরণ করেনি।শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা এদের চায় না।পৌষ মেলার জন্য পেডিগ্রি দরকার হয় কী? কে জানে! পশ্চিমবাংলায় এরা বোধহয় উত্তরাধুনিক প্রাণী। গৃহবধু পকেটমারিনীদের মতন। বাউলের পদাবনতি হলে জাতভিকিরি হয়। ভিকিরিরা নিজের পদোন্নতি ঘটিয়ে নিজেদের আধা বাউল কিংবা নববাউল করে ফেলেছে।ক্লাবঘরের ফেকলুরা যেমন আঁতেল।

কাছে এসে ঝুঁকে, জানালার কাছে মুণ্ডু এনে, না, ভিক্ষে চায় না লোকটা, বলে, একটা চা খাওয়াও না কত্তা ; আর যিশুর দোনামনা শেষ হবার আগেই, দোকানদারকে বলে, নে রে মদনা, একটা চা আর লেড়ো দে দিকিনি, বড়ো সায়েব দিচ্চে, বড়ো সায়েবের সংসার ভরে উটুক নাতি-নাতজামায়ে।

যিশু খুঁটিয়ে দেখছিল বছর পঁয়তাল্লিশের কালোবরণ দাড়িপাকানো গড়নের লোকটাকে। গায়ের খসখসে চামড়ায় ছিৎরে পড়েছে বয়েস। দুরঙের হাওয়াই চপ্পল দুপায়ে।সবুজটা শনের ধাগায় বাঁধা।তাঁমাটে পায়ের দরানি-পড়া গোছে লাউডগা-সাপ শিরা। কাছা মেরে পরা ধুলোট হাফলুঙ্গি। বোতামহীন কমবয়েসি বুশশার্টের ফাঁকে চ্যাটালো পেটের ওপর পাঁজর দেখা যাচ্ছে। নানা রঙের তাপ্পি-মারা তেলচিটে ঝোলা

কাঁধে।ওষুধ বা মনিহারি জিনিসের টিনের একতারা।তাঁমার টান-টান ইলেকট্রিক তার। দাড়িতে বিশেষ চুল নেই লোকটার।কিন্তু মাথার কনকজটা নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত।জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-নেঙড়ানো একদা-আদল আন্দাজ করতে পারে যিশু।

বড়ো সায়েবকে তোমার গান শোনাও না ক্যানে।ক্ষমা করে দেবার অপত্য কায়দায় হুকুম করে খালি-গা চা-দোকানি, ডেকচিতে চাপানো আলুর তরকারিতে খুন্তি নাড়তে-নাড়তে।তারপর মৃদু হেসে যিশুকে, ও অনেক গান জানে স্যার, হাফু গান।শুনেচেন নিকি, হাফু? বাপ-চোদ্দোপুরুষের গান আমাদের এই হুগলি জেলার, তা হাফু তো উটেই গেল।

হাফু? শুনিনি তো!

লোকে গাইতে-গাইতে হাঁপিয়ে যায় তো, তাই হাফু।এগবার ধল্লে আবনি না বললে আর থামবেনে।ওতোরপাড়ার মুকুজ্জে রাজারা ভালোবাসত।

না, শুনিনি কখনও।

সোনেন্নিকো? বাউল-ভিকিরির কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনা।গলা কাঁপিয়ে, একতারায়, নাকি তোতারায়, ড়িং ড়াং বুগ বুগ।মাছ ভাজার তেল ছেটাবার শব্দ ওঠে গুপিযন্ত্রে।সোনেন কত্তা, মন দিয়া সোনেন,

ওগো কলিমালুর জোড়া

তোমার পচা বেগুনপোড়া

ল্যাং খেয়ে তোর চাগরি গেল

বুজলিরে মুকপোড়া...

ড্রাইভারটা সশব্দে হেসে ওঠে আচমকা।ভাঁড়ের চা ফুলপ্যান্টে পড়লে হাসি চুপসে যায়।

কিন্তু সে লোক তো কবেই পালটে গেছে। এখন তো ওন্নোলোক। তোমার হাফু পালটায়নি কেন? ঠোঁটে মুচকি এনে যিশুর প্রশ্রয়।গায়কের হাঁপানি রোগে ওর কণ্ঠে সব গানই হাফু।

পরবর্তী ড়িং ড়াং বুগ বুগ ধরে লোকটা,

সুবাস বোসের নাম ডুবোলি অণ্ডকোষের জামাই

ঠেককেদারি তুরাই পেলি লেইকো চুরির কামাই

তুদের সমাজবদল হ্যাঁ লা, ন্যাড় ঝোলাবার খ্যালা

থালে কেনরে এতো জুলুস-মিছিল

কেনরে ধানাই পানাই

হায় রে তুদের গোডিম ভাঙে নাই,

তুদের গোডিম ভাঙে নাই...

গান বোধহয় শেষ হয়নি, হাফু গান যখন। বাউল-ভিকিরি থেমে গেল চা-দোকানির কথায়। আগে ও পার্টি করত স্যার। মাধ্যমিক ওব্দি পড়েছেল। সোনাওনে সেই গানটে, সেই যে...

বাউল ভিকিরির সুরহীন ড়িং ড়াং আরম্ভ হয় আবার। বলল, ম্যাট্রিক আর দেয়া হল কই। আলুর আর চালের আকাল করে দিলে পোফুল্লবাবু ; চলে গেলুম চাঁপাডাঙা ইসটিশান পোড়াতে।সে আগুন আর নিববেনে কত্তা।রাবণের মুকে আগুন বলে কতা।

গোটা পনেরো দশ-বারো বছরের খালি-গা বালক জড়ো হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভরে গেছে এরকম লেখাপড়াহীন-কাজহীন কিশোর-কিশোরীতে। মাঠ আর পথ বেয়ে অমন আরও বালক-বালিকা আসছে। গ্রামে কিছু একটা হলেই এরা জড়ো হয়ে যায়।

সেই ইংরিজি গানটে সোনাও না বড়ো সায়েবকে।

ইংরিজি গান? তুমি বেঁধেছ? শোনাও দেখি।

সোনেন সোনেন:

দিনে মিটিং রাতে মেটিং

এই তো হোলো বাংলাদেস

আসে যায় মাইনে পায়

রাঁড়ের পো-রা রয়েচে বেস

কলঙ্কে গড়া রাজনীতিকদের গল্প আরও অশ্লীল হয়ে উঠতে পারে আঁচ করে, গাড়ি থেকে নেমে দোকানির পাওনা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে বাউল-ভিকিরিটাকে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট দিলে, লোকটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ড়িং ড়াং পাক খায়। বলে, শেষপুকুরের মেলায় যাবার ভাড়াটা দেলেন বড়ো সায়েব, তেনার নাতিপুতিরা সুখে থাকুক। তারপর গেয়ে ওঠে প্রকৃত হাফু গান,

মাছ ধরা হল না গো সই

দোটো পায়লা লেগেছে জালে

সই যে পাতালে

সব দেখে যা লে...

কী সবটা লে

যম না চিতিলে

যাকে খেলে লে...

ময়না ধানের খয় না

ছেলে কেন আমার হয় না

মক্কাশ্বর যাবি

তবে খোকা পাবি

তেঁতুল খেলে গা জ্বলে

আমড়া খেলে ব্যাং হলে

মাছ ধরা হল না গো সই.....

গানের মাঝেই ছেড়ে দিল গাড়ি।গাড়িতে জুত করে বসে, ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেগের আরামে, দুটো কাঠি নষ্ট করার পর, তৃতীয়টায় ধরাতে সফল হয় যিশু।হাফু গানের দুর্গতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওর মনে হচ্ছিল, কাউকে অপমান করলে, এমনকী গানের মাধ্যমেও, তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা বোধহয় দুটো ভালো-কথা বলা সম্পর্কের চেয়ে গাঢ়।গাঁয়ে-গাঁয়ে, পাড়ায়-পাড়ায়, এত যে আড়াআড়ি আর খাড়াখাড়ি বিভাজনের খেয়োখেয়ি আর দলাদলি, যার কোনো মাথা নেই মুন্ডু নেই, হয়তো সেকারণে।

গা-ছাড়া রাস্তার দুধারে, শনাক্তকরণ প্যারেডের মতন ভাটাম, চটকা, ইউক্যালিপটাস, বাবলা, শিরিষ।সবুজের ফাঁকে-ফাঁকে সকালের বলদর্পী আলোর ব্যাটন।উবড়ো-খাবড়া পথ, গতিকে গোরুর গাড়ির বেগে এনে ফেলেছে। পথের হাল স্থানীয় বিধায়কের ক্ষমতা বা জোচ্চুরি ফাঁস করে।

বেশ ভোর রাত্তিরে উঠতে হয়েছিল বলে তন্দ্রার আমেজ কাটাতে পারছিল না যিশু।চা-সিগারেট-হাফুর পরও।ওর খেয়াল হল গাড়ি থেমে রয়েছে আর চিৎকার চেঁচামেচির রেশ আসছে।কী ব্যাপার? ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল ও।

অবরোধ করতাসে পাবলিক!

অবরোধ? সে কী? আচমকা উদ্বেগের রক্ত ছড়িয়ে পড়ল যিশুর মুখমণ্ডলে।হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়।পৌঁছোতে আমাকে হবেই। তুমি হর্ন না বাজিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাও।

গাইড়িরে ড্যামেজ কইরা দিবে স্যার!

না-না, তা করবার হলে লোকগুলো ছুটে আসত এতক্ষণে। ওদের তো আমাদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখছি না।ওই তো, ওদিক থেকে গাড়ি আর বাস আসছে তো ভিড় কাটিয়ে।

জমায়েতের কাছাকাছি পৌঁছে যিশু দেখল রাস্তার পাশে রাখা কাঁচাবাঁশের মাচান বাঁধা দুটো মধ্যবয়স মৃতদেহ।পুরুষ আর চাষি বউয়ের।তুমুল চিৎকার করে কাঁদছে, বুক চাপড়াচ্ছে কয়েকজন।

এভাবে শোকপ্রকাশ কলকাতায় আর দেখা যায় না। ওফ, দ্যাখা যায় না এসব দৃশ্য। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে গেছে।একসঙ্গে দুজনের মৃত্যু।গ্রামবাসীদের মধ্যে মৃত্যুজনিত প্রাণচাঞ্চল্য।সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ও, যিশু।অচলাবস্থা গড়ে উঠতে পারে এদের আবেগের চাপে।তার আগেই দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া দরকার।কী হয়েছে গো? একজনকে জিগ্যেস করল যিশু।

মাল তুলেছে আজ দুবচ্ছর অথচ তাঁতি সমবায়ের ট্যাকা দ্যায়নে পান্না মাঝি।তাঁতিরা তাই চাষের ওষুদ খেয়ে মরচে।মহাজন দিয়েছেল সুতো।তা কী আর করবে।আগে পেটটা ভরাতে হবে তো।সুতো বেচে খেয়ে ফেলেচে।

ওওওওহ।এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল যিশু।ড্রাইভারকে বলল, চলো চলো।উদ্বেগে রক্তচাপ বেড়েছে নির্ঘাত।

তন্তুজ আর কী করবে! তাঁতিদের শীর্ষ সংস্থা।নিজেই তো এর কাছে ধার করে ওকে শোধ দ্যায়।তাঁত সমবায়ের পাওনা মেটাবে কোত্থেকে।টঙে-টঙে পার্টির লোক।দুবছর কেন, অনেক তাঁত সমবায়ের পাঁচ বছরের পাওনা মেটাতে পারেনি।যেখানেই বাঙালি আমলা সেখানেই রক্তচোষার দিগ্বিজয়।পার্টির প্রতি প্রভূভক্ত আমলা।

মুসলমান তাঁতি বউরা আজকাল বিড়ি বাঁধছে। মরদরা যাচ্ছে মাছ ধরতে। হিন্দু পরিবারের সদস্যরা হেস্তনেস্ত করে উঠতে পারছে না এখনও। শীর্ষ সমবায় যেসব গামছা লুঙ্গি ধুতি শাড়ি তুলেছে, তাঁত সমবায়গুলোর কাছ থেকে তা আদপে বিক্কিরি হবে কি না ঠিক নেই।ওদের দোকানগুলো সময়মতন খোলে না, আর বন্ধ হয়ে যায় সন্ধের আগেই।সরকারি কর্মী ওরা; ওদের দোষ দেয়া যায় না, দশটা-পাঁচটার চাকরি। তাঁতজিনিসটাই বোধয় দশ বছরে নিপাত্তা হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে।

দু-দুজন আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ পৌঁছোবে সৎকারের পর। সবাই তো আদিত্যর জাতভাই।কাঁচ তুলে এসি চালিয়ে দিতে বলল যিশু।ঘুম পাচ্ছে।

.

১৮.

বাবলাডাঙায় বাবলাগাছ আর নেই। রয়েছে অর্জুনগাছ, বয়োবৃদ্ধ। মোচ্ছবতলায় আর কোনও মহোৎসব হয় না। গোপের হাটে হাট আর বসে না, গোপরাও থাকে না। তালটিকুরিতে তালগাছ আর নেই।স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর, নামের মধ্যে জিনিসটা বা ব্যাপারটা আর থাকে না, নেই, ফোঁপরা।

মানে একেবারে নিশ্চিহ্ন।যেমন স্বাধীনতা, যেমন গণতন্ত্র, যেমন নাগরিকতা, যেমন ন্যায়, যেমন দায়দায়িত্ব, যেমন সত্য, যেমন কর্তব্য।ভাবছিল যিশু।বাবলাডাঙায় গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে অর্জুনগাছটা দেখিয়ে দিল যিশু, যার তলায় কাল, বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, চাঁদের আলো মেখে অপেক্ষা করবে এই গাড়িটা বা ট্র্যাভেল এজেন্সির নাম আঁকা অন্য যে-কোনও গাড়ি।

পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে যেও কিন্তু।

হঅঅঅ।পাক্কা।আমাদের দ্যাখসেন নাকি ডিউটি ফেল করসি?

মোচ্ছবতলায় কদমগাছের নিচে দাঁত বেরোনো ইঁটের চবুতরার ওপরে বসে গ্যাঁজাচ্ছে হাফবুড়োরা।কয়েকজনকে চিনতে পারল ও, যিশু।হিরু পাকড়ে।মন্দিরে ওকে রামচাকি বাজাতে দেখেছে।সুনীল মালিক, বাদল কোঁড়া, মানিক সাঁতরা, বদরুদ্দি খোনকার, সবাই বর্গাদার ; গত বছর এদের সমস্ত আলু পচেছিল হিমঘরে।আর ওই লোকটা তো জগৎ বাইন। আলুতে সারের ব্যবহার সম্পর্কে জিগ্যেস করতে গেয়ে উঠেছিল, বেনফেডের সার দিলি কনফেডের জামা, ধুতির নামে গামছা দিলি, ত্রাণের নামে মামা। রসিক লোকেরা, সত্যি, অদম্য ; নিজের দুঃখকষ্টকেও অলঙ্কারে মুড়ে তোলে।

ওর, যিশুর, পদবি, বিশ্বাস, সেটাও কেউ ঠিকমতন উচ্চারণ করতে চায় না।কেউ বলে, বিসসেস, কেউ বিসাস, কেউ বিহহাহ, কেউ বিষশ্বাস ; যার যা ইচ্ছে।চব্বিশ পরগণার কাজের বউদের বিরাট দল প্রতিদিন কলকাতায় কাজ করতে আসে।সবাই মুসলমান। অনেকে বাংলাদেশি মুসলমান।আসল নামে কাজ পাওয়া অনেক সময়ে মুশকিল বলে বউগুলো সরস্বতী, আরতি, সন্ধ্যা, কামিনী, অর্চনা নাম দিয়ে রাখে।যারা কাজ দেয় তারাও জানে।হিন্দু কাজের বউ হলে হয়তো নাম হতো খেন্তি, পেঁচি, পুঁটি ধরণের।

আত্মপরিচয় ব্যাপারটা বায়বীয় বোধহয়। বাবলাডাঙায় বাবলাগাছ আর নেই। বাবলাগাছেদের নামও আর নেই।বনবিভাগ গাছে-গাছে সংখ্যাচিহ্ন এঁকে রাখে।যিশু অন্য দিকে তাকাল।

বারবার ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও ওকে এই লোকগুলো সরকারি প্রতিনিধি মনে করে। অভিযোগের কান্না আরম্ভ করবে এক্ষুনি।যিশু বলে, আরে বাবা, আমি সে-লোক নই ; ওরা ভুরু কোঁচকাবে, থালে হাতবাকসো কেন, লাল কালি সবুজ কালির কলম কেন, ফাইল-কাগজ কেন, ইংরিজি লেকালিকি কেন!

মোচ্ছবতলার এই চবুতরায় কখনো নাকি শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্যে এসে বসেছিলেন। পাশবালিশের মতন গোল ভগ্নাবশেষটা হয়তো চাঁদনির ইমারতি থাম। অথচ কোনও বৈষ্ণবের দেখা পায়নি যিশু এ-তল্লাটে। অষ্টসাত্ত্বিকভাব বলতে নতুন চন্দ্রমুখী আলুর রাঙাপানা ত্বক।

তালটিকুরি আর মেলাতলা পেরোয় যিশু। দরমা, হোগলা, চ্যাঁচারি, চট, তেরপলের দোকানপাট। নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রা-অভিনয়ের মঞ্চ, সব জোগাড়যন্তর পুরো। হুকিংও।হুকিং করে বিদ্যুৎ না নিলে আর মেলা জমে না।রোশনাই-এর খরচ তো আর মেলা-দর্শকরা জোগাবে না। শনি, শেতলা, মনসা, শিব, ধর্মঠাকুর, সমস্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাতারা হুকিং করে নিজেদের আলোকিত করে রাখেন পশ্চিমবঙ্গে।ইষ্টদেবতা বলে কিছু আর নেই।সব সার্বজনীন।

মন্দিরে লোকজন নেই।যিশু দেখেছিল ঢুকে আগেরবার এসে।কে আর টের পাচ্ছে যে ও খ্রিস্টান।কলকাতার কালীঘাটেও ঢুকেছে।পাকা তাল আর জবাফুল হাতে শাঁখারুলি বধুদের প্যাচপেচে কিউ।ঢুকেছে দক্ষিণেশ্বরেও।মুলো হাতে দর্শনার্থীদের ময়ালসাপ লাইন।বিহারের লোকেরা কবজা করে ফেলেছে মন্দিরগুলোর ব্যবসাপাতি।ইশকুলে

পড়ার সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঢুঁ মেরেছিল।তাল আর মুলোর চল তখন ছিল না।এরকম সাংস্কৃতিক রদবদল বোধহয় উত্তরঔপনিবেশিকতার দরুন।চার্চগুলোও তো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কার প্রতিভা হারিয়ে ফেলেছে।

মন্দিরের দক্ষিণে বিশাল বটগাছ।বটগাছে যে এরকম গাদা-গাদা বুনো মৌমাছির চাক ঝুলে থাকে, শেষপুকুরে আসার আগে দেখেনি যিশু।কিসের মধু এরা জোগাড় করে কে জানে।আলুফুলের মধু হয়? মন্দিরের পেছনে তো বিরাট দামপুকুর, যার নামে এই গ্রাম।পুকুর খোঁড়ার সময়ে শেষনাগের প্রতিমা পেয়েছিল গোপেরা।বটতলার অজস্র ঝুরির সোঁদা অন্ধকারে আধা-অবহেলিত সেই পাথরটার নাম আজ বুড়োশিব।পুঞ্জীভূত সময়ের বিরামহীনতাকে ধরে রেখেছে দিনেমারের সময়কার এই বট গাছের সুকোমল অন্ধকার।মৌমাছিদের ডানাগুঞ্জনের ঝিরিঝিরি সুগন্ধ।

ভবেশকার বাড়ি যাবার কোনও নির্দিষ্ট পথ নেই।রাজনৈতিক দলাদলির মামলা আর পালটা মামলায় কাঁচা রাস্তাটা বছর দশেক থেকে আধখ্যাঁচড়া।আদালতের স্থগিতাদেশ উঠতে-উঠতে কোনোদিন এটুকুও ভেসে যাবে ঠিকেদারদের প্রার্থনায় প্রীত মুন্ডেশ্বরীর বদরাগি জলে।বাঁশঝাড়ের অধোবদন সবুজ বাতাসে জিরোবার জন্যে ঝরাপাতার ওপর ব্রিফকেস রেখে সিগারেট ধরাল যিশু। চারিদিকে নিস্পন্দ আলোড়নের ছায়াছন্ন তরিবাতময়তা।

এখন আগে বরং হিমঘরে গিয়ে এখানে আসার ন্যায্যতা প্রমাণ করা যাক, ভাবল ও, যিশু। হিমঘর আর বিদ্যুৎ-সাবস্টেশান তো দেখাই যাচ্ছে। বিদ্যুতের হুকিঙের লোড হিমঘরটা নিতে পারবে কিনা আঁচ করা কঠিন।আলুগুলো আবার হয়তো দমবন্ধ হয়ে মরবে।আলের ওপর দিয়ে হেঁটে, পরিত্যক্ত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছনের আমবাগানের পাশ দিয়ে, পিচ রাস্তার ওপর পোঁছল যিশু।এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটা যখন স্বাস্থ্যবান ছিল, তখন এখানে কাজ করত খুশিদির যুবক পাণিপ্রার্থী।দরোজা, জানলা, মায় ইঁটও উপড়ে নিয়ে গেছে স্বাবলম্বী মানুষ।

হিমঘরের ক্যাশিয়ার জয়দেব শাসমল আসছিল ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর সাইকেলে।যিশুকে দেখে নেবে পড়ে।কেঁদো থপথপে হাঁটুনি।এগিয়ে আসে মুচকি মুখে।

প্রথমদিন এই লোকটা ভেবেছিল যিশু বুঝি সরকারি আধিকারিক, চুরিচামারি ধরতে এয়েচে।তাই শুনিয়ে-শুনিয়ে জিভ-গোটানো মন্তব্য করেছিল, লিকতে দে, লিকতে দে, বাবারও বাবা আচে।গ্রামে গেলে, লোকে নিজের ভয় অনুযায়ী যিশুকে কিছু-একটা ভেবে নেয়। বিদ্যুৎ পর্ষদের লোক, হুকিং ধরবে। ব্যাঙ্কের লোক, ঋণখেলাপি উশুল করতে এয়েচে, পালাও।স্বাস্থ্য দপতরের লোক, টিকে দিতে, ওষুদ গেলাতে, এয়েচে। গ্রামীণ বিকাশের, মেলা বক্তিমে ঝাড়বে।

দেকেচেন নাকি? কাগোচে? ধুতির খুঁট পকেট থেকে টেনে মুখ পুঁছে জানতে চায় শাসমল।নিজেই খোলসা করে।বারাসাত হিমঘরের ইউনিট ম্যানেজার শান্তি চাটুজ্যে নাকি গা ঢাকা দিয়েচে, হেঁ হেঁ, বন্ডের বই ভুলে গিয়ে বাড়ি নে গেসলো। বলেচে জেলাশাসকের নির্দেশ মানিনে, হেঁ হেঁ।

ক্লান্ত যিশু চাইছিল কোথাও গিয়ে একটু বসে, এক গ্লাস জল খায়।আপাতত শাসমলের কথায় দেখনসই সায় দেয়া প্রয়োজন মনে করে হাঁসল কাঁধ নাচিয়ে।

শাসমল প্রশ্রয় পায়, আরেকবার মুখ পোঁছে চল্লিশোর্ধ ভুঁড়িদাস। বলে, আমডাঙা, বারাসাত, দেগঙ্গা ব্লকের চাষিদের আলু তো এই বোসেখ মাসেও হিমঘরের মাটে পড়ে আচে, হেঁ হেঁ।

মানুষ অন্যের অবমাননায় বা তাকে হেয় করার জন্যে যখন হাসে, মনে হল যিশুর, তখন হাসিতে ক্যারদানি ফলায়।এক-একজন এক-একরকম।ঠিঁউউউ।হ্যাঁহ হ্যাঁহ হ্যাঁহ। হা হা হা হা।ফিঃ ফিঃ ফিঃ ফিঃ।ইয়াহ ইয়াহ ইয়াহ।খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক।খিক খিক খিক।হুমফ হুমফ হুমফ।ওঃ হোঃ হোঃ।

শাসমলের কাঁধে হাত রেখে আরেকটু প্রশ্রয় দিলে যিশু।এই লোকটা বুঝতে পারে না কনসালট্যান্ট কাকে বলে।ভাবে উপদেষ্টার আবার কী দরকার।উপদেষ্টার উপদেশের দরদাম শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে এর।আলু, ক্যাশিয়ারকে জমিদারি দিয়েছে, নায়েবি ফলাবার জন্যে।চলুন না, আপনার হিমঘরেই যাই, একটু বসা যাক, আরও একাধটা ব্যাপার জানবার ছিল, আপনার মতো অভিজ্ঞ লোক তো বড়ো একটা দেখলুম না এলাইনে, বলল যিশু।তারপর শাসমলের ইতস্তত-ভাব দেখে স্তোক দেয়, আমি তো সরকারি লোক নই, জানেনই তো আপনি, জাপানি কোম্পানিতে কাজ করি, জাপানি মেশিন কত ভালো হয়, জানেন তো।

বারাসাতের আলু ঘোটালার কথা ভালোই জানে যিশু।এ আর নতুন কী।প্রথম ট্রাম-পোড়ানো ছাইমাখা সাধুসন্ত আজ সর্বত্র। সত্তর হাজার বস্তা রাখার জায়গায় রাখা হয়েছিল এক লাখ কুড়ি হাজার।পঁয়ত্রিশ হাজার বস্তার তবু জায়গা হয়নি, বাইরে পড়ে-পড়ে নষ্ট হয়েছিল।শিলাবৃষ্টির মার খেয়ে এলিয়ে পড়েছিল বস্তাগুলো।কালোবাজারে পাঁচগুণ দামে বন্ড কেটেছে ইউনিট ম্যানেজারের চোখের সামনে। পিওনটা গ্রুপ থিয়েটার করে।ওদের দলটার নাম প্রতিবাদী সভা।আকাদেমিতে নীলদর্পণ-এ ভালো অভিনয় করেছিল, ক্লাস।

ওই অঞ্চলে, বারাসাতের ওদিকটায়, হিমঘরের ভরসাতেই অত আলু চাষ হয়েছিল, অথচ ঠাঁই পেল মহাজনের আলু। সব বামপন্থী আর রামপন্থী দলে চেয়ার আছে মহাজনদের। তারা তো আর আজকের লোক নয়। মেহনতি চাষি যে সত্যি-সত্যি এমনতর মেহনত করে ফেলতে পারে, মাটির উমে ঘাপটি মেরে আলুগুলো নিজেরাই টের পায়নি, আমলা-গামলা তো কোন ছার।বর্গা আইন পাস করলেই যেন সব হয়ে গেল, ব্যাস, ভূমিসংস্কার শেষ! খেতে-মাঠে যা ফলছে তার কী হবে? তার তো হিল্লে করতে হবে।মেয়ের বিয়ে দিতে তো ট্যাকা চাই।চাষির বুক চাপড়াবার শব্দ পৌঁছোয়নি কোথাও।

মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছিল চাষিরা।ম্যানেজিং ডিরেক্টার বেংকটরমণ এক-খেপ পরিদর্শন করেছিল।জেলাশাসক অরুণ মিশ্র বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবার জন্যে প্রতিবেদন দিয়েছিল সরকারকে। পঞ্চায়েত সমিতির পৃথ্বীশ দে আর ব্লক আধিকারিক অভিজিৎ

মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট দৌড়ঝাঁপ করেছিল। অচলায়তন ভেঙে মুক্তধারা বেরোয়নি। জমিদারি উঠে গেছে, জমিদার ওঠেনি।হয়ত কোনও দিন উঠবে না।

বুজলেন বিসসেসবাবু, হিমঘরের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলল শাসমল, আমাদের এখেনে ট্রান্সফরমারের পোরসিলিন চুরি হয়ে দুদিন লাইট আসেনে, হেঁ হেঁ।

রাজনৈতিক ঋণমেলার ঠেলায় গ্রামীণ ঋণ বন্ধ করে দিয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্ক।মেলার মজা লুটল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র। নয়তো ঠিক সময়ে আরও কটা হিমঘর দাঁড়িয়ে যেত পশ্চিমবঙ্গে। একটা হিমঘর বসাতে তিন কোটির মতন টাকা দরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে।

হিমঘরে পৌঁছে যিশু দেখল, শেডে এখনও শ'দেড়েক বস্তা পড়ে আছে।গোটা দশেক হাফল্যাংটো মুটিয়া ঘুমোচ্ছে।ওদের ঠোঁট থেকে শেষ তাড়িটুকু শুষে নিচ্ছে বেলে মাছির দঙ্গল।এলা মাটির ডাঁই।বাতিল আলু ছড়ানো-ছিটোনো চাদ্দিকময়।তার ওপর দিয়েই হেঁটে অফিসঘরে যেতে হল যিশুকে।একটা থনঝোলা বুড়ি সাদাকালো ছাগলি শুঁকে বেড়াচ্ছে বাতিল আলু, খাচ্ছে না।

লোক লাগিয়ে নিজেরাই হয়ত ট্রান্সফরমার খারাপ করিয়ে রাখে।আলু পচলে বিদ্যুৎ পর্ষদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার সুযোগ থাকবে। একশো বত্রিশের তেত্রিশ কেভির ক্ষমতাসম্পন্ন।সোজা কথা নয়।

আপনাদের তো জেনারেটর আছে? অনেক হিমঘরে দেখেছি বিদ্যুতের চেয়ে ডিজেল সস্তা বলে অষ্টপ্রহর জেনারেটর চলছে, বলল যিশু।

স্টোরকিপার কৃপাসিন্ধু আশ এসে দাঁড়িয়েছিল।বলল, আঁগগে ডিজেল ছেল না।রসুলপুর থেকে নিয়েলুম। আআআর বলেন কেন।তা ওইটুকুন শীত হিমঘরে ধরা থাকে।খেতি হয় না।

শাসমল পৈতেতে বাঁধা চাবি দিয়ে ক্যাশিয়ারের ঘরের তালা খোলে।শাসমলরা কি বামুন যে পৈতে পরে আছে? কে জানে, হবেও-বা। আদিত্য ভালো বলতে পারত। পলিশহীন আমকাঠের চেয়ার-টেবিল এলা মাটির ধুলোয় গেরুয়া। দেয়ালে সত্য সাঁইবাবার হাসিমুখ ঝাঁকড়াচুল ছবি। কোণে, মেঝেতে, স্টোভ। চা ফোটানোর অ্যালুমিনিয়াম ডেকচি।তলানিপড়া তিনটে খুদে মাপের কাচের গেলাস।মাছি অধ্যুষিত। প্লাসটিক বয়ামে চিনি, চা, গুঁড়ো দুধ।

চা খাবেন নাকি?

নাঃ।মুন্ডেশ্বরী পোলের আগে খেয়েছিলুম আসার সময়ে।এখন বরং এক গেলাস জল খাওয়ান।

কুঁজোর ওপর ঢাকা দেওয়া স্টিলের গেলাসে জল গড়িয়ে শাসমল বলল, অঅঅঅঅ। হরেন পাইকের ছেলের দোকানে।ভালো চা করে।ময়দার পরোটা আর আলুর দমটাও ভালো করে।হরেন পাইকের হাফু গান শুনলেন নাকি? হেঁ হেঁ।

যিশু স্তম্ভিত।হরেন পাইক? বাউল ভিকিরিটা চা-দোকানির বাবা।বাবা-ছেলের সম্পর্ক এমন স্তরেও পৌঁছোয়।মাই গড।বলল, হ্যাঁ, হাফু কিনা জানি না, নিজেই গান বেঁধেছে মনে হয়।একতারাটাও হাফুছাপ।

ওওওই যখন যা খবর হয় আর কী।শেষপুকুরে মেলা বসলেই আসে ফিবছর।থাকচেন তো, কাল, মেলায়? মেলাটা এবার জমবে না বোধায়।

কেন?

মহাজনের সঙ্গে দেকাদেকির ভয়ে চাষিরা আবার আসে কিনা দেকুন।ব্যাঙ্কের বাবুরাও তো একটা ঘর নিয়েচে।

শেষপুকুরে আসবার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্যে, শাসমলের আর কৃপাসিন্ধুর কাছে যিশু যখন আবোল-তাবোল আগডুম-বাগডুম ফাঁদছে, পিওন মুরারি প্রামাণিক, শালপ্রাংশু ষাঁড়ের মতন নজরকাড়া ছাতি, বলল, আবনার সেই আলোজ্বলা ল্যাপটু টাইপযন্তরটা আনেননি এবার?

ল্যাপটপ? ওটা তো কমপিউটার।না, আনিনি।বলল যিশু।ল্যাপটপে খুশিদির ফোটো লোড করেছে ; এদের সামনে খোলা যাবে না আপাতত।

লেকালিকি সব হয়ে গেচে? বই হয়ে বেরোবে তো, না?

এই সামান্য কিছু বাকি।তাই তো এলুম আপনাদের কাছে।তারপর প্রশ্নমালার লাটাই থেকে সুতো ঢিলে করতে থাকে যিশু।উত্তরদাতাদের ঋতুবন্ধ খুলে যাবার আহ্লাদ।

এবার সবাই রাধাপদ্ম চাষের কথা ভাবচে।

রাধাপদ্ম? জানা নেই বলে ক্ষুণ্ণ হয় যিশু।

ও ওই সুযযোমুখি ফুল, বলল কৃপাসিন্ধু।তারপর দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে প্রায় স্বগতোক্তি, আলুর বুক এমন টাটিয়ে উডলো গেলোবছর।আবনি হলেন গে রায়রাঁয়া লোক, দেকুন যদি চাষিদের কিচু উবগার হয়।কৃপাসিন্ধুর মুখে গরম বালিতে চাল ভাজার গন্ধ।

শাসমল পান্তা ব্রেকফাস্টের হাঁইইইই হাঁইইইই হাঁ-মুখ খুলে সুরেলা হাই তুলে যাচ্ছে কিছুক্ষন অন্তর।ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা আলুর মধ্যে মুটিয়াগুলো সম্পর্কে উদাসীন একটা ডেঁপো ইঁদুর চষে বেড়াচ্ছে।আমোদে উড়ছে দুচারটে শুকনো আমপাতা।

গোগ্রাসে ছুটন্ত একটা রাতকানা ট্রাক চলে গেল।হাম্প ডিঙিয়ে, ডিগুম ডিগুম তুলে।

সবশেষে, আদপে যেটা জানতে চায় যিশু, সেই প্রশ্ন করে।আচ্ছা ভবেশকা কি বাড়িতে আছেন?

অ্যাই দ্যাকো অ্যাগবারটি।আগে বাড়ি যাননি? ভবঠাকুর তো আরামবাগ গ্যাচে খড়ের ছাতু কিনতে।ওই যে মাশরুম চাষের বীজ, তাই আনতে।তারোপোর পার্টির কাজ তো আচেই।ফিরতে সেই সোনধে।মুরারি প্রামাণিকের মিছিল-চনমনে উত্তর।

জবাবের আঘাতে টলে যায় যিশু।ওফ।গাড়িটা না ছাড়লেই হত।আজই ফিরে যেতে পারত।অনুশোচনার সর্পাঘাতে আক্ষেপের বিষ ছড়িয়ে পড়ে অস্তিত্বে।হিমঘর অফিসের দোরগোড়ায় কূট প্রশ্নের মতন শেয়ালকাঁটা। গেটের বাইরে রাস্তার ওপারে দুলছে অর্কমন্দারের জংলি ডালপালা।বকুলপাখিদের উচ্চবাচ্যে মুখরিত।

এরকম একটা জায়গায় রাস্তার ওপর স্পিডব্রেকারের হাম্প! না আছে কাছে ইশকুল, না আছে জনবসতি। হয়তো বা তোলা আদায়ের নতুন ধাঁচের জমিদারি খাজনা আদায়। হয়তো ভবেশকাই প্রথম তোলা-আদায় শোষণ-পাঁয়তাড়া আবিষ্কার করেছিল।তোলা আদায়ের খরচ মেটাতে পরিবার পিছু এক পয়সা।তাঁমার পয়সা চালু ছিল তখন।আর এখন গতিকে স্তিমিত করা আর রুদ্ধ করার নাম প্রগতি।

আত্মপ্রসাদে ভেজা কণ্ঠস্বরে শাসমল বলল, চলুন না পৌঁছে দিই ; সাইকেলের পেচনের সিটে বসতে পারেন তো? বাকসোটাকে কোলে ধরে নেবেন, যা আগুনশর্মা চড়চড়ে রোদ।

সন্ধিক্ষণ।এ-ই তো সন্ধিক্ষণ।ভবেশকা নেই।সময়ের সম্রাজ্ঞী এখন খুশিদি। ওর পক্ষে অত্যন্ত হাস্যকর, সিটে বসে যেতে তক্ষুনি রাজি হয়ে যায় যিশু।কণ্ঠের গোড়ায় লুকিয়ে থাকা আওয়াজহীন ঢক্কানিনাদ টিপ-টিপ করে ধাপে-ধাপে নেমে যাচ্ছে বুকের মধ্যে।জ্ঞান তো ক্ষমতার বনেদ।যে আবাদ করবে, সে-ই জানবে কেবল।

প্রকাশ করা যায় না এমন তীব্র আবেগের ধাক্কায় সারাটা পথ প্যাঙপেঙে সাইকেলের পিছনের সিটে চুপচাপ বসে থাকে ও, যিশু।আগে এরকম কখনও হয়নি।যৌনতা নয়। যৌনতা তো তৃপ্তির বাজারে অঢেল।ওর মাথার কাছে সঙ্গী এক হলুদ বোলতার বুঁবুঁবুঁ বুঁবুঁবুঁ সত্ত্বেও বসে থাকে কথাহীন উদ্বেগে।

বুজলেন যিশুবাবু, আমার মতন টাকমাতা লোকের আপনার অমন একরাশ চুল দেকে হিংসে হচ্ছিল, সেইটেই জানান দিচ্চে বোলতাটা।যিশু বলল, বোলতাটা আমার চুলের গোপন তথ্য জানতে পেরেছে বোধহয়!

দুপুরের রোদ এপাশ-ওপাশ আরম্ভ করেছে।হাসাহাসি করতে-করতে ইশকুল যাচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে, খাতাপত্তর হাতে, ইশকুলই হবে, প্রাইমারি।জলতেষ্টায় দীর্ঘশ্বাস গেলে যিশু।

পাতাঅলা ফণীমনসার ঝাড়ের কাছে, মাটিতে বাঁ আর প্যাডেলে ডান পা, রোদের উষ্মা বাঁচাতে মাথায় ধুতির খুঁট, শাসমল বলল, ওই কলাবাগানে, ওই যে, গোলাপি-গোলাপি করমচা হয়ে রয়েচে, ওর পাশ দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটলেই ভবঠাকুরের নাচদুয়োর।

পথের ধারে কচুরিপানা গিজগিজে জলায়, সংসার চিন্তায় এক পায়ে ঠায়মগ্ন মেছোবক। গঙ্গাফড়িঙের ঝিমুনির খাতিরে হাতের পাতা মেলে আছে জলকলমি।

ঠিকাছে, কাল সকালে একবার আসব।ভুরুর ওপর বাঁহাতের ছায়া ফেলে,ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে মুক্ত হল যিশু।শর্টকাটের বদলে ঘুরপথের মুখে ছেড়ে দিয়ে গেল লোকটা। এর চেয়ে তো একা গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেত আলের ওপর দিয়ে।

হাঁটছিল যিশু। কলাবাগান। রকমারি কলা। তেউড়ের ব্যবসা নিশ্চই। বেহুলা, মন্দিরা, বাতিসা, জাঁতিকোল, মালভোগ, কানাইবাঁশি, চিনিচাঁপা, জাহাজি, মনুয়া, ডয়বাকলা।

একজন আইধোইরা তেউড় চাপাচ্ছিল ভ্যান রিকশায়, জানতে চাইল, কটা বেজেছে এখুন।যিশু বাঁহাত নাড়িয়ে দেখায় ঘড়ি নেই।কাজ আরম্ভ করার মুহূর্ত থেকেই অনেকে চায় তা তক্ষুনি শেষ হোক। করমচা গাছের পর বড়ো-বড়ো পাটিগাছ। কুচবিহারের মাথাভাঙায় এর শেতলপাটি হয়, দেখেছে যিশু, একটা পাকানো পাটি উপহার পেয়েছিল, সেটা দিয়ে কার্পেটের কাজ চালায় ।

পাটিগাছের লাগোয়া দরমার বেড়ার ওপর সার বেঁধে ছড়ানিটিকার সংলাপ বলছিল ফাকতা পায়রাদের ভ্রাম্যমাণ দল।ফটফটিয়ে উড়াল দিলে অচেনা লোক যিশুকে দেখে। দরমার বেড়ার ভয়াবহ স্মৃতি থেকে মুক্ত হতে পারেননি ভবেশকা।কী ভয়ংকর এলাকা ছিল দরমার অভিশপ্ত কলোনিগুলো।খাস কলকাতার লোকে যেতে চাইত না ভয়ে।সন্ধে হলেই ময়ূরভঞ্জের রানির বাড়ি থেকে গোড়ে ওব্দি ওৎপাতা আতঙ্ক। মুসলমান ফুলচাষিগুলো গোড়ে গ্রাম থেকে পালাবার সময়ে গ্রামের নামটা নিয়ে পালিয়েছিল, গোড়ের মালার সঙ্গে-সঙ্গে।সেই গোড়ে এখন নোংরা ঘিঞ্জি গড়িয়া।ভাবা যায় না।

পরপর তিনটে ধানের মরাই পেরোয় যিশু। অব্যবহৃত পোর্টেবল শৌচাগার। ছায়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাটির খয়াটে প্রতিমার ভিড়, কয়েক বছরের খড় বেরোনো, আঁচ করে যিশু, বোধয় শনি, শেতলা, বিশ্বকর্মার, রক্তাল্পতায় জ্ঞান হারিয়ে নিমতলায় অপেক্ষা করছে প্রকৃতির দাপটের জন্য। তাদের ঘিরে কংরেস ঘাস। বকফুলের গাছ। কত্তো ফিকে সবুজ বকফুল।আশশ্যাওড়া, হিমচাঁপা, কোকিলাক্ষ করবী, বেগনে রঙের কলকে।পায়ের কাছে ফুরফুরে সুশনি-শাক।

পুকুরে চান করতে নেমেছে খুশিরানি মন্ডল।

.

১৯.

কে রে ওদিকে? তিরস্কার-মাখানো কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে অপ্রস্তুত খুশিদি। তাড়াতাড়ি জলে নেমে কেবল মাথাটুকু জলের ওপর।চুল ভাসছে।

আমি যিশু।যিশকা।

যিশু! তবে? কালকেই তো বৈশাখী পূর্ণিমা।আমি ভাবলুম....

কী করে ভাবতে পারলে খুশিদি?

আমি ভাবলুম আমার বয়েস ফুরিয়ে গেছে বলে..। খুশিদির মুখমন্ডলে ফোঁপানির পূর্বাভাস।প্রতিবিম্ব দোল খায়।

তা ভুল।অমন ভেবো না।তুমি অপূর্বময়ী।

তুই ঘরে গিয়ে জিরো।আমি একটা ডুব দিয়েই আসচি।

না, তুমি চান করো। আমি দেখব। ঘাটের সিঁড়িতে ব্রিফকেস রেখে বসে যিশু। জুতো-মোজা খোলে। পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে বসেছে।

অনেক অনেক অনেক অনেক বছর পর সাঁতার কাটছে খুশিদি।

বুকের গামছা ভাসিয়ে দিয়েছে খুশিদি। শায়াও নামিয়ে দিয়েছে ফাঁস খুলে। জলের চাদর গায়ে জড়িয়ে জলেতে খেলতে থাকে ছিপছিপে ঢ্যাঙা পেশল-গড়ন, খুশিদির একরাশ চুল।

অনির্বচনীয় স্পন্দন ওঠে জলতলে। পুকুরটাকে জুড়ে সমগ্র ভূমণ্ডল চাষি-মেয়ের আনন্দিত নিরাভরণে অভিভূত। নারীর তরল রূপ পায় জলখন্ডের অমেয় কায়াকান্তি। আসক্ত করে তোলে দশাসই চিতল আর কাতলদের। মৎস্যকুমারী খুশিদি একজায়গায় কিছুক্ষণ তলিয়ে গিয়ে দেদীপ্যমান করে তুলছে আরেক দিকের জল। তলিয়ে ভেসে না-ওঠা ওব্দি যিশু রুদ্ধশ্বাস।

হিরের টুকরোয় রুপান্তরিত জলের প্রাঞ্জল ফোঁটারা লাফিয়ে উঠছে বিশাল প্রজাপতির ডানার ঝাপটায়, তারপর ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে জলের ওপর পড়ে। বাতাস আচমকা নিরুচ্চার। রোমহর্ষে আক্রান্ত হয়েছে ঘাটের পাশে আমলকি পাতারা, নিঃশব্দ জলতরঙ্গের রিনরিন পাতায় পাতায়।

এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে, ওইদিকে, এইদিকে, চারিদিকে, যিশু যেদিকে তাকায়, পুকুরের জলকে উদ্ভাসিত করে তুলছে ত্বকের আলো। রোখ চেপে গেছে প্রথম অনর্গল উৎসর্জনের, নিজেকে উজাড় করার কমনীয়তা। নমনীয়তায় ভর করেছে আজীবন জমানো ব্যথা বেদনা পুলক অভিমানের ভাঁড়ার।

স্বতঃপ্রবৃত্ত পুকুর সাঁতরাচ্ছে খুশিদিকে ঘিরে, সারা গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে আপ্যায়ন। নারীর জ্যোতির্ময়ী আদলে রূপান্তরিত হয়েছে জলে আটক তরল দুপুর। আর জলেতে ছড়িয়ে দিচ্ছে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এসে-পড়া সূর্যরশ্মির গুঁড়ো।

মুক্তি পেয়ে গেছে শাড়ি শায়া ব্লাউজ ভিতরের জামায় এতকাল অন্তরীণ দেহলাবণ্য। মুক্তি পাচ্ছে খুশিদের মাথার মধ্যে জমা উদ্দেশ্যহীনতা, অবসাদ, দিনানুদৈনিক।

দুই হাঁটুর ওপর দু'কনুই রেখে, দু'হাতের পাতায় দুই গালের ভার ছেড়ে দিয়ে, পায়ের পাতা জলেতে, ট্রাউজারের কানাত ভিজছে, যিশু শুনতে পায় নিজের হৃৎপিণ্ডের ক্বণ, নিক্বন, শিঞ্জন, শিঞ্জিনী। মসিদখানি, রেজাখানি শুনতে পায়। ঝাঁজ, ঝাঁজর, দগড়, চিকারি, খমক শুনতে পায়। দেখতে থাকে খুশিদির বিভোর ভাসমান বুক, জানু, মুখশ্রী, এলোচুল, অনাবিল ব্যাকস্ট্রোক, প্লবমান চিৎসাঁতার, উড্ডীন বাটারফ্লাই, অনুসন্ধানী ডুবসাঁতার।

এক ঘন্টা, হয়তো দু'ঘণ্টা হয়ে গেল, হুঁশ নেই। জলের সঙ্গে খেলছে চাষিমেয়ে। বাড়িয়ে তুলছে জলের তাপমাত্রা।

যিশু আমূল সম্মোহিত। পৃথিবীতে ভ্রুক্ষেপ বলে কিছু নেই। লবনাম্বু উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমের মতন ও, যিশু, টের পায়, অনুরণনের দপদপে লয়ে নিজের উদগ্রীব,

থমথমে, উপদ্রুত আহ্বান।খুশিদির বয়েস একটা স্থিতিতে স্থির হয়ে আছে।তারপর আর বাড়েনি।খুশিদির চেয়ে ইতিমধ্যে বয়েস বেড়ে গেছে যিশুর।

শুশুকের মতন জলের পোশাকসুদ্দু আচমকা উঠে, বাঁহাতে গামছা আর শায়া, জলের তৈরি সলমা-সিতারায় ঠিকরোচ্ছে রোদ্দুর, জলের তৈরি স্বচ্ছ পুঁতি বেজে উঠছে প্রতিটি চুলের প্রান্তে, যিশুর কাঁধে ডান হাতের ভর দিয়ে, খুশিদি একছুটে গিয়ে দাঁড়াল ভাঁড়ারঘরের ছেঁচতলায়। ডাকে হাতছানি দিয়ে। দরোজার আগড় ঠেলে চলে যায় ভিতরে।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে স্পর্শ করলে গড়ে ওঠে এক ব্যাখ্যাহীন দায়দায়িত্ব।

এক হাতে জুতো জোড়া, আরেক হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ঘরে ঢুকে যিশু দেখল উদোম খুশিদি চুল ঝাপটাবার আগে গামছা নেঙড়াচ্ছে।ভিজে চুলের প্রান্ত থেকে শানের ওপর টুং টাং টিং টুং ঝরে পড়ে মিহিন বাজনা-তরঙ্গ তুলছে পোখরাজের খুদে-খুদে পুঁতি। প্রতিটি জলফোঁটার পতনে, আশ্চর্য হয় যিশু, বালক-বয়সে শোনা মায়ের কণ্ঠ আবছা ভেসে আসছে :

টুং : যিশকা, দুপুর রোদে টো-টো করতে বেরিয়ো না, জ্বর হবে।

টাং : ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা কোরো না যিশকা, ওরা হিদেন।

টিং : আজকাল যিশকা তোমার কথাবাত্রায় রিফিউজিদের মতন টান এসে যাচ্ছে।

টাং : তুমি নাকি দক্ষিণেশ্বরে হিন্দু টেম্পলে গিয়েছিলে যিশকা?

টুং : খুশির সঙ্গে অমন হাসাহাসি কোরো না যিশকা।ওরা ইল ম্যানার্ড, চাষাভুষো।

টিং : চাদর নোংরা হলে কাচতে বের করে দাও না কেন যিশকা!

টিং : যিশকা, অত বাংলা স্টোরি বুকস পড়ে সময় নষ্ট কোরো না।

টাং : তোমার চুল সবসময়ে অত আনটাইডি থাকে কেন যিশকা।

টুং : অত-অত ভাত ছোটোলোকরা খায়।

টিং : স্কুলের খাতায় ওসব হিজিবিজি লিখেছ কেন?

খুশিদির স্মিতস্নিগ্ধ আভায় ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে টলটলে শীতলতা। ঝিকমিক করছে কেশকূপ। অবিনশ্বরতার সমারোহ মনে হয়। চোখের তারায় আত্মগোপনরত রূপাতীত বিষাদের শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ছে মেঝেয়। চোখ দুটো আরোগ্যকামনার মতন আয়ত। জুতো আর বাকসো মাটিতে রেখে লুই ফিলিপে আর পিয়ের কার্ডিন থেকে দ্রুত মুক্ত হয় যিশু।

দু'বাহুতে নিয়েই, আঃ, কী শীতল।একেই হয়তো প্রাণ জুড়িয়ে-যাওয়া বলে।শামুকের মাংসের মতন ঠাণ্ডা কোমলস্বভাব বুক।অস্ফুটস্বরে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।নিশি-পাওয়া প্রাণীর মতন স্পর্শেন্দ্রিয়।হৃৎস্পন্দনে থিরথির কাঁপছে ত্বক, চ্যাটালো নিম্ননাভি।

প্রায়ান্ধকার বিশাল ঘরটা, এ বাড়ির সবচেয়ে বড়ো ঘর, যেন নিঃসঙ্গ শোকসন্তপ্ত অচলায়তন। খেতমজুরের, চাষির আর শ্রমিকের হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি আর কাজের জিনিসে ঠাসা ঘরখানা।

আষ্ঠেপৃষ্ঠে, চাউনির ওপর চাউনি মেলে, শুকনো স্পর্শের ওপর ভিজে স্পর্শ সামান্য তুলে খুশিদি বলল, হ্যারে যিশকা, সকাল থেকে কিচু খাসনি বুজি? মুখ থেকে খিদের গন্ধ বেরুচ্চে? সিগ্রেটের গন্ধও বেরুচ্চে।তোর গা কী গরুম!

হ্যাঅ্যা গো, খাইনি কিছু।সত্যি, তুমি আমার মা আমার দিদি আমার বউ আমার বন্ধু আমার গডেস, সবকিছু।ডেঁড়েমুশে আদর করছিল যিশু।গতরের মোহময় নিভৃতি জুড়ে চারিয়ে দিচ্ছিল এক্তিয়ার, যথেচ্ছ প্রবণতা। দু'গাল ভাত বসিয়ে দিই। আরেকবার নেয়েনে।

সৌজন্য জানাবার ভঙ্গীতে, ঘরের মেঝেতে ডাঁই-করা মাছ ধরবার জালের ওপর এলিয়ে পড়ে খুশিদি। দেয়ালে খুঁটিতে, কোণে, মেঝের ওপর, বেড়াজাল, বিনজাল, পাঁতিজাল, খেপলা জাল, কুঁড়ো জাল, ভাসা জাল, চুনো জাল, টানা জাল, শ্যাংলা জাল, উঁখা জাল, ধর্ম জাল, খেটে জাল, বেঁওতি জাল, ঘুরণ জাল, ওঃ, কতরকমের আঁশটে গন্ধের জাল!

অ্যাতো জাল কী হয় গো?

ভাড়া খাটে।

ভাড়া?

হ্যাঁ, মাঝি জেলে মালোরা নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে।খালে বিলে পুকুরে দামোদরে যায় গঙ্গায় যায় সমুদ্দুরে যায়।

যিশু চুপসে যায়।সেই ভবেশকা।শ্রমিকদের আর শোষিতের নেতা ভবেশকা।আজকে তাদের হাতিয়ারকে ভাড়া খাটাচ্ছে। এই ঘরের সবই ভাড়ার, অবিশ্বাস্য। লাঙল, জোয়াল, ডিজেল-পাম্পসেট সব, সব, সব ভাড়া দেবার জন্যে।

ওই পেতলের ঘড়াগুলো? ওগুলোও ভাড়া দেবার?

না, ওগুলো বন্দকি।চাষি বউরা, মুনিশ বউরা বন্দক রেকেচে।

বন্ধক?

বন্দক জানিস না? বনদোওওওক বনদোওক। ঘড়া-বাসন বাঁধা দিয়ে ট্যাকা ধার নিয়েচে।

সুদে টাকা নেবার জন্যে?

হ্যাঁরে।একশো ট্যাকায় মাসে দশ ট্যাকা।

মাসে?

হ্যাঁ, মাসেই তো।কেন?

ঘড়াগুলোর ওপর, যেগুলো খুশিদির মাথার কাছে রাখা, দেখতে পাচ্ছিল যিশু, তাতে ছোটো-ছোটো কাগজ সাঁটা। কাগজের ওপর নাম আর তারিখ দেওয়া। লক্ষ্মী লোহার। পদ্ম মান্না। বিবিজান। রাধা পোড়েল। চম্পা সাঁপুই। কনকবালা দাস। আশা ঘরামি। আরও অনেক অনেক অনেক অনেক। পিতলের বাসন চিরকাল থেকে যাবে। মন খারাপ হয়ে যায় যিশুর।

তোমার পিঠে ফুটছে না তো? উষালগ্নের মতন বাহুমূলে ছোঁয়া বুলিয়ে জানতে চায় যিশু। দৃশ্যমান জগৎ থেকে এই ঘরের বস্তুপৃথিবীকে অস্বীকার করার জন্য ও চোখ বোজে।

খুশিদির চাউনি হিমায়িত, শ্বাস গনগনে, খিদের গন্ধের খোঁজে পুরুষের হাঁ-মুখে নারীর অনাস্বাদিতপূর্ব জিভ। গলা-কাটা মোরগের মতন কেঁপে ওঠে শরীর। সাপ যেভাবে জিভ দিয়ে গন্ধবস্তুর কণা বাতাস থেকে তুলে নিয়ে নিজের ঘ্রাণিকা ইন্দ্রিয়ের গ্রন্থিতে মাখিয়ে নেয়, ওরা দুজনে একে আরেকের ভারাতুর অনুভূতি মেখে নিচ্ছিল অসংলগ্ন কথাবার্তা দিয়ে। প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে ওদের হাত, ভক্তিনম্র স্পর্শ।

কাল, বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, শেষপুকুর ছেড়ে যাবার বিস্তারিত পরিকল্পনা শুনে খুশিদি বলল, আমার তো কেমন যেন ভয় করচে, আজগে এক্ষুনি চলে গেলে ভালো হতো। শুনে আবার অনুশোচনা হল যিশুর। গাড়িটা রেখে দিলেই হতো বরং। খুশিদির ভয়ের যে কী আছে এই বয়েসে।

তোমাকে তো জোর করেই নিয়ে যেতে পারি।

না না না না না না।

অদ্ভুত, সত্যি। ভাবল যিশু। পশ্চিমবাংলার গ্রাম মানেই ভয়ের চক্রব্যূহ।

এ-ঘরেই শুস তুই যিশকা। থালে দাদার সন্দেহ হবে না। মশারি টাঙিয়ে দেবোখন রাত্তিরে। তুই যদি পালটি ঘর হতিস কত ভালো হতো থালে।

পালটি তো। তুমি মেয়ে, আমি ছেলে।

খুশিদি ওঠে ওভাবেই, নিরাবরণ, খাটের ওপর রাখা জালগুলো নামায়। খাটের তলায় রাখা মরচে-পড়া হাতুড়ি দুরমুশ কাস্তে করাত কাটারি উকো নিড়ুনি হেঁসো টাঙি বল্লম খন্তা গাঁইতি দাউলি কোদাল ঠিক করে সাজায়। ঘরের মাঝে রাখা ডালা কুলো ডাবড়ি চারি সিউনি তসলা ধামি এক-এক করে এক পাশে সরিয়ে গুছিয়ে রাখে। কাজের দ্রুততায় যিশু অবাক, মুগ্ধ। ঘেমে গেছে।

ছাদ-পাখার সুইচ টিপে খুশিদি বলল, ঠিকাছে, চলছে, রোজই তো অ্যাগবার দুবার ঢোকে দাদা।

জিরিয়ে নাও একটু, ক্লান্ত হয়ে গেছো।

যাঃ দাঁড়া, চাদর তোশক বালিশ আনছি। তুই ততোক্ষণে পুকুরে একডুব দিয়ায়।

চান তো করেই বেরিয়েছি সকালে।আরেকবার তোমাতে ডুব দিই।দখলের অপ্রতিরোধ্য চাহিদায় যিশু বাহুবদ্ধ করে খুশিদিকে।বিচ্ছুরিত ঘামসুগন্ধের আ-আলজিভ ঘ্রাণ নিলে। ওর হাতের ঔৎসুক্য ফুরোয় না।

যাঃ, শরীর খারাপ হবে।খালি পেটে রইচিস না।

হলেই বা।নিষেধ থাকলেই ভাঙতে হয়।

আচ্ছা, সেবার যেসব মন্তর আমার জন্যে পড়েছিলি, সেগুলো আরেকবার বলবি? যিশকা?

যিশু কাঁধ কাঁপিয়ে হাসে।নতজানু, জড়িয়ে ধরে উতলা আগ্রহে।বলে, তুমি শান্ত, তুমি দাস্য, তুমি সখ্য, তুমি বাৎসল্য, তুমি মধুর।যিশু উঠে দাঁড়ায়।

দেহের হালকানো ভার যিশুর ওপর ছেড়ে দিয়েছে খুশিদি।আর খুশিদি, নিঃশব্দ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে আপ্লুত করছে ওকে।খুশিদির চোখের জল নিজের গালে অনুভব করে যিশু।জিভ দিয়ে কান্নায় নুনের স্বাদ পায়। খুশিদির থুতনিতে টোল।কাঁপছে।

চুপ করলি কেন? আরও বল, যিশকা।

তুমি অনিমা, তুমি লঘিমা, তুমি গরিমা, তুমি প্রাপ্তি, তুমি প্রকাম্য, তুমি ঈশিত্ব, তুমি ঈশিত্ব।এসব মন্তর যিশুখ্রিস্টের মায়ের জন্যে।

সে কে?

আমার মা-বাবার ভগবান।যিশু কৈশোরের স্মৃতিতে যেতে চেষ্টা করে।

চুপ করে গেলি কেন? চুপ করিসনি।বল।বলতে থাক।যিশকা।

তোমার ডান কাঁধে পোকা কামড়াল বোধয়।লাল হয়ে গেছে।

ওটা জড়ুল।জন্মে ওব্দি আচে।তুই থামলি কেন? খুশিদির কণ্ঠস্বরে ভাঙন।

তুমি মঙ্গলা, তুমি বিজয়া, তুমি ভদ্রা, তুমি জয়ন্তী, তুমি নন্দিনী, তুমি নারসিংহী, তুমি কৌমারী।কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর শেষতম নিদানের মতন যিশুর ফিসফিস, আর কত কষ্ট পেতে চাও খুশিদি? কেনই বা চাও?

খুশিদি সটান দাঁড়িয়ে আছে চোখ বুজে, ওপর দিকে মুখ, চাষি-মেয়ের শ্রমসোহাগী পেশল বাহু ঝুলে আছে দু'পাশে, কাঁধে এলিয়ে নামা ভিজেচুলে বুক ঢাকা, নাভির ঘাম শুকোয়নি এখনও, পায়ের গোছ আর পাতা জুড়ে অনুপম কৌলিন্য।

মুগ্ধতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে যে সত্তা, তার দুর্নিবার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে পরিচিত হয় যিশু।

.

২০.

বুকড়ি চালের ভাত আর আগাছা ট্যাংরার ঝোল খেয়ে, অবেলা ওব্দি ক্লান্ত ঘুম থেকে উঠে, দাওয়ায় বেরিয়ে যিশু দেখল, হাতল-আলা চেয়ারের পিছনের দু-পায়ায় ভর দিয়ে

দোল খাচ্ছে ভবেশকা।কালো ভারিক্কি চশমা।বাঁ পায়ে ভয়ানক ঢেউ-খেলানো গোদ।

ভবেশকার পায়ে গোদ! ভাবা যায়? লাফিয়ে উঠে যেত পুলিশের ভ্যানে। মিছিলের নেতৃত্বে হেঁটে চলে যেত এসপ্ল্যানেড ইস্ট পর্যন্ত।একবার তো কলেজ স্ট্রিটে বাসের ছাদ থেকে রাস্তায় নেমেছিল লাফিয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা দেখেছিল, অ্যালবার্ট হল কফিহাউসে বসে গল্প করেছিল বহুকাল ওব্দি। গোদের জন্যই বোধয় গেরুয়া আলখাল্লা।আলখাল্লার জন্যে সত্য সাঁইবাবা।

জলেতে ভুরু ভাসিয়ে-রাখা কুমিরের মতন চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে চোখ তুলে নাকচ-করা দৃষ্টি মেলে, সর্দিগর্মিতে নাকবন্ধ গলায় ভবেশকা বলল, কী এখনো আলুর রিপোর্ট ফাইনাল কত্তে পাল্লে না? কী-ই বা আচে এতে? আমি তো অ্যাক দিনে লিকে দিতে পাত্তুম।

এরম অনেক মানুষ আছে। জানতে না চাইলেও নিজের বিষয়ে বলবে। গতবার তারকেশ্বর লোকালে, ঠাসাঠাসি-গাদাগাদি ভিড়ে ওর, যিশুর, গায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এনতার কথা বকছিল দুজন বউড়ি যুবতী।ছোট্টখাট্ট গোলগাল, অত্যধিক সিঁদুর।

যিশু বসেছিল, আর ওর দিকে মুখ করে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জাল আঁকড়ে।ওদের নির্ভেজাল অতিমাংসল বুকে যিশুর নিশ্বাস পড়ছিল নিশ্চয়ই।

চানাচুর চিবোবার শব্দের মতন ওদের একজন বলে উঠেছিল, আমি তো অ্যাকদোম সেন্টটেন্ট মাকি না। যিশুর বিদেশি পারফিউমের প্রতি কটাক্ষ। দার্শনিক গাম্ভীর্যের আড়ালে যিশু বুঝতে পারছিল, এদের মাংসের ঘর্মাক্ত অকৃত্রিম গন্ধ যদিও ওর খারাপ লাগছে, তবু তা এক ঝটকায় বিপথগামী করে দিতে পারে। ওদের লাল ব্লাউজের আহ্বায়ক বাহুমূলের টানটান সাদা সুতোর সেলাই, যিশুকে চোখ বুজতে বাধ্য করেছিল।

বউ দুটির তক্কাতক্কি, কার জামাইবাবু শালির পেটে বাচ্চা এনে ফেলেছিল, দোষ তিনজনের মধ্যে কার, এখন কী করণীয়, তাই নিয়ে। কইকালার ঘরজামাই নিতাই সাহা। শালি, একমাত্র, কণা। বউয়ের নাম আলোচনায় আসেনি। ওদের গল্পের থুতুর ছিটে লাগছিল নিরুপায় যিশুর মুখে-হাতে-গলায়।

হাওড়ায় নামার সময়েও নিষ্পত্তি হয়নি কার আত্মহত্যা করা উচিত, তিন জনের মধ্যে কার। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে, ওদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে যিশু আলতো শুধিয়েছিল, দুজনকে দুপাশে নিয়ে শুক না নিতাই, ঘটেই যখন গেছে ব্যাপারটা।

এখন, এই মুহূর্তে, ভবেশকার কথার কী উত্তর দেবে? ভবেশকা বোধহয় দুর্ব্যাবহারের সম্ভাবনা গড়ে তোলার লোভে পড়েছে। কারণ, মনে হয়, আলু। একদা হুগলি জেলার কংরেসিরা বাজার থেকে আলু লোপাট করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে আস্তিন গুটিয়ে বাসে-ট্রামে আগুন ধরিয়ে গুলিতে মরার জন্য রাজপথে নেমেছিল পরোয়াহীন যুবক ভবেশকা। আজ পায়ে গোদ, গেরুয়া, বাবরি চুল, আলখাল্লা, বুড়ো, মহাজন, ভূস্বামী, আঙুলে গ্রহরত্নের রুপোর আংটি, ধর্মগুরু, দলাদলি, ভবেশকার কিচ্ছু যায়-আসে না। হাজার-হাজার কুইন্টাল আলু পচলে, আলু-চাষি সর্বস্বান্ত হলে, আলুর দাম পাকা

বাজারি-কাঁচাবাজারি দাঁওপ্যাঁচে নিম্নবিত্তের পক্ষে অসহনীয় হয়ে গেলেও কিচ্ছু যায়-আসে না।

পচা আলু আসা আরম্ভ হয়ে গেছে শহরগঞ্জের বাজারে।চাষিরা গোর দিচ্ছে।

নির্লিপ্ত নির্বিকার নৈর্ব্যক্তিক মহারাজ ভবেশকা বসে আছে প্রাতিষ্ঠানিক অভিভাবকত্বের জাদু-সিংহাসনে, নাক ফুলিয়ে, হাসি নেই।জিভের ভাষায় আড় পর্যন্ত পালটে, করে ফেলেছে স্থানীয়।পায়ের গোদে হাত দিয়ে হিন্দুয়ানি প্রণাম করে যিশু বলল, প্রান্তিক চাষিদের সার আর সেচের চাহিদা-জোগানের ব্যাপারটা দেখিনি তখন, আজকে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে নেব।তুমি ভালো আছ তো? কথাগুলো বলতে-বলতে যিশু দেখল বারান্দায় ঘটি আর জলভরা বালতি রাখা রয়েছে।গোদ-ছোঁয়া হাতটা ধুয়ে নিতে হবে।

আমি? হঁ।আরে আমরাই তো সব কল্লুম, নইলে কোতায় থাগতে তোমরা আজগে? তা ভেবে দেকেচো? এই যে ধরনা, ঘেরাও, বয়কট, অবরোধ, ধীরে চলো, কর্মবিরতি, র‍্যালি, সমাবেশ, হরতাল, পথসভা, গেটসভা, এইসব? এই সব গণতান্ত্রিক হাতিয়ার? এসব চাড্ডিখানি কতা নয় হে।

নদী যেভাবে নিজের ঘোলাস্রোতে গা এলিয়ে দেয় বর্ষার বাজে কথায়, ভবেশকা, দরবেশ-পোশাক ভবেশকা, বলে যায় নিজের অভ্যস্ত গল্প।নিমের দাঁতনের মতন অতীতকে চিবিয়ে-চিবিয়ে ছিবড়ে বার করে ভবেশকা।দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, থামে হেলান দিয়ে শুনতে-শুনতে, খেই হারিয়ে ফেলে যিশু।ওর চারপাশে ওড়ে খোশমেজাজ বুদবুদ।

আচমকা একটা কোকিল ডাকতে আরম্ভ করে।উত্তেজনার পর্যায়ে উঠে যায় পাখিটার ডাক।ভবেশকাকে বাধ্য করে রোমন্থন পালটাতে।তোমার জন্যে কামারপুকুরের বোঁদে আর সিঙুরের দই আনিয়ে দিয়েচে কৃপাসিন্ধু, জলখাবারে খেয়ে দেকো।আর খানাকুল থেকে কালাকাঁদ আনতে বলেচি বিষ্ণু সাঁবুইকে।

যিশু ফিরে আসে সম্বিতে।মিষ্টিগুলোর নামের মধ্যে মিষ্টিগুলো আর নেই।শব্দের মানে ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গে আজ মৃত্যুশয্যায়।

ও, যিশু, দেখল, আর্কাজাতের করলার জন্যে টাঙানো তারের মাচার তলায় ঢুকে, বেলে-দোআঁশ মাটিতে বসানো হলুদ চারার কেয়ারি বাঁচিয়ে করলা লতার শুকনো পাতা ছাঁটাই করছে খুশিদি, কুঁজো বুড়িদের মতন ঝুঁকে।খুশিরানি মন্ডল।পনেরো থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বয়সের স্থিতিস্থাপকতাকে ইচ্ছেমতন নিয়ন্ত্রণ করে খুশিদি।বিশুদ্ধ আকর্ষণ ছাড়া বিশুদ্ধ যৌনতা হয় না।কীভাবে, কোথায়, মুলতুবি ছিল এই আকর্ষণ? মস্তিষ্কে? হবেওবা।

আচ্ছা ভবেশকা, তুমি নিজেও বিয়ে করলে না, খুশিদিকেও আগলে-আগলে রাখলে, বিয়ে দিলে না।কেন বলো তো? যিশুর অযাচিত প্রশ্নে আপ্রস্তুত ভবেশকার চকিত চমক। যেন এই প্রশ্নের উত্তর আজীবন লুকোতে-লুকোতে নেশা ধরে গেছে কোনও গোলকধাঁধার আমোদে।

হরিণের উৎকর্ণ মাথা নাড়িয়ে খুশিদি রান্নাবাড়ির দিকে চলে যায়।

ভবেশকা দু-হাত সামান্য তুলে ঘোরায়।বলল, লোকে করলা, লাউ, কুমড়ো, চিচিঙে, ঝিঙে গাছে আজগাল ডিডিটি আর বিএচসি দিচ্চে, ভাবদে পারিস, অ্যাঁ? দেকগিজা, দেকগিজা, আমার মাটিতে লেদা, চুঙি, পাতামোড়া, কুরনি, গণ্ডারে, কাঁটুই কোনও পোকা পাবি না তুই।হাতের তালুতে আগুনে-বাত হয়ে চামড়া উঠছে ভবেশকার, বলল, পানের চাষও করেছিলুম, বুজলি, আংরা দাগ ধরে বড্ডো, নইলে...

জবাজবদিহি চেপে রাখত চাইল না যিশু। আত্মতৃপ্ত প্রশান্তি থেকে নাড়া দিয়ে ভবেশকাকে টেনে বের করার চেষ্টায় নাছোড়, অস্বাভাবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে জানতে চায়, কই বললে না তো, সংসার পাতলে না কেন? সামান্য থেকে, সতর্কতা মিশিয়ে সন্তর্পণে যিশু বলল, খুশিদিরও বিয়ে দিলে না কেন?

যিশুর দিকে না তাকিয়েই হাসল ভবেশ মণ্ডল। পরস্পরকে বিব্রত করার মতন কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।থামে হেলান দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় যিশু।হাসনুহানার নিরিবিলি গন্ধের বিচ্ছুরণে দুজনেই টের পায়, সন্ধে নেমেছে বহুক্ষণ।জুনিপোকার উড়ন্ত আলোয় ধুকপুক করছে অন্ধকার।নিষেকের পর করলা-ফুলের ডিম্বাশয় চুপচাপ রূপান্তরিত হচ্ছে ফলে।

চেয়ার থেকে তার ক্যাঁঅ্যঅ্যঅ্যাচ শব্দটা নিজের পাছার সঙ্গে তুলে নিয়ে ভবেশকা বলল, ভবিতব্য হে ভবিতব্য।যেন ভবি আর তব্য আলাদা-আলাদা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যিশু দেখতে পায় মশারির বাইরে খুশিদি।উঠে এসেছে নিজের ঘর থেকে।অনুচ্চস্বরে বলল, যিশকা, সরে শো, একটু জায়গা দে।

এত অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে কেন শুতে দিলে খুশিদি? জিগ্যেস করেছিল যিশু, যখন যিশুকে করলা-ফুলের পরাগ মাখিয়ে আর নিজে কাকভোরের বাতাস মেখে চলে যাচ্ছে খুশিদি। আর খুশিদি বলেছিল, শিয়োরে লোহা নিয়ে শুলে ভুতপেত দূরে থাকে।তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল যিশু।

ঘুম ভাঙলে যিশু শুনতে পায় খুশিদির একটানা কণ্ঠস্বর:-

কোতায় আচো গো মাতা লক্ষ্মী দয়াবতী

কাতরে তোমার পায়ে করিগো মিনতি অ্যাকেতো অবলা মোরা তাতে ভক্তিহীন বিদ্যেবুদ্ধি শক্তিহীন সদা অতি দীন

না জানি করিতে স্তুতি না জানি পুজোন কেমনে তোমারে মোরা করি আবাহন কেবলি ভরোসা মনে ইহা শূন্য আচে যে তোমাকে ডাকে তুমি যাও তার কাচে নিজ গুণে কিপা করি বসিয়ে আসনে কিপা দিষ্টি করো মাগো যতো ব্রতীজনে এই মাত্র বর তুমি দেও গো সবায় সতত ভকোতি যেন থাকে তব পায়

লক্ষ্মীর রেফারেন্স রয়েছে যখন, তার মানে এটা বোধহয় পাঁচালি, শুনে-শুনে মুখস্হ করে ফেলে থাকবে খুশিদি।এভাবে দিনের পর দিন মুখস্হ বলার কথাগুলোর কোনও মানে কি আর আছে খুশিদির কাছে? যিশুর মনে হল এ যেন খুশিদিরই বন্দনা।অজানা

কোনও কিছুর প্রতি খুশিদির এই প্রগাঢ় আত্মসমর্পণ আর বিশ্বাসের ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তার জন্যে হিংসে হয় যিশুর।

কত লোক, হাজার-হাজার লোক, ইদের দিন নামাজ পড়ে। রবিবারের দিন চার্চে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বহুক্ষণ নিঃশব্দ প্রার্থনা জানায়।মন্দিরের সিঁড়িতে বহুক্ষণ যাবত মাথা ঠেকিয়ে থাকে।বিভোর হবার মতন ওই বীজ, খুশিদির সংস্পর্শে এসে, খুশিদির জন্যে, নিজের সত্তায় আবিষ্কার করে, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল যিশুর।

বিছানা ছেড়ে জামাকাপড় পরে যিশু বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের আঁদুল-কাঁদুল ঘুরতে।ফেলে-ছড়িয়ে রোদ উঠেছে।রোদ্দুরের ভয়ে বটগাছটার ছায়াসঙ্গিনী তখনও ওর তলা থেকে বেরোয়নি।বুড়োশিব ঢাকা পড়ে আছে শুকনো বটপাতায়।কিংবা এখু পার্বনহীন অনাদরে শেষনাগ হয়ে আছে। পাতাগুলো ওপর থেকে কয়েকটা সরিয়ে দিল যিশু। পিঁপড়ের কাতার। সাতসকালে কেউ এসে চিনিগোলা দুধ ঢেলে থাকবে। গাছটার ডালে ডালে বুনো মউমাছির চাকগুলো থেকে একাধ কুইন্টাল মোম বেরোবে।কত লিটার মধু আছে কে জানে।বটগাছটা মধু চায় না।

মন্দিরে পুজুরিটা একা। দেবতার সাজগোজ চলছে। মেলার দোকানপাট অগাধ ঘুমে। তালটিকুরির দিকটায় দার্শনিক উদাসীনতায় হাগতে বসেছে বুড়ো আর জোয়ান। যাত্রাদল আসছে মেলায়। মুনমুন সেন আর তাপস পালের গালফোলা পোস্টার। যাক, ভালোই, বিকেল থাকতেই পুরো তল্লাট ছেয়ে যাবে অচেনা গাদাগাদি ভিড়ে। লাঙল আর জোয়ালের কাঠ কিনতে আসে মেলাটায় দূরদূর থেকে চাষিরা। বেগমপুর আর গুপ্তিপাড়া থেকে সং আসে। ঘন্টাকয়েক পর থেকেই লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে মেলায়।

ভোরের আলোর কুচিকুচি ঢেউ যিশুর চোখেমুখে ঠাণ্ডা হাওয়া মাখাচ্ছিল।

চারিদিকে মূষিক প্রসবকারী গর্ত। সারোতা, গোপের হাট, খেমাপাড়া, তেঘাট যাবার ছক্করগাড়ি আর ভ্যান-রিকশা এই ভোর থেকেই।রাস্তা পার হচ্ছিল একজন বুড়ো চাষি। হাতে ধরা দড়িতে রোগাটে দিশি গাই, পেট ঢোকা, পাঁজর জিরজিরে। যিশুর দিকে তাকিয়ে বলল, গোরুটার আওয়া হয়েচে, গুয়াবুড়ি শাগ খাওয়াতে নে যাচ্চি।রোগ আর তার ওষুধ, দুটোর কিছুই জানে না যিশু।কী বলবে? রাস্তার পাশে হিলুয়ার ভূঁয়ে নেমে-পড়ে ফিতে-কৃমিতে ভোগা গতরের বৃদ্ধ আর তার গাই।

রাস্তার দু'ধারে আলুর বস্তা, একের ওপর আরেক, গোটা বিশেক করে, পড়ে আছে হিল্লে হবার অপেক্ষায়।কবে হবে কে জানে।পাহারা নেই।রাস্তার কিনার-বরাবর একের পেছনে আরেক চাষি বা খেতমজুর, লুঙ্গি-গেঞ্জিতে, সাইকেলে তিনটে বস্তা চাপিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে, ভারসাম্য বজায় রেখে।কে জানে কোথায় যাচ্ছে।মুখ খুলে কথা বললেই কাহিল হয়ে পড়বে লোকগুলো।

মোড়ের ঝুপড়িতে বসে চা আর ভাণ্ডারহাটির রসগোল্লা খায় যিশু। মহানাদের খাজাও ছিল। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে চমচম খেতে ভালোবাসত খুশিদি। ছবি বিশ্বাসের বাড়ির পাশেই ছিল ময়রার দোকানটা।খ্রিস্টান চরিত্রে অভিনয়ের খুঁটিনাটি জানার জন্যে

ছবি বিশ্বাস বাবার কাছে এসেছিল কয়েকবার। এখানে ভবেশকার বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই।এককালে চায়ের পর চা না হলে ভবেশকার গলায় বক্তৃতা আটকে যেত। ভবেশকাদের যুগের আগে এমন ছিল যে ফরসারা কালোদের, ঢ্যাঙারা বেঁটেদের, শহুরেরা গেঁয়োদের, সবর্ণরা অন্ত্যজদের, পয়সাঅলারা গরিবদের, ধোপদুরস্তরা নোংরাদের, টেরিকাটারা উস্কোখুস্কোদের, রাজনৈতিক বক্তৃতা দিত। এখনও আছে অনেকটা।অ্যাবং, অ্যাবং, অ্যাবঙের শিকলি জুড়ে-জুড়ে কজনই বা অবিরাম বকে যেতে পারে। বাংলাভাষাটা তো আর সব বাঙালির নয়। বেশিরভাগ লোক তো স্যাঙাত হয়ে ল্যাঙাত খায়।

চা খেয়ে, গোপের হাটের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে, একটা পেঁপে বাগান দেখতে পেয়ে, গাছে-গাছে কুর্গ-হানিডিউ জাতের সোমথথ পেঁপে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যখন মনে-মনে প্রশংসা করছিল যিশু, বাগানের ভেতর থেকে দোহারা যুবক, জিনস প্যান্টে গোঁজা হাতকাটা গেঞ্জি, শহুরে স্মার্ট চেহারা, ডাকে ওকে, আপনি তো স্যার ভবঠাকুরের আত্মীয়, শুনেছি, হিমঘর নিয়ে গবেষণা করছেন।

যিশুর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ভয়।মাত্র ক'দিনে লোকে ওর গতিবিধির সঙ্গে পরিচিত। ভাগ্যিস মেলা আর যাত্রার ভিড় থাকবে, নইলে বিপদ অনিবার্য।গ্রামে আর ঘোরাঘুরি চলবে না। বহিরাগত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা আর ঔৎসুক্য থাকবেই। যিশু বলল, দু-আড়াই কেজির ফল হয়, না?

যুবক তার গাছের অস্মিতা ধার করে।আজ্ঞে স্যার তিন কেজি ওব্দি হয়।যিশু এর পর মাটি আংলানো, বীজে সেরেসার ড্রাই মাখানো, মাটি চৌরস, নুভাক্রন স্প্রে, হাওয়া-পরাগি ফুল, কত মাদিগাছের জন্যে কটা নরগাছ, তরুক্ষীরের পেপেন, লালমাকড়, কুটে রোগ ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত প্রশ্নের সিরিজ সহযোগে যুবকের মনে শ্রদ্ধা তৈরি করলে, যুবক ওকে তাদের বাড়ি যেতে বলে।ওই তো, দেখা যাচ্ছে, স্যার আসুন না।

আরেকদিন কখনো, জানিয়ে, ফেরার রাস্তা ধরে যিশু।জানা রইল বাড়িটা, দরকারে কাজে লাগবে। কিন্তু ও খ্রিস্টান জানলে পুরোটা শ্রদ্ধা কি বজায় থাকত? ভবেশকাই হয়তো সিংহাসনচ্যুত হয়ে যাবে, জানাজানি হলে।ভবেশকাও বলবে না কাউকে।

ফিরে, যিশু দেখল, জাবেদালি এঁড়ে বাছুরটার লাফঝাঁপ সামলে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ভাগচাষিদের গ্রামীণ রাজনীতির বখরা দিয়ে বর্গা এড়াবার কায়দা করে ফেলেছে লোকে।ভবেশকার পরিবার বলতে কেবল ভাই-বোন।জাবেদালি ক্ষমতার বখরাটুকুতেই তৃপ্ত। অনেক জায়গায় তো ভাগচাষ এড়াতে লোকে এড়িয়ে যাচ্ছে চাষবাস, ইউকালিপটাস পুঁতে ফেলছে, অথচ এখানেই পোলবা থানার হালসুই গ্রামে প্রথম বর্গা ক্যাম্প বসেছিল। হিমঘরের আলু পচিয়ে সেই পোলবা আজ জগদবিখ্যাত, সত্যিই জগদবিখ্যাত।পচা আলু থেকে চামড়ায় রোগ ধরেছে চাষিবউদের ; সারছে না।

জাবেদালি জানালে, ভবঠাকুর হিমঘরে গেছে, যিশু যেতে পারে যাবার থাগলে।

হৃৎপিণ্ডে সমুদ্র চলকে ওঠে, শব্দ শোনা যায়।দাওয়ায় উঠে জুতো খুলে রেখে, তার পর নেমে হেঁসেলে ঢুকে যিশু দেখল, চাকা-চাকা আলু কাটছে খুশিদি।অত্যধিক ধেনো-টানা পথে পড়ে-থাকা মাতালের মতন একটা শোলমাছ বিলকিয়ে উঠছে থেকে-থেকে ঘরের কোণে। ধোঁয়াহীন চুলাটায় বোধহয় প্রথম দিনের পর আর রান্না হয়নি।বাসনকোসন সবই কাঁসা আর পিতলের।এ-গ্রামে এখনও স্টেনলেস স্টিল ঢোকেনি সম্ভবত।চালায়-ছাদে বুস্টার লাগানো অ্যান্টেনা দুতিনটে নেতাবাড়িতে নজরে পড়েছে গ্রামে।ভবেশকার নেই।কেবলটিভিও, পার্টির অনুমতি আর ট্যাক্স ছাড়া টানা যায় না।

মেঝেয় বসে যিশু বলল, আমি তো বেজাত, মদ মাংস গোরু শুয়োর সব খাই।

জানি তুই মেলেচ্ছো, ওই পিঁড়েটা নিয়ে বোস।

তোমাকেও ম্লেচ্ছ করে তুলব।

আমার কিন্তু বড্ডো ভয় করচে।আমি এমন অপয়া।অশত্থগাছ তুলে পুঁতেছিলুম, তাই। অশত্থগাছ ওপড়াতে নেই।নম্রতায় ঢাকা খুশিদির সত্যিকার আশঙ্কা।

কুটনো কোটা হয়ে গেলে, তোলা উনুনের পাশে যখন বঁটিটা মুড়ে রাখছে খুশিদি, যিশু বলল, ভবেশকাকে যদি বলি, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, বিয়ে করতে চাই, তাহলেও রাজি হবে না ভবেশকা ; কেন, আমি জানি।

না না না না না না।প্রায় আঁৎকে ওঠে খুশিদি।অ্যাকদোম পাড়িসনি ওসব কতা।খুশিদির আতঙ্কিত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে কয়েক দশক যাবৎ জমানো অন্তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের রক্তিমাভ আকুতি।পারবি তো? যিশকা?

তোমাকে এভাবেই আগলে রেখে দেবে ওনার হিমসংসারে।কেন, আমি জানি।তার পর পচা আলুর মতন.....

তুই আজ বাইরে-বাইরেই থাক। আকাশের মুকও আজ যা দেকচি, বিকেলে হয়তো কালবোশেখি আসবে, ভালোই হবে একদিক থেকে। ভাঙা গলায় বলল খুশিদি। যেন নিজেই নিজেকে পাহারা দিচ্ছে।পোড়াবাড়ির ডাকবাক্সে বহুদিন পড়ে-থাকা চিঠির মতন কেমন এক প্রাপকহীনতা ভর করে আছে।

উঠে পড়ে যিশু।হিমঘর রওনা হয় মোজা-জুতো পরে।

সকালের উদার শীতবাতাসকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে অন্তরীক্ষ।রোদের কণায় ঘষটানি খেয়ে দিনের আলো ক্রমশ হয়ে উঠছে অনচ্ছ।অশোভন বৈশাখী গরম।কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করার আগে পাতাহীন মগডালে বসে আছে তরুণ শকুনেরা। নিজেরই অনন্যোপায়, আকাঙ্খার আক্ষেপ, খুশিদির জন্যে পুনর্জীবিত বয়ঃসন্ধি, হিমঘরের দিকে যেতে-যেতে, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করছিল যিশু।আর কখনও তো এরকম হয়নি, কারোর জন্যে।

যিশুর যেন লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে নিজের ভেতর থেকে।ঢোলবাদকদের বাহুর দুপাশে বাজ্ময় ডানা মেলে ছুটতে ইচ্ছে করছে আলের ওপর দিয়ে।

হিমঘরে ভবেশকার দরবার বসেছে। চিন্তান্বিত ভবেশকা প্রৌঢ় আই-এ-এস আমলার ঢঙে কালো ফ্রেমের চশমা খুলতে গিয়ে হাত নেড়ে বলতে চাইছিল কিছু। চা ভরতি গেলাস টেবিলের ওপর থেকে পড়ে চুরমার। অস্বাচ্ছন্দ্যের তাৎক্ষণিক ঘোর থেকে চকিতে নির্মিত প্রসন্নতায় যেতে দেরি হয় না।এসো, এসো, পুলিন তুই টুলটায় বোস, যিশুকে বসতে দে।

এক ডজন লোক হবে এখানে। একজন বিশাল-পাছা মহিলা, পঞ্চায়েত কি পার্টির উঠতি-নামতি কেউ।যিশু কেবল কৃপাসিন্ধু আর শাসমলকে চেনে।পুরুষগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে এরা কেউ চান করে না, চুল আঁচড়ায় না, নিয়মিত দাড়ি কামায় না।একত্রিত হলে গুজগুজ-ফিসফিস ।

বাঙালির রেনেসঁসের উত্তেজনায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী পূর্বপুরুষদের মাত্র চতুর্থ উত্তরপুরুষ ওব্দি পৌঁছে বাঙালি গ্রামসমাজে যিশু নিজেকে বেমানান পেল।এদের দেখে কথাটা স্পষ্ট যে ধুতি পরার রেওয়াজ গ্রামেও শেষ হয়ে এল।

শাসমল ঘড়াঞ্চি সিঁড়িতে বসে। কিছু বলার জন্যে হাঁ করেছিল। মুখ বন্ধ করে অক্ষরগুলোকে ফুসফুসে ফেরত পাঠিয়ে দিলে। ওর পাশে হাতলভাঙা চেয়ারে ময়লামতন বেঁটে, গালে দুদিনের নুন-গোলমরিচ দাড়ি, গেরুয়া পাঞ্জাবি, অভিব্যক্তিহীন অলস চাউনি মেলে বলল, সকালে পেঁপে দেখতে যেওয়া হয়েছিল? লোক ভালো নয় স্বপন সামন্ত। জেলাসদরে মিথ্যে চিটি লিকেচে আমাদের হিমঘর নিয়ে। যেন আমরা সবাই চোর আর উনি হরিসচন্দোর। ওর বাপটা তো অতুল্লো ঘোসের চাকর ছিল। ল্যাঙোট কাচত। আর গেঁটে বজ্জাত দাদুটা পোফুল্ল সেনের দয়ায় আলুর ট্যাকায় জমিজমা করে নিলে।

টেবিলের ওপর তবলাবাদকের আঙুল নকল করে একজন বৃহদায়তন নিতম্ব বলল, জহোর্লালের দ্যাকাদেকি যখুন সুবাস বোসকে হেয় করছিল ওই পোফুল্ল ঘোস, কিরনসংকর রায়, নলিন সর্কার, নিমল চন্দর, তখুন ওদের ল্যাংবোট ছিল ওর দাদু।

লোকটাকে দেখতে-দেখতে যিশুর মনে পড়ে গেল সেই অডিটারদের চেহারা, যাদের কিছুদিন আগে পুরুলিয়া জেলা সমবায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। এই লোকগুলো বোধহয় অন্যের জীবনকাহিনীতে তালাবন্ধ। বিপুলবপু লোকটা গ্রামের কিংবা ব্লকের কিংবা আরও বড়ো ভূখন্ডের সমসাময়িক রাজনীতিতে ভবেশকার চেয়ে উঁচুতে। চিৎকার করে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে ঢেউ তোলে। নিজের কথাবার্তাকে বাকচাতুরীর আড়ালে কী উদ্দেশ্য দিতে চাইছে আঁচ করতে না পেরে, যিশুর মনে হল, এরা সবাই পার্টিমণ্ডুক, ছদ্মবেশী বেকার, আর ও এদের একটা ওয়াক-ইন ইনটারভিউ দিচ্ছে।

ও, যিশু, বিবৃতির ঢঙে বলল, পেঁপেগুলো কিন্তু বিরাট-বিরাট।

তা হবে না কেন? ব্যাংকের লোন নিয়ে মহাজনি করা হয়।মহিলার মন্তব্য।

তাই বুঝি? যিশুর মনে হল, জগৎটা মিটমাটপন্থীদের।প্রত্যয়ও চাই আবার মিটমাটও চাই।

আমাদের চাষিদের আতান্তরে ফ্যালেনি? এই এনাদের জিগ্যেস করে দেকুন। রোগা, কালো, ময়লা-জামাকাপড় বৃদ্ধের উক্তি।

আলু রপ্তানির নিষেধনামা তো উঠে গ্যাচে। আফরিকায় দেশে-দেশে লোকে আলু খায় ভাতরুটির বদলে।

টুলে-বসা পুলিন জ্ঞান দিলে ভবেশকা অবস্থা সামাল দ্যায়, আরে ওকে কী বোঝাচ্ছিস, ও নানা দেশ ঘুরেচে।

এবার আমরা ওননো রাজ্যেও পাটাতে পারবো, বলল পাশের লোকটা, যার গা থেকে তিতকুটে গন্ধ বেরুচ্ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে শিষ্টভাষার নামে কলকাতায় যা আজ বাজারচালু, সেই লোকগুলোর কথা শুনে যিশুর মনে হচ্ছিল, দেশভাগ না হলে তা এক্কেবারে আলাদা হতো। জব চার্ণক চাটগাঁয় নামলেও আলাদা হতো।

আমাদের দোষে আলু পচেনি, আর বাড়তি আলু রাখিও না আমরা। গেরুয়া পাঞ্জাবি বক্তব্য পেশ করে। স্বপন সামন্ত যেসব চুগলি করেচে, সব মিথ্যে।

ওফ, এরা এখনও ভাবচে ও একজন আলুগোয়েন্দা। কেলেংকারি জড়ো করে-করে প্রতিবেদন লিখে কোনও অজানা ওপরঅলাকে পাঠিয়ে এদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা সব নষ্ট করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে কেউ কি কোথাও সত্যিই আছে, যাকে ধরলে দুর্ভোগের প্রতিকার হয়?

কাঁধ কাঁপিয়ে স্বাভাবিক হাসি হেসে ফ্যালে যিশু। বাইরে মুটিয়াগুলো এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর শেডের তলায় রাখা আলুর বস্তার সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। যিশু বেফাঁস বলে ফেলল, ওগুলো কী হবে?

ওসব আড়তদার, ফড়ে, মহাজনদের মাল, নিয়ে যাবে। ভবেশকার খোলসা।

স্বপন সামন্তের অভিযোগের কপি দেয়া হয়েচে নাকি আবনাকে?

দেয়া হয়েচে, করা হয়েচে, শুনে আদিত্যর কথা মনে পড়ে গেল যিশুর। ওর জেরা করার কায়দা। ইংরেজ পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে অনুবাদ করে পেয়েছিল বাঙালি ঊর্ধ্বতনরা। দিয়ে গেছে অধস্তনদের, আদিত্যকে। সেদিন মোটরবাইকে উধাও হয়ে গেল আচমকা, অদ্ভুত। উপস্থিত লোকগুলোর মুখের ওপর চাউনি ঘোরাল যিশু, আর দেখতে-দেখতে মনে হল, মানহানি ব্যাপারটা সম্ভবত আর্থিক। আত্মিক নয়।

না, তা হিমঘর নিয়ে ওনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি আমার। উনি যে চিঠি-ফিটি লিখে কমপ্লেন করেছেন, তা-ই জানতুম না। কপিটা পেলে মন্দ হতো না। অবশ্য ওসব কমপ্লেন-ফমপ্লেনে কারুর কিছু হয় না আজকাল। গাজোয়ারি ছাড়া কিচ্ছু আর কাজে দ্যায় না। দলদাসদের আড়ং ধোলাই, ব্যাস।

হুঁ।

সকালে বেড়াতে-বেড়াতে দেখলুম অত বড়ো-বড়ো পেঁপে, তাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল হতভম্ব যিশু, কেউ বিশ্বাস করছে না ওকে। কী বিপজ্জনক।বাড়িতে থাকলে সন্দেহ হতে পারে, আবার গ্রামে বেড়ানোটাও উদ্রেক করছে সন্দেহ।গত দশ-বিশ বছরে গ্রামে-গ্রামে, এমনকী কলকাতার সনাতন পাড়ায়-পাড়ায়, নতুন এক সন্দেহভিত্তিক বর্ণাশ্রম উদ্ভব হয়েছে।নতুন তত্ত্বটার নাম শত্রুশিবির। তা থেকেই নতুন বর্ণ-বিভাজন।বাইরের লোক আর কোনও গ্রামে গিয়ে জমিজমা কিনে টিকতে পারবে না।

চৌকাঠের কোণের গর্ত থেকে একটা গোবরিয়া বিছে বেরিয়ে বিবাদী বাগের রাস্তা পেরোবার মতন শুঁড় দিয়ে এদিক-ওদিক দেখে ঢুকে গেল বাইরে ছড়ানো-ছেটানো বাতিল আলুর ভেতর।রাস্তার ওপারে, আকন্দ গাছটার কাছে, খুলে কথা বলায় মগ্ন শালিকদল।পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ খুলে কথা বলে না পশ্চিমবাংলায়।পুঁটলি থেকে রামরোট রুটি, কাঁচা পেঁয়াজ, আলুমশলা নিয়ে, গামছা পেতে বসেছে চারজন মুটিয়া। বোধহয় ব্রেকফাস্ট।

টেবিলের ওদিকে কন্দর্প-ক্যাবলা ফরসা একজন কাগজ পড়ছিল, কালকের, হাঁইইইইহ আওয়াজ সহযোগে হাই তুলল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পূর্বতন মালিকের ইঁটজিরজিরে নোনা কবরের ওপর কাকেদের ভরা সংসার। গোড়ায় আপনা থেকে গজিয়েছে বুনো কনকনটে।কন্দর্প-ক্যাবলা জানায়, ডাবল সার্কিট লাইনের তার চুরি হয়ে কোলাঘাটের একটা ইউনিট বন্ধ, পুলিনদা।

অ।

সবাই চুপচাপ।ইন্টারভিউ নেবার প্রশ্ন বোধহয় ফুরিয়ে গেছে।

হঠাৎ জাবেদালি অফিসঘরে প্রবেশ করে।লুঙ্গি আর খালি গায়ে।ঘর্মাক্ত।দৌড়ে এসেছে। চোখমুখ থমথমে।হাঁপাচ্ছিল।উদবিগ্ন ঘোষণা করে, হালিক ধাড়া গলায় দড়ি দিয়েচে, পুলিশ এয়েচে লাশ নাবাতে।

অন্ধকারের বিস্ফোরণ হয়, আর গুঁড়ো-গুঁড়ো কালো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে দরবারিদের চেহারায়।সবাই এমন কনকনে তাকায় যেন যিশুই খুনি।ওকে একা ফেলে রেখে সবাই ছিটকে বেরোয় অফিসঘর থেকে, আর মাঠ ভেঙে গ্রামের দিকে দৌড়োয় ।মহিলা সবার শেষে, পাছায় চেয়ারের হাতল আটকে গিয়েছিল বলে।

তালা দিয়ে দি থালে।জাবেদালির ইশারায় উঠে পড়ে যিশু।ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন তোলে।

ধারদেনা করে সাড়ে তিন বিঘে বুনেছিল।অবোসথা তো নিজের চোকেই দেকেচেন। বোরো বোনা আবার বারণ।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়া সত্ত্বেও, পঞ্চাশ লক্ষ টন আলুর হিল্লে হবে না।হিমঘরেও জায়গা নেই।বিহার, উত্তরপ্রদেশে, অন্ধ্র, উড়িষ্যায় অনেক আলু হয়েছে।লুকিয়ে পাচার হবে নেপাল বাংলাদেশ বর্মায়।তার কিছু টাকা যাবে সুইস ব্যাংকে।গুজরাতের জমিতে তো জো নেই, তবু হয়েছে আলু।দুধ সমবায়ের জোরে সেখানে গোরু-মোষকে আলু খাওয়ানো যায়।

যিশু জিগ্যেস করল, হালিক ধাড়া বন্ড পায়নি?

জাবেদালি উত্তর না দিয়ে বলল, আপনি এগোন।

যিশু একটা সিগারেট ধরায়।

জনশ্রুতির মতন বাতাস বইছে।মন্দিরের পাঁচিলের ওপর কয়েকটা চটুল কাক।মসজিদ বলতে এ-গ্রামে সবুজ-সবুজ চুড়ো-দেয়া মাঠের মাঝে একটা দেয়াল, ধবধবে সাদা। সুলতানি চারচালা বাঙালি মসজিদ আর হবে না।আরবদেশের মসজিদের নকল হবে কেবল, তাদেরই দিনার-দিরহামে।

মন্দিরের বাইরে পুজোর উপাচার বিক্রির খাট পাতা।আকন্দফুলের মালা ঝোলানো খদ্দেরহীন দোকানে বুড়িটা ঢুলছে।একটা আলাপি কুকুর ল্যাজ নাড়ে।মদগর্বিত ষাঁড়। মদিরেক্ষণা মৌমাছি।ভিজে চিলের মতন ডানা ঝুলিয়ে রয়েছে ঝিমন্ত কলাগাছগুলোর ছেঁড়া পাতা।কঞ্জুস হাওয়ার তাপে বাবলাগাছগুলোর গায়ে কাঁটা দিয়েছে।পথিপার্শ্বে উইপোকাদের বিজয়স্তম্ভ।মার্জিত চেহারার খেজুরগাছ, গলায় খেজুরছড়ার মালা।

দুপুর টাটিয়ে উঠেছে ক্রমশ, অথচ মেঘেদের ধূসর আনাগোনাও চলছে।বৃষ্টির ওপর আধিপত্য, দুঋতু আগে খর্ব হবার ফলে, নেতিয়ে পড়েছে ভেষজ সবুজ।মোরামপথ ধুলোয় জেরবার। প্রমেথিউসের নাট্যাভিনয়ে গুবরেপোকা। সকৌতুকে ফুটে আছে শেয়ালকাঁটার নরম ফুরফুরে হলুদ।কাঁঠালগাছে অজস্র এঁচোড়ের সঙ্গে ঝুলে আছে সুরাসক্ত মৌমাছিদের মোমভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প।নীরবতা পালন করছে শোকমগ্ন শ্মশান। মেলার তোড়জোড় জানান দিচ্ছে বাচাল-প্রকৃতির লাউডস্পিকার।গাছের ছায়া থেকে কিশোর হিমসাগর বেরিয়ে লাফ দিয়েছে আলোয়।

সারাটা দুপুর ফ্যা-ফ্যা কাটিয়ে, চুল না-ভিজিয়ে পুকুরে ক্লান্ত চান সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল যিশু।ঘুম ভাঙে ভবেশকার চ্যাঁচামেচিতে।ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, খুশিদিকে বকছে।এই বয়সেও বকুনি!

কাছে গিয়ে ভবেশকাকে, কী হয়েছে গো, জিগ্যেস করায়, উলটে বকুনি খায় যিশু, তুমি মাঝখানে কতা বলতে এসো না।

ক্ষুব্ধ যিশু বলল, আরে, এই বয়সে এমন বকা-ঝকা করছ কেন? শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখবে? বিষয়ী হওয়ার এতই দরকার নাকি তোমার? আমি...।কথা সম্পূর্ণ করা উচিত হবে না মনে করে যিশু চুপ করে যায়।

ভবেশকা বাঁপাশে হেলে, থপথপিয়ে দাওয়া থেকে নেমে বেড়ার আগল খুলে ক্রুদ্ধ বেরিয়ে গেলে খুশিদি স্কুলবালিকার মতন চোখ মুছে বলল, তুই খেয়ে নে।বাকসো গুচিয়ে রেকেচিস তো? আমি এককাপড়ে চলে যাব একদোম ভাল্লাগে না আর।

হ্যাঁ।সন্ধে হলেই তুমি চলে যেও।মেলার ভিড় তো থাকবেই।কদম গাছতলায় অপেক্ষা কোরো, নইলে সোজা বাবলাডাঙায় গাড়িটার কাছে চলে যেও।ড্রাইভারটাকে বলা আছে।ভবেশকা একেবারে আউটডোর জীব হয়ে গেছে।কী হয়েছিল কী? যে এত বকছিল তোমায়?

মোদকের বউকে জলপড়া দেবে।জলপড়ার কাঁসার জামবাটিটা পাওয়া যাচ্চে না।বাবা তারকেশ্বরের ছোঁয়ানো বাটি।কোতায় রেকেচে নিজেই।গুষ্টির তো জিনিস।ভাল্লাগে না।

জলপড়া? ভবেশকা জলপড়া দেবে? যিশুর মাথার ভেতরে শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে ডলবি ডিজিটাল বজ্রপাত হয়।জলপড়া!

হ্যাঁ।সেরে যায় তো।কানচোন মোদকের বউ বাচ্চা বিয়োবার আনজা রাকতে পারচে না।

ভবেশকা সেই যে রেগেমেগে বেরিয়েছে, ফেরেনি।সন্ধে হয়ে গেল।লাইট চলে গেছে, সম্ভবত মেলার হুকিঙের অকথ্য শোষণে। যাত্রাদলের জেনারেটারের ক্ষীণ নিরবয়ব একটানা শব্দ।শুরু হয়ে গেছে ঝিঁঝিদের দেয়ালা-পারঙ্গম কানাঘুষা।কাতর আবেদনের মতন অন্ধকার।মাঝে-মাঝে স্পন্দিত হয়ে উঠছে শব্দহীন বিদ্যুচ্চমকের উদ্বেগ।

আমি থালে এগুচ্চি, অন্ধকারে অনুচ্চ গলায় বলল খুশিদি, চাপা উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। মুখে-মাখা স্নোক্রমের গ্রামীণ সুগন্ধকে ছাপিয়ে যাচ্ছে হাঁ-মুখের শঙ্কিত উৎকণ্ঠার ভাপের গন্ধ। একপলক বিদ্যুচ্চমকে দেখা গেল থুতনির নিটোল টোল। পাটভাঙা, কাসুন্দি রঙের, ফুলফুল শাড়ি।হাত কাঁপছে।হাঁটার ধরনে স্পষ্ট যে ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ করছে খুশিদির শরীরকে, খনিগর্ভে আটকে-পড়া শ্রমিকের মতন।

অ্যাতো ভয় কিসের খুশিদি।বুকে জড়িয়ে ধরে ভয় স্তিমিত করার চেষ্টা করে যিশু।

জানি না কেন যিশকা, আমার খুব ভয় করচে।দাওয়া থেকে নেমে দ্রুত অন্ধকার বাগান পেরিয়ে চলে গেল খুশিদি।

পেনটর্চ জ্বেলে যিশু নিজের বাকসো আরেকবার দেখে নিলে।খুশিদিকে ভরসা দিচ্ছিল অথচ ছোঁয়াচে উদ্বেগে চাবি লাগাতে ভুলে যায় ব্রিফকেসে। নৈঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। পা টিপে বেরোয়। আলতো খোলে বাঁশের বেড়া। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে কালবৈশাখীর ছেতরানো মেঘে, কিন্তু পূর্ণিমার আগাম আভায় নির্জন বধির অন্ধকারকে মনে হচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল।নেশাগ্রস্তের মতন মাথা ঝুঁকিয়ে আছে গাছগুলো।বুনো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে সিসলকাঁটার গুঁড়িসুড়ি ঝোপ।

ভবেশকার বাড়িটা যেন গাছে-ঘেরা দুর্গ।এখান থেকে মোচ্ছবতলার কদমগাছ অনেকটা পথ।ট্রান্সফরমার লোড নিতে পারেনি হয়তো, কখন আলো আসবে অনিশ্চিত।এই ভেষজ অন্ধকারে সেঁদোতে আলোরও গা ছমছম করবে।বুড়ো শিবতলার বয়োবৃদ্ধ বটগাছের একগাদা স্তম্ভমূল ঝুরিতে অন্ধকারকে এখানে ছোঁয়া যায়।টর্চটা ব্যবহার করা উচিত হবে না।সাপ বা শেয়াল একটা গেল বোধহয়।

যিশু দ্রুত হাঁটে শুকনো পাতার ওপর।শ্মশানের বিয়োগান্ত গন্ধ আসছে ওদিক থেকে। হালিক ধাড়ার নশ্বরতার প্রতি শেষ সম্ভাষণ হয়তো। মেঘ না থাকলে সন্ধ্যাতারার ঘনবসতিপূর্ণ আকাশভূমি দেখা যেত। আলো ফোটাতে তলবিসভা ডাকছে ঝিঁঝিপোকারা।শুকনো পাতার ওপর সম্ভবত সাপ বা তক্ষকের বুকে হাঁটার আওয়াজ।

উদ্বেগ কাটাতে সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যিশু। হঠাৎ শুনতে পায় অনেকগুনো লোকের কণ্ঠে ডাকাত ডাকাত ডাকাত চিৎকার।পেছন দিক থেকেই তো

ছুটে আসছে। এরা ডাকাত? টাকাকড়ি তো বিশেষ নেই ওর কাছে। কাদের বাড়ি ডাকাতি করেই বা পালাচ্ছে? ছোটাছুটির পদধ্বনি কাছাকাছি কোথাও। গাছের ডাল থেকে লাফাবার ধুপধাপ।ওর দিকেই আসছে মনে হয় ডাকাতের দলটা।

যিশু দৌড়োয়।

যিশুর মাথার ওপরে সজোরে বাড়ি পড়তে, হাতছাড়া ব্রিফকেস ছিটকে গিয়ে লাগে বটগাছের ঝুরিস্তম্ভে আর ডালা খুলে শুকনো পাতার ওপর ছড়িয়ে পড়ে শার্ট-প্যান্ট, কাগজপত্তর, টর্চ, টাকাকড়ি, ডটপেন, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ক্রেডিট কার্ড, চেকবই, পাসপোর্ট, টাই, ঘড়ি, ডাকটিকিট, তুষলাব্রতর সরষে আর শুকনো মুলোফুল।

টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, যিশুর পিঠের ওপর বারকয়েক লাঠির শব্দ ওঠে।তারপর পায়ে আর কাঁধে।তবু দাঁড়াবার চেষ্টা করে যিশু।মাথার ওপর আবার আঘাত। যিশুর পরিপাটি আঁচড়ানো দামি পরচুলা মাথা থেকে খুলে বেরিয়ে গেলে, আবার আঘাত।সেই মুহূর্তে, যিশু দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে তখনও, অন্তরীক্ষ থেকে পতনরত চকচকে রুপোলি কিলবিলে সাপটার ল্যাজ ধরে হ্যাঁচকা টান দ্যায় বুড়োশিব। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে কাছেই বজ্রপাত হল কোথাও। বজ্রপাতের কাঁপুনিতে, মৌমাছির চাক থেকে কয়েক ফোঁটা মধু ঝরে পড়ে যিশুর চুলহীন রক্তাক্ত মাথায়।

শ্বাস দ্রুত আর হৃৎস্পন্দন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে যিশুর। ফুসফুসে ভাসমান রক্তের হেমোগ্লোবিনে অক্সিজেনের স্থান সংকুলানে ব্যাঘাত ঘটছে বলে মস্তিষ্কে পৌঁছোতে অসুবিধা হচ্ছে। কপালে, হাতের চেটোয়, ঘাম জমছে আর জুতোর মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আঙুলগুলো।আলজিভের চারিপাশ শুকিয়ে যাচ্ছে।ক্রমক্ষীয়মান অশরীরী হলুদ ও বেগুনি অন্ধকার-কণার অজস্র খুদে-খুদে ফুল ভাসছে অস্পষ্ট চরাচর জুড়ে।

ব্রিফকেস থেকে পড়ে বহুকালের পুরোনো হলদে খড়খড়ে কাগজের পাতা উড়তে থাকে ইতিউতি।সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের খবরের কাগজ।প্রথম পৃষ্ঠায় তলার দিকে ডানকোণে ফুটফুটে আড়াই বছরের নাতনির ফোটোর তলায় তার হারিয়ে যাবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে দাদু মিনহাজুদ্দিন খান। মেয়েটির ডান কাঁধে জড়ুল। ডান চোখে তিল আছে। কাঁদলে থুতনিতে টোল পড়ে।মেয়েটির নাম খুশবু।ডাক নাম খুশি।

বইয়ের নামঃ *নামগন্ধ*
লেখকঃ *মলয় রায়চৌধুরী*
ভাষাঃ বাংলা
বইয়ের ধরণঃ উপন্যাস
প্রকরনঃ ইপাব (epub), **মোবি(mobi)**
পঠন সৌজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্রেরী
ই-বই তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ